কখনও বাংলা পড়বে
এই আশায়
রুমা ও রুচিকে

ভূমিকা

মনে হয়েছিল লিখি, এই সংকলন প্রধানত তাঁদের জন্য, ভোজনের ক্ষেত্রে যাঁরা অর্জুন। অর্জুন পাখির চোখের প্রতিফলনে নিবদ্ধদৃষ্টি, পরিপার্শ্বের অন্য কিছু তাঁর চোখেই পড়ছে না। যুধিষ্ঠিরেরা নিশ্চয়ই ভাল, আদর্শবান, অনুকরণযোগ্য। কিন্তু তাঁরা পুরো পাখিটা দেখেন, পাখির চোখে তির বেঁধাতে ব্যর্থ হন। তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে পারেন না। জয় হয় অর্জুনদের, যাঁরা সুখাদ্যের সম্মুখীন হলে সুখাদ্যটি ছাড়া আর কোনও কিছুই দেখতে পান না, কোনও বাধাই সুখাদ্যগ্রহণে তাঁদের অন্তরায় হয় না।

এই কথাটিই আমার একটি বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী লীলা মজুমদার অতি সুন্দরভাবে লিখেছিলেন: কে না জানে, কোনও কিছু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে, তখনকার মতো বিচারবুদ্ধিকে বিদায় দিতে হয়।

খাবার-আসরের ক্ষেত্রে এই বাক্যটি যতটা সত্য, বই পড়বার সময় ততটা নয়। পড়বার সময় ভোজনশালার শোভা, থালা-বাসনের পরিচ্ছন্নতা, পরিচারকের পোশাক-আশাক অথবা এই গুণগুলির অভাব কিছুই পাঠককে পীড়া দেয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থবদ্ধ রচনাগুলির বিভিন্ন স্থানে নানা ভোজ্যের স্বাদ-সুগন্ধের বর্ণনার মাঝে আমার একটি বিলাপ পাঠকের নজরে পড়বে। সেটা হল বাংলা রান্নার অধোগতি। যদিচ আমরা মৎস্যপ্রেমী এবং মাংসাশী, তবু আমার মনে হয়েছে, বাংলা-রান্নার উজ্জ্বলতর প্রকাশ ছিল নিরামিষ রন্ধনে। সেই পরম্পরা প্রায় চলে যাবার মুখে। মাছ বা মাংসকে গ্রহণযোগ্য স্বাদু করা কঠিন কাজ নয়। অন্যপক্ষে, নিরামিষ পদ রন্ধনকুশলতা না-থাকলে সুখের আকর হয় না।

বাংলা নিরামিষ রান্না একযোগে অতিসরল ও অতিকঠিন। উপকরণ বেশি লাগে না। কিন্তু উপকরণের মাত্রা এবং যথাসময়ে তা প্রয়োগ করতে না-পারলে নিরামিষ রান্না উতরোয় না। এই কাজে সময় ও ধৈর্যের দরকার হয়, অথচ আজকের জীবনে দুটোরই অভাব।

ব্যস্ত জীবনযাত্রায় রান্নার যে-সুখ থেকে আমরা ক্রমশ বঞ্চিত, তারই কিঞ্চিত সুখস্বাদ মনে ফিরিয়ে আনবার জন্যেই এই লেখা। যেহেতু নানা সময়ে লেখা, ফলে ইতিমধ্যে অনেক ভোজনশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই বদলে গিয়েছে বিভিন্ন পদের দামও। এগুলি শোধরাবার চেষ্টা করিনি। কারণ, আমার ধারণা এই তথ্যগুলি প্রক্ষিপ্ত। আসল কথা হল, একের আনন্দ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা। সেই চেষ্টাই এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রতাপকুমার রায়

সূচি

রান্নাঘরে অহেতুক প্রবেশ নিষিদ্ধ ১
ডালমুট ৪
ফুচকা-ফুচকা ৬
ঝালমুড়ি ৮
তেলেবেগুনে ১০
পরটা পাঁচালি ১২
তৃষ্ণার শান্তি ১৬
মালাই বরোওফ ১৯
আনাজের রাজা ২২
বড্ড উপকারী বন্ধু ২৮
পিঠে-পায়েস ৩২
নিরামিষ ৩৪
চিরকালের চিরদিনের ৩৭
আফলাতুন ৪৪
সন্দেশ ৪৭
আলফানসো নয়তো ম্যাঙ্গোস্টিন ৫০
ফলের ঋতু এই গ্রীষ্ম ৫৩
শতবর্ষে বাঙালির রুচি বদল ৫৭
পানশালায় আগুন ৬৬
থুকপা-মোমো ৭০
আইসক্রিম ৭২
উদ্ধত চূড়ায় লাল চেরি ৭৫
বড়দিন ৭৭
কেকের কাছে রসগোল্লা নিতান্ত অর্বাচীন ৭৯
ইংরেজ প্রাতরাশ সমৃদ্ধ করেছে স্কটরা ৮১
কাকোরি কবাব ৮৫
রেজালা রেজিস্টার্ড ৮৮
আপকি খাতির ৯১
বুফে ভোজন ৯৪
কার জন্য আক্ষেপ করব ৯৮
বাঙালির স্বাদবদল ১০০
চায়না টাউনে ভোর ১০৮
চায়না টাউন ১১১
দখিন হাওয়া ১১৪
কলকাতার কবাব ১১৭
সাহেবপাড়ায় কবাব ১২০
চিৎপুরের চাঁপ ১২৩
চাচাকাহিনী ১২৫
আবার চাচা ১২৮
রোল, রোল ১৩১
চাট ১৩৪
চৌরঙ্গির রংমহল ১৩৭
পার্কস্ট্রিটের তারকা ১৪০
খানদানী ১৪৩
গ্রহান্তর ১৪৬
ফরসান ১৫০
নিরামিষ খেতে গেলে ১৫৩
উৎসবে আহারে ১৫৬
ছুটির উতলা রসনা ১৬১
পান ১৬৫
দশপ্রকাশ ১৬৮
হাউস অব মিং ১৭১
কুচা ঘাসিরামে কচৌরি ১৭৪
ঢুকছে, আর বেরুচ্ছে না ১৭৭
বুখারায় ১৮০
সাইপ্রাস ১৮৩
নবাবি কবাব ১৮৬
পুরনো জওহর ১৮৯

কাশ্মীরি সম্রাট ১৯২
বোম্বাই জর্জ ১৯৫
প্যারাডাইস হ্যামবার্গার ১৯৮
ক্র্যাব ইন বাটার সস ২০১
রাজস্থানের আমিষেও চমক ২০৪
পনিরের ঘেবর ২০৮
মরিচের চপ ২১১
ধনী ভদ্রাসনে ভোজন ২১৩
আপেক্ষিক তত্ত্ব ২১৬
ফকিরার চানাচুর ২১৯
বড়ে মিঞা ২২১
বাকলাভা ২২৪
গুজরাটি কড়ি ২২৬
রাজজিলিপি ২২৯
লক্ষ্ণৌ তাশকেন্ট ২৩২
সৌরাষ্ট্রীয় ২৩৫
মালাই পান ২৩৮
সাম গে তাং এবং কিমচি ২৪১
হরহুখ ২৪৩
পুলগোগি ২৪৬
যার নাম রাম ২৪৯
ইউরোপে শীতের খাবার
আইসক্রিম ২৫২
হ্যাগিস এবং স্কচ ২৫৪
আরব সমুদ্রতীরে ২৫৬
উত্তপ্ত সাকে, গুঁড়ো বরফের বৃত্তে,
কাঁচা কুক্কুট মাংস ২৫৯
জাপানে মাছ রান্না ২৬১
আমি মাছ খাই না ২৬৫
রক্তাম্বরে ভোজন ২৬৮
দীর্ঘশ্বাস ২৭১
নিজের মুখে ঝাল ২৭৪
পরিবেশের বসে ২৮০
ভ্রান্তনিয়ম ২৮৩

রান্নাঘরে অহেতুক প্রবেশ নিষিদ্ধ

মফস্বল শহরে আমাদের বাড়িতে সব ঘরে ইলেকট্রিক আলো ছিল, রান্নাঘর ছাড়া। রান্নাঘরে কেরোসিনের কুপি জ্বলত। রান্নাঘরটাও ছিল একটেরে, আসল বাড়ির থেকে আলাদা, উঠানের ওপারে—যে উঠান শৈশবে মস্ত মনে হত।

তবুও আমাদের রান্নাঘর বাইরের দিকে ছিল বলে তিনদিকের জানালা দিয়ে যথেষ্ট আলো বাতাস আসত। অন্য বাড়িতে দেখেছি, বাড়ির সব থেকে খারাপ ঘরটিতে রান্না হয়। সারা বাড়ি বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করলেও রান্নাঘরে কুপি জ্বলে। সে ঘরটা ধোঁয়াতে আর অবহেলায় কালো হয়ে থাকে, কেউ কখনও সে ঘরে যত্নের হাত দেয় না।

অথচ, কী যত্নের সঙ্গেই রান্না করা হত। পায়রা দালানে বসে আনাজ কোটা থেকে আরম্ভ করে বড় দালানে সোনার রঙের কাঁসার থালায় পরিবেশন পর্যন্ত সব কাজ কত ভালবাসা দিয়ে, যত্ন আর রুচির সঙ্গে মিলিয়ে কত পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন হত। বাড়ির মেয়েরা নিয়মিত রান্না করেন না বলে রান্নাঘরের এমন অনাদর, তা নয়। যে বাড়িতে মেয়েরা নিজেরা রন্ধন করেন, সেখানেও দেখেছি রান্নাঘর কত অনাদৃত। বাঙালি সংসারে রান্নাঘর চিরকাল উপেক্ষিত।

এখন যেমন বাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে, আজকের রান্নাঘরও অন্য চেহারা নিয়েছে। পাঁচশো, হাজার স্কোয়ার ফুটের মধ্যবিত্তের ছোট ফ্ল্যাট এবং সেযুগের ছোট বড় যেমনই হোক অসংলগ্ন বাড়ির মধ্যে শুধু একটা যুগের তফাত নয়, মানসিকতার তফাতও দুস্তর। রান্নার জায়গা ছোট, ভাঁড়ার ঘর অন্তর্হিত, তারই মধ্যে প্রেসার কুকার, ননস্টিক প্যান, মিক্সি বা লিক্যুইডাইজার এখন রান্নাঘরের জাত বদলে দিয়েছে। কিন্তু বাঙালির ঘর বা যেমন পরিচ্ছন্ন তার শোবার ঘর।

দু-একটা গুজরাতি পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাদের রান্নাঘর দেখেছি। মনে হবে সেটাই বাড়ির মধ্যে সবথেকে পরিচ্ছন্ন ঘর। গৃহতল দিনে কতবার মোছা হয় জানি না, কিন্তু এমন কলঙ্কশূন্য যে পা ফেলতে মায়া হয়। ধাতুর বাসনগুলি পরিপাটি সাজানো, তার থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। কোথাও সামান্য জঞ্জাল নেই। যেন কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সলতে পাকানোর চিহ্ন নেই কোথাও, মনেও হয় না কোনও দিন পিলসুজ বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু আমাদের সংসারের অবজ্ঞার ওই স্থান, রন্ধনশালা থেকে যেসব অমৃতসমান ভোজ্য আবির্ভূত হত, আজ তাদের কল্পনা করলেও রসনা সিক্ত হয়। সেই নির্বাসিত রান্নাঘরে কুপির আলোয় প্রস্তুত সিন্ধু পিসির রচনা কিংবা অল্প পাওয়ারের বাল্বের আলোয় সিঁড়ির নীচের রান্নাশালায় ভবানীর মার সৃষ্টি সর্বদা মনে করিয়ে দেয় যে শিল্পীরা পারিপার্শ্বিকে প্রভাবিত হন না। তাঁরা আসরে শিল্প-রচনায় এমনই মগ্ন থাকেন যে স্টুডিয়োর ধুলো ময়লা তাঁদের নজরে পড়ে না। কে না জানে ইউরোপের পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পীদের স্টুডিয়ো সদাসর্বদা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শূন্য সুরার বোতল এবং পোড়া সিগারেটের টুকরোতে নোংরা হয়ে থাকত। অথচ সেখান থেকে তাঁদের সৃষ্টি আজ কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বাঙালিদের এই যে রান্নাঘরের ওপর অবজ্ঞা, আমার মনে হয় ওই উপলব্ধিই তার মূল সূত্র। শিল্প-রচনাই সেখানে মুখ্য, আর সব শুধু গৌণ নয়, অবান্তর। সংসারে রন্ধন করেন একজন কিন্তু গ্রহণ করবার মানুষ অনেক। শেষোক্তদের ভূমিকার শুরু এবং শেষ ভোজনে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা রসিক তাঁরা ভুলেও কখনও রন্ধনশালার দিকে পদক্ষেপ করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন, তেমন পা ফেলা অধঃপতনের লক্ষণ। পৃথিবীর তাবত বিখ্যাত রন্ধনশালায় কেউ কখনও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অকারণ ব্যস্ত হয়নি। হওয়া উচিতও নয়। একাগ্র না হলে কোনও কাজ পূর্ণতা পায়? সফল হয়? সেখানে সকলের মন রন্ধনে নিমগ্ন, পারিপার্শ্বিকের ওপর নয়।

জর্জ ওরওয়েলের 'ডাউন এন্ড আউট ইন প্যারিস এন্ড লন্ডন' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন লেখক একদা প্যারিসের সর্বোচ্চ হোটেলে বেয়ারার কাজ করেছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সেখানকার রন্ধনশালার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার পর বড় হোটেলের রূপকথার মতো ভোজনকক্ষে কুশলী শিল্পীর হাতে প্রস্তুত মহার্ঘ্য পদগুলিও মুখে তুলতে একটু দ্বিধা হয়। সে দ্বিধা যে মুহূর্তে ভুলে যাই সে ওই শিল্পকর্মের সার্থকতার জন্য।

আমাদের মধ্যে যারা রসিক, যাঁরা দুনিয়ার খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা কখনও রান্নাঘরের দিকে যান না। ভুলেও নয়। বাঙালিরা এই সত্যটা অনেক আগে জেনেছিলেন বলে, রান্নাঘর থাকত উঠানের ওপারে, প্রধান বাড়ি থেকে যথাসম্ভব দূরে। যেমন সূতিকাগার বা আঁতুড়ঘরও থাকত একটু দূরে। সামান্য আলাদা। বস্তুত আঁতুড়ঘরও তো রান্নাঘরের মতো সৃষ্টির ক্ষেত্র। সেখানে অন্যের অহেতুক প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টিকার্য নিরালায় হওয়া বিধেয়। তবেই তার পূর্ণ রূপটি হৃদয়লোভন হয়ে প্রস্ফুটিত হয়। তত্ত্বটা আমাকে একবার সৈয়দ মুজতবা আলী ভারি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আলীসাহেব আমার মাসিক পত্রিকার জন্য একটা গল্প লিখছিলেন। আমি যখন পৌঁছলাম তখনও লেখা শেষ হয়নি। আমার কৌতূহল হল, বললাম, অনেকখানি তো লিখেছেন, দেখি কী লিখেছেন।

আলীসাহেব শিউরে উঠলেন, বললেন, রায়সাহেব, আপনাকে বিচক্ষণ মানুষ বলে জানতাম, ছিঃ ছিঃ আপনি এমন একটা বেফাঁস কথা বলে ফেললেন? বাচ্চা কত বড় হল দেখবার জন্য কি কেউ গর্ভিণীর পেট কেটে দেখে নেয়? দেখার জন্য বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

কথাগুলো আমার মর্মে মর্মে বিঁধে আছে। আমি রান্নাঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে যাই না। যদিও জানি ওই ক্ষুদ্র, স্বল্পালোক ঘরে আমার সর্বাঙ্গীণ আনন্দবিধানের আয়োজন প্রস্তুত হচ্ছে। রান্নাঘর যেমন আছে তেমনি থাকুক। আমি সে বিষয়ে মাথা ঘামাব না। তার সৃষ্টি আমার কাছে পৌঁছলেই আমি চরিতার্থ।

ডালমুট

স্ত্রী বলে দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে ফেরবার সময় উজ্জ্বলা সিনেমার সামনের বিখ্যাত ডালমুটের দোকান থেকে ডালমুট কিনতে হবে। কাজের শেষে উজ্জ্বলার দিকে গেলাম। কলকাতায় যাতায়াত কমে গিয়েছে। সিনেমা থিয়েটার সব কোনটা কোথায়, ভাল খেয়াল নেই। ডালমুটের দোকান তো চিনিই না। উজ্জ্বলায় সহজেই পৌঁছে গেলাম। প্রায় সিনেমার সামনে বড় ঠেলায় ডালমুট, চানাচুর জাতীয় নানাবিধ পদার্থের পসরা সাজিয়ে একজন ফেরিওলা দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ডালমুট চিনতে মুহূর্তে বিলম্ব হল না। তবু সাবধানের মার নেই, জিজ্ঞাসা করলাম, এটাই সেই বিখ্যাত ডালমুটের দোকান? ফেরিওলা ঘাড় নাড়ল, না, এটা নয়। উত্তর-পশ্চিম দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্লিপ্তভাবে বলল, ওই দোকান। ওটাই বিখ্যাত।

দোকানটি উজ্জ্বলার উত্তরের গলির মাথায়, বড় রাস্তার ওপর। এ দোকান নাকি ১৯৪০ সাল থেকে আছে। ছোট জায়গা। দুটো বড় গামলায় ডালমুট ঢালা রয়েছে। ছোট বড় নানা মাপের ঠোঙাতে একজন ওজন করে ডালমুট ভরে সাজিয়ে রাখছে। একজন বিক্রি করছে। আমার আধ কিলো ডালমুটের একটি ঠোঙা সে-ই এগিয়ে দিল। বেশ ভিড়, কিন্তু ঠোঙা তৈরি থাকায় চটপট লেনদেন হচ্ছে। ভাল লাগল। বাঙালি ব্যবসায়ী প্যাকেজিং-এর মাহাত্ম্য আয়ত্ত করেছে দেখে চমৎকৃত হলাম। ডালমুট একটু খেয়েও দেখলাম। উপাদেয়।

মুম্বই ফিরে স্ত্রীকে প্যাকেট দিতে এক মুঠো ডালমুট মুখে দিয়ে বললেন, এ মা, একটু মশলা মিলিয়ে আনলে পারতে না? ঠোঙা তৈরি ছিল, আমার এ অজুহাত টিকবে না জানি। শুনলাম, ঝালমশলা বেশি বা রুচিমতো চাইলে, ঠোঙা খুলে সেই মতো মশলা

মিশিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত, এই মশলাই এই দোকানের বিশেষত্ব। আগ্রার ভীমসেন ডালমুটওলার যেমন—ডালমুটে ঘৃতের সুগন্ধের জন্য যাদের খ্যাতি।

উজ্জ্বলার সামনের দোকানের কোনও নাম ছিল না। সেই ঠেলাওলা যদি থাকে আপনাকে অবশ্যই চিনিয়ে দেবে। না থাকলেও চেনা সহজ—ঠিক উজ্জ্বলার উত্তরদিকে গলির ওপাশে। এখন দোকানে বড় সাইনবোর্ড লেগেছে। নাম ঃ উজ্জ্বলা চানাচুর।

আগ্রার ভীমসেনের ডালমুট অন্য ধরনের। বলতে গেলে জাতই আলাদা। এবং সেটাই সত্যিকারের ডালমুট। তার প্রধান উপকরণ ডাল। সুগন্ধি ঘিয়ে ভাজা, বিট নুনের ছিটে, একটু টকের ছোঁওয়া আর হালকা মরিচমশলা। আমাদের বাঙালি দোকানদারটির বিশেষত্ব অন্যত্র। অনেকে এঁর কৃতিকে ডালমুট না বলে চানাচুর বলেন। যদিও বাংলাদেশে চানাচুর অর্থে ডালমুটই বোঝায়—কিন্তু দুই পদার্থে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—যেমন ধরুন কাঁকরোলে আর টিণ্ডায়। কলকাতায় এখনও সাবেকি চানাচুরওলাদের দু-দশজনকে দেখা যায়। এরা কোনও গুপ্ত সমিতির সদস্য কি না জানি না। তবে সবাই এক ধরনের পোশাক পরে-সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি এবং সাদা টুপি। সবাই সুর করে চানাচুরের গুণকীর্তন করে হিন্দি ভাষায়। আর চানাচুর বা ছোলাচ্যাপ্টা কাপড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য কোন গহ্বর থেকে বের করে যে গুপ্ত-সমিতির সন্দেহটা আরও দৃঢ় হয়। এরাও মশলার প্রাখর্যে বিশ্বাসী। কিন্তু তার বিতরণে বড় কৃপণ। গুণীজনেরা যখন বলেন, আরও মশলা দাও, কি আর একটু লেবু, এরা কেমন যাদুকরের মতো হাতসাফাই করে সামান্য একটু মশলা দিয়েই, অনেক দিয়েছে এমন ভাব করে। বারবার চাওয়াও যায় না। যতবার ঝুলির গভীরে হাত দেয় ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে কেমন যেন গা ছমছম করতে থাকে। মরিচমশলা না বেরিয়ে হঠাৎ একটা আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে পড়তে পারে।

উজ্জ্বলার ডালমুটের প্রধান উপকরণ হল চিনেবাদাম ও পাপড়ি। একটু মোটা ঝুরিভাজাও থাকে। সব সময়ে খুব কুড়মুড়ে পাওয়া যাবে—বর্ষার মধ্যেও। মশলাটা আপনার মনের মতো মিশিয়ে নিতে ভুলবেন না, যার স্বাদের কথা আমার স্ত্রী কুড়ি বছর মুম্বইয়ে বাস করেও ভুলতে পারেন না। দামও বেশি নয়, ১৬ টাকা কিলো। বিকেলের চায়ের সঙ্গে অপূর্ব জুড়ি।

এতদিনে জানলাম দোকানি বাঙালি নয়, গুজরাতি, প্যাটেল।
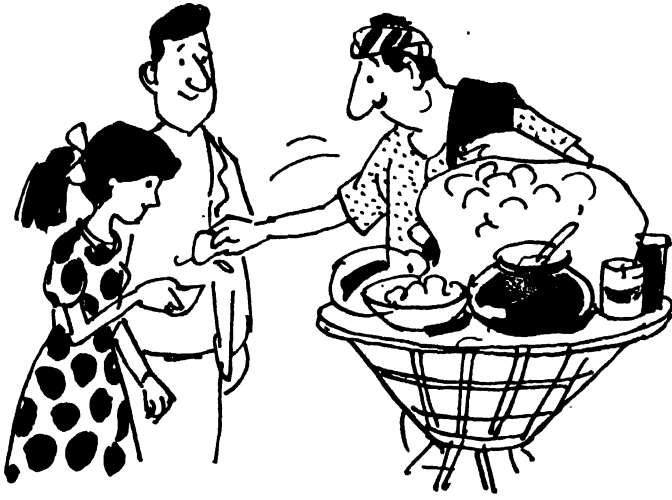
ফুচকা-ফুচকা

আমার ছোটবেলায় উত্তর কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় যারা ছোটদের মন আকুল করে তাদের পশরা নিয়ে আসত, তাদের মধ্যে ফুচকাওলা ছিল না। ঘুঘনি, পাঁঠার ঘুঘনি, অবাক জলপান, নকলদানা, আলুকাবলি, ঝালমুড়ি নিয়ে আসত ফিরিওয়ালা। ঝালমুড়ি ছাড়া আর সবার পৌঁছবার সময় ছিল বিকেলবেলা, আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে ফেরবার মুখে। যমুনাতীরে বংশীধ্বনি শুনে ব্রজবাসিনীরা যেমন আলুথালু হয়ে বেরিয়ে পড়তেন বৃন্দাবনের পথে, আমাদেরও তেমন, ওই ফিরিওয়ালাদের ডাক শুনে আর মুহূর্ত স্থির থাকতে পারতাম না।

ফুচকার সঙ্গে আমার পরিচয় হল পরে। কলেজের শেষবেলায়। উত্তর কলকাতায় বাঙালি সংরক্ষণের অন্তঃস্থলে তখন সবে তার অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যে কাশী চলে গিয়েছি। সেখানে প্রথম সদ্বংশজাত ফুচকার সঙ্গে পরিচয় হল। প্রথম স্পর্শেই মজে গিয়েছিলাম। এ কী অপার্থিব সৃষ্টি। খানিকটা মুচমুচে, খানিকটা কোমল আর অলৌকিক জলীয় আস্তরণ। গোলমরিচ, লাল লঙ্কা, পুদিনা এবং বিটনুনের সহযোগিতায় এমন একটা স্বাদ প্রস্তুত করা যায়, আমার কল্পনার বাইরে ছিল। বিশ্বনাথের গলির মুখে একজন ভ্রাম্যমাণ ফুচকাওয়ালা বসত, সময় পেলেই নাগোয়া থেকে তিন চার মাইল পথ পার হয়ে তার কাছে হাজিরা দিয়েছি। মশলা একই। কিন্তু শিল্পীর হাতের স্পর্শে তার স্বাদ তখন অপরূপ। সব শিল্পীই তো রঙের দোকান থেকে একই রং কেনেন, সবার আঁকা ছবি কি এক দরের হয়?

তখন বয়স কম ছিল, নিষেধের শেষ ছিল না, তবু দিনমানে ফুচকা আস্বাদন করতে সংকোচ হত না। কত দাম ছিল? এক পয়সায় দুটো না চারটে? এক আনায় ষোলটা?

সেদিন, রাসবিহারী এভেনিউর জুনিয়র ব্রাদার্সে ফুচকা খেলাম, আড়াই টাকায় পাঁচটা। বড় ফিকে মনে হল। না, না, বয়স বেড়েছে বলেই নয়, নিষিদ্ধ বস্তুতে এখনও আসক্তি কম দেখি না, মনে হল টেবিল চেয়ারে বসে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবহে ফুচকার স্বাদ অবশ্যই আহত হয়েছে। আসলে স্বাদ বড় নাজুক, স্পর্শকাতর জিনিস, অত স্বাস্থ্যসম্মত, রোগ-বাহক বিধিনিষেধের প্রহরা পার হতে পারে না।

এখন আবছা অন্ধকার না হলে ফুচকাওয়ালার কাছে উপস্থিত হই না। আমাকে সবাই দেখতে পায় না, আমিও ফুচকাওয়ালার মলিন পরিচ্ছদ, অপরিচ্ছন্ন হাঁড়ি এবং রোগ-বীজাণুদের দেখে বিব্রত হই না। ফুচকা শব্দটাও সচরাচর ব্যবহার করি না। নতুন দুটো নাম শিখেছি, গোলগাপ্পা এবং পানিপুরি, একটু আভিজাত্যের মোড়ক আছে, ফুচকার মতো ফক্কড়ির ছোঁয়া নেই।

ফুচকা-ভক্তেরা জানেন, ফুচকার একটা সামাজিক দিক আছে। অন্ধকারে একা ফুচকা গ্রহণ করলে তেমন সুখস্বাদ পাওয়া যায় না। তেমন জমেই না। ফুচকা হল গ্রিগেরিয়াস, যূথচর, অন্তত জন চারেক না হলে তার রস পূর্ণতা পায় না। পরিবেশকের সামনে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে চারজন ক্ষুদ্র শালপাতার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়ালেন, আর ফুচকাওলা একের পর একজনকে পরিবেশন করতে থাকল, পাটিগণিত কখন ভুলে গেলেন, কতক্ষণে রসের ভরা পূর্ণ হল, তার হিসাব থাকল না।

প্রকাশ্য দিবালোকে প্রথম মেয়েদের ফুচকা সেবন করতে দেখেছিলাম মুম্বইতে। কোলাবা অঞ্চলের কৈলাসপর্বত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দেখলাম ফুচকাওয়ালাকে অদৃশ্য করে দিয়ে তাকে ঘিরে চারজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা, পরনে কড়কড়ে অর্গান্ডির সদ্যধৌত অতি শুভ্র শাড়ি। তখন বেলা চারটে। প্রখর দিবালোক। সমর্পণের ভঙ্গিতে অর্ধাঙ্গ ঈষৎ নমিত দেখেই বুঝতে পারলাম ফুচকা। ফুচকা ছাড়া আর কোনও বস্তু সেবনে এমন নতমস্তক হতে হয় না। দুর্জনেরা বলেন শাড়িকে ফুচকার জল থেকে বাঁচানোর জন্যই এমন স্তোকনম্র মুদ্রা, ফুচকার প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়। দুর্জনের কথা সহজে বিশ্বাস করবেন না। তাঁরাই বলছেন ফুচকার সঙ্গে মাদক মেশানো হচ্ছে। ফুচকাই তো মাদকতাময়। অন্য মাদকের কী দরকার? ফুচকার কারখানা এবং ফুচকাওয়ালাদের নাকি নিশ্চিহ্ন করা হবে। কারণ ফুচকা অস্বাস্থ্যকর, রোগবীজাণুর ডিপো। কারা বলছেন এ কথা? যাঁরা নির্ভয়ে পবিত্র ভেলপুরি, ঘুঘনি, শোনপাপড়ি ও কুমড়োর বরফি সেবন করেন সানন্দে? তাঁরা?

তাঁদের বলি, হে চালুনি, ছুঁচের ছিদ্রান্বেষণ করা ভাল কাজ নয়।

ঝালমুড়ি

কখনও সখনও মুড়ি খাননি, বা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, এমন বাঙালি নিশ্চয় বিরল। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। মিশর দেশে সাধারণ মানুষ যেমন তিন বেলা 'ফুল' খায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার গ্রামাঞ্চলে তেমনি দু বেলা মুড়ি খাওয়া হয়। মিশরের 'ফুল' বরবটি বা শিম জাতীয় সবজির দানা, সেদ্ধ করা। স্বল্পবিত্তের প্রধান, এবং কিছু দিন আগেও একমাত্র আহার্য ছিল। সে-দেশে কথায় বলে, ধনীরা প্রাতরাশে 'ফুল' খান, মধ্যবিত্ত মধ্যাহ্ন-ভোজনে, আর দরিদ্র তিন বেলা। মুড়ি ঠিক ফুলের মতো খাদ্য না হলেও, তার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ, ফুলের মতো মুড়িও অস্বচ্ছলের দৈনন্দিন প্রধান আহার, সম্পন্নের শখের ভোজ্য। শুধু শখের নয়, সুখেরও। কর্তা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে, কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টি এল, বললেন, একটু মুড়ি মাখো। অথবা, ছেলেমেয়ে কলেজ থেকে ফিরেই বলল, তেলেভাজা আর মুড়ি হলে বেশ জমে।

মুড়ির পসার খেলার মাঠে, মনে স্ফূর্তি হলেই কি মুড়ি খাবার ইচ্ছা হয়? মুড়িওলাদেরও একদা খুব পসার ছিল। স্কুলে টিফিনের সময়, কলেজের লিজার পিরিয়ডে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি সময়টাকে কেমন যেন অন্তরঙ্গ করে আনে। আজকের ঝালমুড়ি আর সেই ঝালমুড়ি নেই, যেমন আমাদের সময়ে ছিল, তবু, আশ্চর্য, এখনও ঝালমুড়ি রসিকজনের প্রিয়। সে সময় মুড়িওলার ঝুড়িতে পাঁচ-ছ রকমের ছোলা-মটর থাকত। চালভাজাও রাখত কেউ কেউ। বলা বাহুল্য, মুড়ির সঙ্গে সামান্য চালভাজা মেশালে নতুন আর এক স্বাদ পাওয়া যায়। এখন সেই পাঁচ-ছ রকমের ছোলা-মটর এক বা দু-য়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে পারেন, যা দাম বাজারে, এখন কি অত বায়নাক্কা পোষায়? কিন্তু তখন দু পয়সাতে যতখানি ঝালমুড়ি পাওয়া যেত, এখন পঁচিশ নয়া পঁয়সাতেও ঠিক ততখানি হয় না। তা হলে অনুপানের কার্পণ্য

কেন?

পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রায় অনেক সময় এমন সব বাদ্য সংযুক্ত হয়, যা হয়তো সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে একবার কি দু বার বিশ ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য বাজানো হয়। বিবিধ প্রকারের ছোলা-মটরও তেমনি। সামান্য মেশালেও, মাঝে মাঝে গ্রাসে নতুনত্ব আনে। এখন দেখছি সেই সব বৈচিত্র্যের স্থান নিয়েছে তিনটি অভাবিত হানাদার, মুড়ির সঙ্গে যাদের এক আসরে উপস্থিতি আমরা কল্পনা করতে পারতাম না। তেঁতুলের জল, টমাটো এবং ধনেপাতা। এ তিনটির কোনওটিই স্বাদে-গন্ধে-স্পর্শে মুড়ির সঙ্গে একসুরে বাঁধা নয়। তবে এদের অনধিকার-প্রবেশের কারণটা অজ্ঞাত নয়। ওই যে পশ্চিম উপকূলের ভেলপুরি, বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে যা কলকাতায় অশ্রুত ছিল, আমাদের ঝালমুড়ি এখন তার নকলে চলছে। ভেলপুরিতে অবশ্য সেও (ঝুরিভাজা) এবং টক-মিষ্টি চাটনির প্রাধান্য থাকে। মুচমুচে মুড়িকে তরল কোনও পদার্থে সিক্ত করে দেওয়ার রীতি পশ্চিম উপকূল থেকে আমদানি।

আর আমাদের ঝালমুড়ি খাওয়ার অভ্যাসটা গুলিয়ে দিয়েছেন ওই যে কর্তার কথা গোড়ায় বলেছি, তিনি। অথচ আশ্চর্য, কেউ অপসংস্কৃতি বলে প্রতিবাদ করছে না। কর্তা বাড়ি ফিরে গিন্নিকে হাঁক দিলেন, একটু মুড়ি মাখো। হায়, এ কী অনুরোধ? মুড়ি কি শুধু একভাবে মাখা যায়? সন্দেশের কি শুধু একটাই পাক হয়? দোকানে গিয়ে কেউ যদি বলে, আমাকে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিন, দোকানি কেমন বিভ্রান্ত হবে ভাবুন। শাড়ি, গয়না, রূপসজ্জায় যেমন চেনা মেয়েকেও অকস্মাৎ অন্য কেউ মনে হয়, মুড়িও অনুষঙ্গ ভেদে নব নব রূপ পায়।

এমনই একটি বিশেষ রূপের নিষ্ঠাবান শিল্পী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এখনও মুড়ির ঐতিহ্য অক্ষত রেখেছেন। দোকানটি আমিই দেখছি পঁয়তাল্লিশ বছর। যদিও যে মুড়ি বেচছিল সে বলল দোকানটি প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক। মালিকের বাড়ি বিহার শরিফ। সেই প্রতিষ্ঠার সময় ভদ্রলোক মুড়িমাখার যে নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তার আর কোনও হেরফের হয়নি।

দোকানটি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ের মাথায়, উত্তর-পশ্চিম কোণে। সাইনবোর্ড নেই। ষাট বছরে তার প্রয়োজন হয়নি। সন্ধ্যার দিকে ভিড় হয়। দুজন বিক্রেতা ক্ষিপ্রহস্তে খদ্দেরদের মুড়ি তৈরি করে দেয়। একটি পাত্রে গরম, মুচমুচে মুড়ি থাকে। আপনি পঁচিশ পয়সার মুড়ি চাইলে, ছোট ঠোঙাতে তিনভাগ মুড়ির সঙ্গে একভাগ ডালমুট মিশিয়ে আপনার ঝালমুড়ি তৈরি করে দেবে। পাশেই কুচানো কাঁচালঙ্কা থাকে। প্রয়োজন মতো মিশিয়ে দেওয়া হয়। আরও মশলা চাইলে, তাও। এদের ঝালমুড়ির বিশেষত্ব হল ওই ডালমুটের স্বাদ। ডালমুটে উপকরণ বেশি নেই, প্রধানত ডাল, ঝুরিভাজা, চিনেবাদাম। তার মশলা আমরা যাকে গোটামশলা বলি সেই ধরনের। আসলে ধরনের বললে কিছুই বোঝানো হয় না। গরিলাও তো মানুষের ধরনের। গরিলা দেখে কি মানুষের কল্পনা করা যায়? এঁদের ঝাঁঝালো, সুরভিত, মুচমুচে ডালমুটের সহযোগে মুড়ি যে কত সুস্বাদ, না আস্বাদন করলে সম্যক বোঝা যাবে না। ডালমুট, চিপ্‌স ইত্যাদি আরও পাঁচ রকম আহার্য এই দোকানে পাওয়া যায়। তারা দোকানের অলঙ্কার-স্বরূপ। আছে, ওই পর্যন্ত। যাঁরা জানেন, তাঁরা এখানে আসেন মুড়ির জন্য। পশ্চিম উপকূলের আক্রমণ প্রতিহত করে বিহারি মুড়িওলা আমাদের মান রেখেছে।

তেলেবেগুনে

কয়েক বৎসর পূর্বে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন বাঙালির জাতীয় খাবার কী, বিনা দ্বিধায় উত্তর দেওয়া যেত, মাছের ঝোল এবং ভাত। এখন মাছ ক্রমশ অনেক বাঙালির খাবার থালায় অনুপস্থিত থাকছে। তা হলে কোনটা আমাদের জাতীয় খাবার? আমাদের জাতীয় পক্ষীর নাম জিজ্ঞাসা করায় আমার এক বন্ধুর মেয়ে সরল বিশ্বাসে বলেছিল, কাক। অনেকটা সেই রকম শোনালেও, বলতে হয় আমাদের জাতীয় খাদ্য তেলেভাজা। আশ্চর্য মনে হলেও, অনেক দিক দিয়ে কথাটা সত্য। সমগ্র বাংলার যে কোনও শহর, গ্রাম, গঞ্জে তেলেভাজা পাওয়া যায়। শীতের বিকালে, বর্ষার সন্ধ্যায়, পথে, ইয়ার-বক্সির সঙ্গে তেলেভাজা আস্বাদন করেননি, করে আনন্দ পাননি, এমন মানুষ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া, বিবিধ সরকারের উত্থান এবং টাকার মূল্যের পতনও তেলেভাজাকে এখনও বাঙালির আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। এমন সহজ শিল্প, এত সামান্য উপকরণ, অথচ মজা দেখুন, বাড়িতে গৃহিণী যতই অনুরাগ সহকারে তৈরি করে দিন, কখনওই রাস্তার তেলেভাজার সমকক্ষ বস্তু হবে না। ছোট দোকান, হয় উন্মুক্ত ফুটপাথে কিংবা কোনও বারান্দা বা রোয়াকের আশ্রয়ে তেলেভাজা-ওলারা কোন জাদুবলে এমন পরম সুস্বাদ পদার্থ তৈরি করতে পারেন, তাঁরাই জানেন। খুব একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা নয় কিন্তু, গাড়ি-ঘোড়া গেলে কিঞ্চিৎ ধুলোও এসে পড়ছে। হয়তো সেখানেই সু-স্বাদের গোপন চাবিকাঠি।

ধৃষ্টতা যদি না মনে করেন, বলতে পারি, তেলেভাজা ভারতবর্ষের জাতীয় খাদ্য, সর্বজনীন তো নিশ্চয়। উত্তর ভারতের পকৌড়া, গুজরাতের ফরসান, কিংবা মহারাষ্ট্রের ভজে বাংলার তেলেভাজারই নামান্তর। আর, দক্ষিণ ভারতের ভড়া, তিল বা নারকেল

তেলে ভাজা বলে তার জাতবদল হয় না।

আমাদের অনেকেরই প্রিয় বিশিষ্ট তেলেভাজার দোকান আছে। বহু ক্ষেত্রে স্বাদ অপেক্ষা দোকানের সান্নিধ্য এবং ক্রেতার সুবিধা পক্ষপাতের কারণ নির্দেশ করে। কিন্তু যদি গণ্ডির বাইরে যেতে প্রস্তুত থাকেন, আপনাকে আসতে হবে বাগবাজারে, তবেই উত্তম তেলেভাজার রসাস্বাদ করবেন। অত দূর যেতে না চান, অন্তত বিধান সরণির ওপর স্কটিশ স্কুল পর্যন্ত আসুন। প্রায় স্কুলের উল্টোদিকে ওই রাস্তার ওপর লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ অ্যান্ড সন্সের তেলেভাজার দোকান। সাইনবোর্ড আছে। দোকানের সামনে বিকালে, সন্ধ্যায় লম্বা লাইন পড়ে। গরম ভেজিটেবল কাটলেট পাবেন, ৩০ পয়সা, ভেজিটেবল চপের দাম ৪০ পয়সা। রূপে যে কোনও দোকানের মাংসের চপ কাটলেটের প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বাদেও কম যায় না। আলুর চপ ২৫ পয়সা, ফুলুরি ১৫ পয়সা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ফুলুরির স্বাদ পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে তারকেশ্বরের পথে। মন্দিরে পৌঁছবার মাইল তিনেক আগে ডান দিকে পাত্রমশাই-এর দোকান। গ্রামের নামটা মনে নেই, পথে যে কোনও লোক আপনাকে দোকানটি দেখিয়ে দেবে। সেই ফুলুরির অন্তস্থ বেসম ভারী নরম, কিন্তু শুষ্ক। মনে হবে যেন মূল্যবান কেকে কামড় দিলেন। মৌরির মৃদু সুগন্ধ আপনাকে মুহূর্তে বিমোহিত করবে।

খানদানি তেলেভাজার দোকান বাগবাজারে । অভিজাত শ্রেণীর। মানে, তেলেভাজাকে যতটা আভিজাত্য দেওয়া যায়। বাগবাজার শুনলেই নবীনচন্দ্র দাসের শতাধিক বর্ষ পূর্বের উদ্ভাবন রসগোল্লার কথা মনে পড়ে। সেই নবীনচন্দ্রের বিশ্রুত দোকান এখন অন্তর্হিত। বাগবাজার স্ট্রিটের যে অংশের পশ্চিমে গিরিশ অ্যাভিনিউ এবং পূর্বে বিধান সরণি সেই অংশটুকুর মধ্যেই এখন ছটি তেলেভাজার দোকান আছে। যেটি সর্বাগ্রগণ্য, তার মালিক রামবাবু। ৪৬ বছরের পুরনো দোকান। বাগবাজার পেট্রল পাম্পের বিপরীত ফুটপাথে। বড় দোকান। ভেতরে ১৫/১৬ জন অতিথির বসে খাবার জন্য টেবিল চেয়ার আছে। ভেতরে বাইরে সকাল সন্ধ্যা প্রচুর জন-সমাগম। এঁদের বিখ্যাত কৃতি মোচার চপ। আগে নাকি এই খাদ্যটির নাম ছিল লড়াইয়ের চপ। কেমন করে বিচিত্র নামটি উদ্ভূত হয়েছিল, সে অন্য কাহিনী। দোকানে সাইনবোর্ড আছে, তাও অভিনব ঃ বেঙ্গল ফেমাস অয়েল ফ্রায়েড শপ। ফুলুরি ১০ পয়সা, বেগুনি ২০। আলুর চপও আছে, তাও ২০ পয়সা। সকাল বিকাল দোকান খোলে। ১১টা থেকে ৪টা বন্ধ। অর্ধশতাব্দীকাল জনচিত্তহরণ করেও এঁদের পসার একটুও কমেনি। সব সফল শিল্পীরই তো তাই, তাঁরা বহুকাল ধরে সমকালীন রুচির অস্থিরতা অতিক্রম করে বহুজনের হৃদয় আপ্লুত করেন।

পরটা পাঁচালি

লুচির অভাব মেটাতে পরটা। দুধের বদলে ঘোল। এ-ই জানতাম। পরটায় ঘি কম লাগে। লুচিতে খরচ বেশি, তাই পরটা। কথাটা বোধহয় সর্বাংশে সত্য নয়। খরচের দিক বাদ দিন, পরটা যে স্বমহিমায় সর্বজনপ্রিয় হয়, তার কয়েকটা নিদর্শন আমিই আস্বাদন করেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে।

প্রথম যে ঘটনাটি মনে পড়ে তার স্থান পাইনউসলা। কাল ভারত ভাগ হওয়ার বছর খানেক পরে। শিলং থেকে সিলেট যাওয়ার মাঝরাস্তায় এই সাময়িক হল্ট। শিলং থেকে প্রত্যুষে রওনা হয়েছি, তখনও প্রাতরাশের সময় হয়নি। গাড়ির ড্রাইভার অভয় দিল, ছোটা হাজরি আপনি পাইলউসলাতে পেয়ে যাবেন।

তখন কি জানি এ তো ছোটাহাজরি নয়, এমন হাজরি পরখ করবার সুযোগ জীবনে বেশি আসবে না।

পরিবেশ মনোরম ছিল। ঈষৎ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। দু পাশের গাছের জটলার মধ্যে দিয়ে মসৃণ পথ, তার পরের খানিকটা রাস্তা, যার দুপাশে খাদ। একেই বোধহয় পর্বতারোহীরা স্যাডল বলে থাকেন। অপরূপ দৃশ্য। অনেক নীচে দুপাশই দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে জনবসতির চিহ্ন, ক্ষেত খামার, সকালের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে। ডান পাশে রাস্তার ধারে একটি পাকা বাড়ি দেখা গেল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলল, ডাকবাংলো, এখানে আপনি পছন্দমতো ছোটাহাজরি পাবেন।

সেদিন কী আমার সৌভাগ্য, খাবার টেবিলে ছুরি-কাঁটার সাজসজ্জা দেখেও চিরাচরিত আন্ডা আর টোস্ট আদেশ না করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী পাওয়া যাবে? বেয়ারা বলল, পরটা। কোনও শুভবুদ্ধি সেদিন আমার সহায়, আমি সহজেই

বলেছিলাম, তা-ই দাও।

যথাকালে মুচমুচে ভাজা, সুপুষ্ট একটি পরটা প্লেটটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করে উপস্থিত হল। এমন উপাদেয়, পরম স্বাদিষ্ঠ পরটা তার আগে কখনও আস্বাদন করিনি। অলৌকিক আনন্দ পেয়েছিলাম। কী ছিল সে পরটাতে, তা আমার জানবার কথা নয়। ঘৃতের সুগন্ধের অধিক আর কিছু মনে করতে পারি না।

পাহাড় থেকে নেমে ডাউকিতে আমার গাড়ি ছেড়ে অন্য গাড়িতে উঠতে হয়েছিল। এখন আমি পূর্ব পাকিস্তানে। অপরিচিত এক দেশে পা দেওয়ার স্বাভাবিক অস্বস্তি কেটে গিয়েছিল।

তারপর কয়েকবার শিলং গিয়েছি, পাইনউসলা আর যাওয়া হয়নি। হয়তো ভালই হয়েছে। সে স্থান, সে কাল, সে স্বাদ আর কি ফিরে পাওয়া যেত?

পুরনো স্মৃতি নতুন করতে পারিনি অন্যত্র। ফতেপুর সিক্রিতে। আগ্রা গেলে অনেকেই সিক্রিতে যান। যাওয়াই উচিত। গোলাপি পাথরের এমন আশ্চর্য প্রাসাদ আর কোথাও নেই। ফতেপুর সিক্রি সমতল থেকে সামান্য উঠতে হয়। সেও এক সকালবেলা আগ্রা থেকে বেরিয়ে, সিক্রি পৌঁছনোর কিছু আগে গাড়ি থামল। আমার ধারণা সেটাও ডাকবাংলো ছিল, না-ও হতে পারে, স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে, এমন হতেই পারে। এখানের বাবুর্চি আমাকে আলুর পরটা অফার করলেন। আলুর পরটা আমার প্রিয় ভোজ্য। সহজেই আলুর পরটা চাইলাম। সামান্য একটা আচার সহযোগে আলুর পরটার সে অমৃতময় স্বাদ আজও ভুলতে পারি না। পরটার অভ্যন্তরে কোন অনন্যসাধারণ আলুর পুর ছিল, কোন অজ্ঞাত মশলায় স্নিগ্ধ, জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। সেই কোমল অথচ মুচমুচে পরটা অনায়াসে দুটি ভোজন করেছিলাম। এও আমার ভাগ্য, দ্বিতীয়বার কোথাও এমন পরটা আর ভোজন করিনি।

তৃপ্তির কত স্তর হয় জানি না। সেই সকালটা ছিল তৃপ্তির তুঙ্গে।

এই ঘটনার দুই দশক পরে, আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে গিয়ে দেখি ফতেপুর সিক্রি তেমনই চিরন্তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শুধু অপার সুখের আকর সেই ভোজনের স্থানটি নেই। দুঃখ হয়েছিল, তখনও জানা না আরও কত আশাভঙ্গের কারণ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। চড়াই রাস্তায় দুবার ঘোরাফেরা করে নীচেই নেমে এলাম। একসারি দোকানের মধ্যে একটা ভোজনশালা আমাদের পছন্দ হয়েছিল। সে যে আমাদের মোহভঙ্গের জন্য ওখানে দাঁড়িয়েছিল তা আমরা অনুমান করতে পারিনি।

এত অপ্রীতিকর আলুর পরটা আমার জীবনে বহুবার আসেনি। সে-ও ভাগ্য। আরও কয়েক স্থানে মনোজ্ঞ পরটা আস্বাদে আনন্দ দিয়েছি। পরটা ঠিক আমাদের বাঙালিদের স্বল্পাহার বা জলযোগের পদ নয়। সব ভোজনশালায় পাওয়া যায় না। কিন্তু আদি পরটার রূপান্তর আমাদের ভাল লেগেছিল অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে এসপ্লানেডের অনাদি কেবিনে। দিলখুশা বলেন তাঁরাই মোগলাই পরটা প্রবর্তন করেন। আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল অন্য প্রবক্তা অনাদির ভোজনশালায়, সেই কথা বলি।

ডিম সহযোগে পরটার প্রকরণের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎ হল। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। প্রথম দর্শনেই তার সঙ্গে প্রেম। আজও অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু তো পরটার স্বাদ

নয়। তার নির্মাণ পদ্ধতিও চমকপ্রদ ছিল। ধীবর যে ভাবে ঘূর্ণি জাল পুকুরে নিক্ষেপ করে, তেমনি হাতের কায়দায় হাওয়ায় ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর ময়দার লেচি ক্রমশ বড় হয়ে তার হাতে ফিরে আসছে। তখনও পাচকের সামনে বড় কাচের পরদা লাগেনি। ভেতরে না বসলে কারিগরের সে কারুকার্য দেখা যায় না। তাই দেখতে দেখতে খাবার মুখে তুলতে ভুলে যাই। তিন দশক আগেও দক্ষিণ ভারতে আমিষ ভোজনশালার সংখ্যা নগণ্য ছিল। অটুট ছিল ইডলি-দোসার রাজত্ব। সেখানে আমিষ ভোজ্য পাওয়া যেত, তার নাম ছিল মিলিটারি হোটেল। সেখানে প্রধান ভোজ্য ছিল বিরিয়ানি। তার বাইরে আমিষ পদের ভক্তও বিশেষ ছিল না। যদিও সেই সময়েই মাদ্রাজ বা আজকের চেন্নাইয়ের মাউন্ট রোডের ওপর একটি মধ্যবিত্ত আমিষ ভোজনশালা ছিল, তার নাম বুহরি। বুহরি আজও আছে, তবে এখন আরও অনেকে আমিষ খাদ্য পরিবেশন করে বলে বুহরির আদর কমে এসেছে। বুহরির মুখোমুখি মাউন্ট রোডের অন্য পারে বিলাল রেস্টুর্যান্ট। সেখানেও আমিষের রাজত্ব। তার পৃষ্ঠপোষকও কম ছিল না।

বুহরিতে প্রথম পরটা আবিষ্কার করেছিলাম। পদটির নাম ছিল সিলোনিজ আন্ডা পরটা। জাতে আমাদের মোগলাই পরটার মতো। তা হলে কি সর্বপ্রথম সিংহলের মানুষেরাই পরটা উদ্ভাবন করেছিল? সে প্রশ্নের উত্তর পাইনি। বুহরিতে গেলে সিলোনিজ আন্ডা পরটা এবং ফ্রায়েড পাট্রিজ অব্যর্থ আদেশ করেছি। এখন সম্ভবত পাট্রিজ অর্থাৎ তিতির ভোজনতালিকা থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কারণ তিতির এখন সংরক্ষিত প্রাণী। তিতির শিকার করা দণ্ডনীয়। বাংলা অভিধানে দেখছি পরটা হিন্দি শব্দ পরটা থেকে উদ্ভূত। হিন্দি অভিধানে শব্দটির উদ্ভব লেখা নেই। তবে একটি সংস্কৃত শব্দ আছে পুরোডাশ। পুরোডাশ রন্ধন প্রকরণ কেমন ছিল বলতে পারব না। বৈদিক ঋষিরা কি পুরোডাশ ভোজন করতেন, ডিম সহযোগে না নিরামিষ?

বছর পাঁচেক আগে সিঙ্গাপুর এবং সমগ্র মালয়েশিয়ায় মোগলাই পরটার সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ হল। ওদেশের মানুষরা বলেন মুরতবাক। মোগলাই নয়, সিলোনিজও নয়, ওই পরটা যেন তাঁদের নিজস্ব পদ। মুরতবাক। কুয়ালালামপুরে এবং সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গুন অঞ্চলে সমস্ত ফুটপাথের সঙ্কীর্ণ এবং ছোট ভোজনশালায় মুরতবাকের চাহিদা দেখেছি। আমাদেরও খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু রকমফের আছে। মুরতবাকে মাংসের কিমা যুক্ত হয়। মুরতবাক প্রস্তুত প্রকরণ অনাদির মতো আকর্ষণীয় কিছু নয়। ময়দার লেচি সামান্য বেলে নীচে হাতের তালুর তাড়নায় বড় করা হয়, তারপর কিমা ও ডিম মাঝখানে দিয়ে চারপাশ মুড়ে নিয়ে ভাজা হয়। অবশ্যই সুস্বাদ। তরকারি বা মাংসের কোনও ব্যঞ্জন সহযোগে ভোজন করাই বিধি তবে, না হলে কোনও ক্ষতি হয় না স্বাদের।

পরটা প্রসঙ্গে দিল্লির পরটাগলির কথা না বললে এই ব্যাখ্যান অসম্পূর্ণ থাকবে। চাঁদনি চক থেকে দক্ষিণে একটি অপরিসর রাস্তা চলে গিয়েছে। সেই রাস্তায় একদা বছর কুড়ি আগেও দু ধারে পরটার দোকান দেখেছি। সবার অতিথি বসাবার জায়গা নেই। দাঁড়িয়েই ভোজন করতে হত অনেক দোকানে। এদের বিশেষত্ব ছিল, সাধারণ পরটা নয়, আলু, মুলো, মেথিশাক, কপি দিয়ে তৈরি পরটা। সে অবিস্মরণীয় স্বাদ ভোলবার নয়। বছর তিনেক আগে গিয়ে দেখেছি, পরটার দোকানগুলি অদৃশ্য হয়েছে, তার জায়গায়

অন্যান্য বহুবিধ বস্তুর দোকান হয়েছে। একটি মাত্র পরটার দোকান নিভু-নিভু প্রদীপের মতো। সে জেল্লা নেই, সে গ্রাহকও নেই। আমি নিজেই ফিরে এসেছিলাম।

আর একটি পরটার দোকানের কথা বলি। দিল্লির। সম্পূর্ণ ঠিকানা বলতে পারব না। ঠিকানা দিলেও আপনি যেতেন কি না সন্দেহ আছে। দক্ষিণে দিল্লির মূলচাঁদ হসপিটালের পাশে যে ফ্লাইওভার আছে তার কাছাকাছি। রাস্তার ধারের ধাবা। দোকান খোলে রাত্রি দশটার পর। চলে আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত। প্রকাণ্ড চুল্লির ওপর বিশাল এক তাওয়া। দুজন মানুষ সমানে লেচি থেকে পরটা নির্মাণ করছে। প্লেন পরটা ছাড়া আলু মুলোর পরটাও পাওয়া যাচ্ছিল। বিশাল তাওয়া ঘিরে তিনজন, চারজনও হতে পারে, কারিগর একাগ্র মনে পরটা ভেজে চলেছেন। খদ্দেররা তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। দাম কম, স্বাদ নিশ্চয় আকুল-করা, নইলে এত গ্রাহক আসবেন কেন? আমরা এই লোকপ্রিয় পরটার স্বাদ নিতে পারিনি। ওই পাড়ায় ডিনারের পরে পরটার ধাবাতে গিয়েছিলাম। সুতরাং লোলুপ হলেও পরটা ভোজনের সামর্থ্য ছিল না।

পঞ্জাবিদের লচ্ছাদার পরটা অপেক্ষা আমাদের দৈনন্দিনের ত্রিকোণ পরটা এবং নিঃসন্দেহে ঢাকাই পরটা আরও সুস্বাদ হয় কারণ, তার পরতগুলি সহজে উন্মোচিত হয়।

সত্যিকারের শিল্পীর হাতে পরটা এত হৃদয়হরণ কী করে হয়? মনে হয়েছে তাঁরা একটা সত্য জেনে গিয়েছেন যে ময়দার সঙ্গে উত্তম ঘৃতের রাজযোটক সম্পর্ক। তা ছাড়া, ভাল পরটার নির্মাণ কৌশলের রহস্যটাও তাঁদের আয়ত্তে। লেচি খানিকটা বেলে লম্বা লম্বা ফালি করে, সেগুলিকে পরের পর গুটিয়ে নিয়ে আবার বেলতে হবে। পুনরায় ওই নির্মিত লেচিকে বেলে নীচে দ্বিতীয় পর্বেও সেই প্রক্রিয়া করা যায়। যতবার ফালি কাটা হবে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঘি ফালিগুলির ওপর দিলে, তবেই পরটা পরতে পরতে খুলতে থাকে। তার স্বাদ অনন্য। সবার সে ধৈর্য নেই, কুশলতাও নেই, তাই সর্বত্র পরটা এক কদরের হয় না। ভাল শিল্পকর্ম ধৈর্য ছাড়া হয়?

তৃষ্ণার শান্তি

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিগত বসন্তের দিনগুলির জন্য আকুল হওয়া আশ্চর্যের নয়। কিন্তু যতই বলি, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে/দখিন হাওয়া, পথ হাওয়া,—বসন্তকে ফিরে পেতে সারা বছর লাগবে। তা ছাড়া, এই গরমে কবিত্ব করবার মুডও আসবে না। গ্রীষ্মের দাপট সহজে যাবার নয়। আকাশ নিষ্পলক, নিষ্ঠুর, হাওয়াতে ড্রাগনের নিশ্বাস, পায়ের নীচে পথও তাপের কুণ্ড। বরং, একপাত্র ঠাণ্ডা পানীয় পেলে শরীর একটু শীতল হয়।

এই ঋতুতে শীতল পানীয়ের মতো ক্লেশহারী, আরামদায়ক বস্তু আর হয় না। এক সময়ে ডাবের জলের খুব চল ছিল। কিন্তু ডাবের জল শীতল করার বিধি নেই, তাই পানান্তে তৃষ্ণা নিবারণ হলেও শরীর তেমন শীতল হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাঙালির তৈরি বোতলে-বদ্ধ পানীয়ের মধ্যে দুটি জিনিস খুব পছন্দ ছিল—বায়রনের আইসক্রিম সোডা আর রোজ অ্যান্ড থিসলের ছাপ লাগানো ভিমটো। জীবনের অনেক সুখের মতো তারাও কবে অদৃশ্য হয়ে স্মৃতির আশ্রয় নিয়েছে। তার বদলে আরও বহু নামের তৈরি পানীয় এখন পাওয়া যায়। কিন্তু পুরানো বন্ধুত্বের স্বাদ কি নতুন বন্ধুরা দিতে পারে? এ ছাড়া, এই সব বোতলের পানীয়ের দামও বেশ চড়া—দেড় টাকার ওপর, বড় দোকানে আরও বেশি। বাড়িতে কাগজি লেবুর সুগন্ধিযুক্ত ঘোল, বেলের পানা, কাঁচা আমপোড়ার শরবত বরফ সহযোগে চিরকালই অতুলনীয়।

বাড়ির সেই সুখদায়ক শরবতকে যাঁরা প্রথম দোকান খুলে বিপণন করেছিলেন, এবং এখনও সাম্রাজ্য না হোক একটা ছোট-খাট রাজ্য বজায় রেখেছেন, তাঁদের পুরোধা প্যারামাউন্ট। কলেজ স্কোয়ারের পুবে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিটের ওপর। এক সময়ে

ছাত্রমহলে অতি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। সর্বপ্রথম এখানে বসেছিল প্যারাডাইস ১৯২৫ সালে এবং তার বছর চারেক পরে প্যারাগন। প্যারাডাইস ভেঙে প্যারামাউন্টের প্রতিষ্ঠা হল ১৯৩৭-এ। অল্পকালের মধ্যেই আদি দোকান প্যারাডাইস বন্ধ হল, বছর দশেক আগে প্যারাগন। রসিকমহলে তিনটি নামই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

প্যারামাউন্টের শোভা সজ্জা বিশেষ নেই। গুটিকয় বেঞ্চি চেয়ার মিলিয়ে ১৭/১৮ জন বসবার মতো টেবিল আছে। এখন লোক সমাগম কমে গিয়েছে। ছাত্রমহল অন্যান্য পানীয়ের স্বাদ পেয়েছে। সেই একচ্ছত্র রাজত্ব আর নেই। তা বলে শরবতের কেরামতি বিন্দুমাত্রও কমেনি। এত কাল পরে গিয়েও মনে হল যেন সেদিনের কলেজ পালিয়ে এক গেলাস শরবত খেতে এসেছি। মালিক, যিনি দোকানে বসেন, পুরনো অনেক কথা বলে বর্তমানকে মুহুর্মুহু মুছে দিচ্ছিলেন। শরবতের স্বাদ কখনও বদলাতে পারে? সব যে ছকে বাঁধা, নড়চড় হবার উপায় নেই। আর সেই ছক বা প্রণালী কার কাছ থেকে পাওয়া জানেন? স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শরবত তৈরির প্রণালী লিখে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে ডাবের জলের শরবত। কচি ডাবের শাঁস এবং জল উভয়ের মিশ্রণে এই শরবত সুস্বাদু নিশ্চয়—কিন্তু একেবারে আহামরি বলা কঠিন। দাম ২.৫০ টাকা। এঁদের যে শরবত আমার চিত্তহরণ করেছে, আপনাকেও করবে সন্দেহ নেই, তার নাম মানোহি শরবত। বড় এক গেলাস দুধ আর মালাই মিশিয়ে এই অমৃত এঁরা তৈরি করেন, বাদামের কুচি ইত্যাদি দিয়ে তাকে যেমন হৃদয়লোভন করে তোলেন, তার তুল্য কোনও পানীয় আজও আমার জিহ্বা স্পর্শ করেনি। দাম তিন টাকা।

কম দামি শরবতও আছে, যার ভিত্তি ঘোল। তা বলে ফেলনা নয়। ছাত্রজীবনে সেটাই আমাদের বেশি আকর্ষণ করেছিল, কারণ দাম কম ছিল। গেলাসের সাইজ অনুসারে এক আনা, ছ-পয়সা অথবা দু-আনা। এখন অবশ্য তারই দাম হয়েছে এক টাকা, দেড় টাকা এবং দু টাকা। হবেই তো। কোন জিনিসের দাম স্থির আছে? কিন্তু স্বাদ একেবারে অক্ষয়। কাঁচা আমের বা গোলাপের সিরাপযুক্ত শরবত সহজেই আপনার মন কাড়বে।

নেতাজির এই দোকানে যাওয়া আসা ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো আসতেনই। শ্যামাপ্রসাদও প্রায় আসতেন। শীতকালে ক-মাস দোকান বন্ধ থাকে। অন্য সময় ভিড় হয় না বটে, তবে খদ্দেরের আগমন কম নয়। ভেবে আনন্দ হয় যে মানুষের রুচি এখনও সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়নি।

আগেও একবার বলেছি, এই লাইনের গুণীজনেরা বড়ই প্রচার-বিমুখ হন। প্রায় ঋষিতুল্য উদাসীনতা নিয়ে এঁরা সমঝদারের জন্য নিজেদের সৃষ্টি উপস্থিত করেন। সমঝদার না থাকলেও হতাশ হন না। চৌরঙ্গিতে কে লাল সিরাপ মিশিয়ে শরবতের প্রকাণ্ড ব্যবসা ফেঁদেছে এঁদের জানবার আগ্রহমাত্র নেই। তাই এঁরা দোকানের সামনে অনায়াসে লিখে দিতে পারেন, প্রত্যেকে দুই গ্লাস হিসাবে শরবত পাইবেন। তাও একবার এক ভাষায় নয়, ইংরেজি বাংলা ও হিন্দিতে তিন ভাষায় ওই সতর্কবাণী লেখা আছে। সাইনবোর্ড বহু দিন মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু নিয়ম সগৌরবে পালিত হচ্ছে। এই দোকানটির নাম কপিলাশ্রম। বিধান সরণি এবং কৈলাস বোস স্ট্রিটের সঙ্গমের উত্তর-পশ্চিম কোণে। ভাল করে না দেখলে দোকান চোখে পড়বার কথা নয়। চার ফুট

বাই চার ফুট একটা ফোকরের ভিতর দিয়ে যে শরবত তৈরি করছে তাকে দেখা যাবে, প্রতিষ্ঠাতার বংশধর। তবে দোকান ভুল হবার নয়। রাস্তার ওপর মস্ত কিউ—আপনার শরবত পেতে অনেক সময় লাগবে। যখন শেষ পর্যন্ত আপনি ওই ফোকরের মুখোমুখি হবেন, দেখতে পাবেন যন্ত্রচালিতের মতো সমস্ত দৃশ্যপট জুড়ে একজন মানুষের দুটি হাত গেলাসের পর গেলাস শরবত তৈরি করছে। ঘোলাটে নিষ্প্রভ চোখে তিনি আপনার অর্ডার জানতে চাইবেন। অবশ্যই 'আবার খাই' আদেশ করবেন। পদ্মফুলের মাঝে এটি পদ্মরাগমণি। মাঝারি গেলাস ১.২৫ টাকা। এই সারির আরও দু-রকম শরবত পাওয়া যায়। তারাও কম যায় না, রোজমালাই এবং চকোলেট। একই দাম। কম দামি একটা শরবতও আছে, দধিতি। দাম ৭৫ পয়সা। কিন্তু পঞ্চাশ পয়সা বেশি ব্যয় করাই সমীচীন হবে। বহুদিন বহুবার কপিলাশ্রামের শরবত আস্বাদন করার পরও সম্যক বুঝতে পারিনি। আবার খাই-এর ভিত্তি কী, দই না দুধ অথবা উভয়। যে সুগন্ধি ব্যবহার করেন তাও এঁদের নিজস্ব, কীসের সমন্বয়ে তৈরি তাও বোঝা যায় না। শুধু বসার জায়গা নেই বলে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সুশীতল শরবত খেতে খেতে আপনার মনে হবে দেবভোগ্য এমন পদার্থ থাকতে মানুষ বেশি দাম দিয়ে বোতলে ভরা পানীয় কেন খায়?

আপনি সহসা 'হৃত-নিশ্বাস নিঃস্ব গগনতলে' দাঁড়িয়ে আপনার তৃষ্ণার শান্তি পাবেন। একবারও মনে হবে না, সুখাদ্যের তালিকায় সুপেয়-র অনুপ্রবেশ অনধিকার।
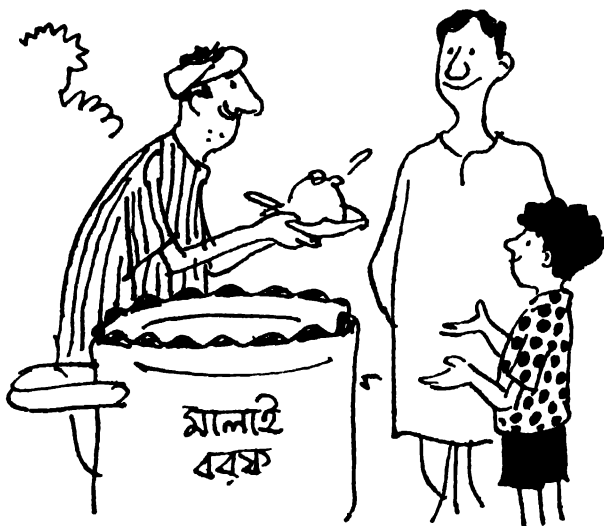
মালাই বরোওফ

গ্রীষ্মের অসহ্য সন্ধ্যায় এই কলকাতায় 'মালাই বরোওফ' ডাক শুনে আমাদের শিশু হৃদয়ে, যে চাঞ্চল্য হত তার মতো প্রবল আর কোনও অনুভূতি আছে কি না তখন বলতে পারতাম না। বড় হয়ে অনুভব করেছি, সেই চাঞ্চল্যের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কৃষ্ণের বাঁশরী শুনে শ্রীরাধার হৃদয়ের আকুলতা। জয়দেব সুললিত পদ্যে সে কাহিনী অমর করে গেছেন। আমার এমন শক্তি নেই যে আমি নিদাঘের শান্তি, ক্লান্তিহর, মনোহর সেই পদার্থ কুলফি বরফের অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারি। কুলফি বরফ আমাদের শৈশবকে বড় সুখাচ্ছন্ন করেছিল। রাধার মতোই অনেক শাসন এড়িয়ে, অনেক বাধা পার হয়ে গোপনে আমাদের কুলফির সান্নিধ্য পেতে হত। একবার পৌঁছলে মনে হত এমন অপার্থিব জিনিসের ওপর এত নিষেধ কেন? বড়রা কি কুলফি কখনও জিহ্বা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেননি। শাসন সত্ত্বেও কুলফিওলাদের অভাব ছিল না। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে বসন্তের শুরু থেকে হেমন্তের শেষ দিন পর্যন্ত গলিতে গলিতে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। তখনও আইসক্রিমের এত চল হয়নি, এত রকমফের আইসক্রিম পাওয়াও যেত না।

কুলফি সম্পর্কে একটা শৈশবজাত অবদমিত ভয়ের কারণেই বোধ হয় সেদিন পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরের মাঠে কুলফিওলাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। পরিচয় অবিলম্বে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। জায়গাটা আলো-আঁধারে অস্পষ্ট, লোকজনের ভিড়ও বেশি। পরিচিতের চোখ এড়িয়ে স্বচ্ছন্দে এই পরম পদার্থটির আস্বাদ নিতে পারেন। খাবার সময় একবারও অসুখ-বিসুখের কথা মনে পড়বে না। অপরূপ এক আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবেন। এখানে কয়েকজন গুণী শিল্পী আছেন। তাঁদের কথা পরে

বলব। আগে যুধিষ্ঠির সদৃশ, রসিকদের জন্য দু-একটা ভাল কুলফি উপলব্ধির স্থানের কথা বলি।

যদি আপনাকে ভোজনশালায় কুলফির স্বাদ নিতে হয়, ভিড়-টিড় এড়িয়ে আরামের আসন নিয়ে, তা হলে দুটি মাত্র জায়গা আমি অনুমোদন করি। এদের কথা পূর্বে লিখেছি, পার্ক স্ট্রিটের মেপ্‌ল রেস্টুর‍্যান্ট এবং রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের ওপর জুনিয়ার ব্রাদার্স। জুনিয়ারের কুলফি মাপে বড় নয়, দামে কম, ৩ টাকা। জাফরানের ফিকে সৌরভ, স্বাদে মনোমোহন। মেপ্‌লের কুলফিতে বাদাম ও পেস্তার কুচি মেশানো থাকে, তাই দামেও বেশি ৭ টাকা। আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। কলকাতার সব ভোজনশালার মধ্যে মেপ্‌লের কুলফি আমার সর্বাধিক প্রিয়।

মধ্য কলকাতায় কুলফির খ্যাতি বড়বাজারে সত্যনারায়ণ পার্কের তিওয়ারি ব্রাদার্সের। সত্যিকার গুণে অর্জিত এই খ্যাতি। তবে, একটু দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে। গরমের সন্ধ্যায় ভিড় বেশি হয়। এখন বেশ খালি। দাম ৩ টাকা। উত্তর কলকাতায় আমার প্রিয় কুলফির দোকান শর্মা অ্যান্ড সন্স। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ এবং বিবেকানন্দ স্ট্রিটের মোড়ে। দাম একটু বেশি। ৩.৫০ টাকা। তবে সারা বছর পাওয়া যায় না। এখন শীতে এখানে কুলপি পাবেন না। যেমন পাবেন না আশুতোষ মুখার্জি রোডের ওপর জগুবাবুর বাজারের বিপরীতে ভীম নাগের দোকানে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়ে সব সময় পাওয়া যায়। এদের কুলফি অতি পরিপাটি, পরম সুস্বাদ। দামেও বড় বিবেচনাশীল, ২ টাকা। রামমোহন সরণির উত্তর প্রান্তে চঞ্চলা নামের মিষ্টির দোকানটিও কুলফির জন্য খ্যাত।

কুলফির চল খুব উত্তর ভারতে। শীতকালেও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, খদ্দের একটু কম হয়। কেন কম হয় জানি না। দারুণ শীতের মধ্যে হিমদেহ এই খাদ্যটি যেন মরসুমের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অপরূপ সঙ্গত করে। আস্বাদ নিলে শরীরের বাইরে, ভিতরে হিমনির্ঝর বইতে থাকে, মস্কোতে দেখেছি, নিউ ইয়র্কেও শুনেছি শীতকালে আইসক্রিমের কাটতি কিছু কমে না। জুতো-ডোবা বরফে দাঁড়িয়ে, কান-ঢাকা টুপি পরে, ওভারকোট চড়িয়ে সব বয়সের মানুষ সেখানে প্রচণ্ড শীতে আইসক্রিম সেবন করে। লক্ষ্ণৌতে অত শীত পড়ে না। তবু আমাদের বাঙালিদের কাছে কিছু কম নয়। এই সময় যদি লক্ষ্ণৌ যান আমিনাবাদের প্রকাশ অথবা দয়াল সিংয়ের দোকানে যাবেন। তাঁদের সৃষ্টি মুখে দিলেই অনুভব করবেন কেন এক একজনের এত খ্যাতি হয়। দিল্লিতে পাঁচকুঁইয়া রোডে আনারকলিও একদা বিখ্যাত ছিল। এঁরা আবার মাটির ভাঁড়ে কুলফি জমাতেন। আমরা প্রচণ্ড শীতের রাত্রে উষ্ণ ভোজনশালায় ভোজন সমাপ্ত করে কাঁপতে কাঁপতে আনারকলির কুলফির আস্বাদ করেছি। বুঝতে পেরেছি সে শিহরণ শীতের নয়, সুখের, পরম সুখের। মুম্বাইয়ের পারসি ডেয়ারির কুলফিও অতি মনোহর। খানদানি দোকান। নিজেদের দুধের কারবার। সক্রিম, নির্ভেজাল এমন কুলফি কমই পাওয়া যায়।

সভাসদদের বর্ণনা তো হল। এবার রাজার কথা বলি। রাজা নয়, রাজ-পরিবার। যদিও সবাই এক পরিবারের নয়। এঁদের অধিকাংশের বাড়ি বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় এবং সকলের পদবি কোনও অপ্রকাশিত কারণে সিংহ। সিংহবাহিনীর সবাই উত্তম

কুলফি প্রস্তুত করেন। কিন্তু তারই মধ্যে কারও পক্ষপাত গোপাল সিংহ, কেউ বিশ্বনাথ সিংহের ভক্ত। আমার ভক্তি সর্বদেবতায়, তাই এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে সমান আনন্দ দেন। সারা বছর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে আসর সাজিয়ে এঁরা বসে থাকেন। ছোট সাইনবোর্ডে প্রত্যেকের বড় করে নাম লেখা। এরই ধনাঢ্য আলোকোজ্জ্বল সংস্করণ মুম্বইয়ের চৌপাটি। সেখানেও এমনি বিবিধ কুলফি পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে আলো বড় বেশি। আধো অন্ধকারে অভিসারের আনন্দ সেখানে অনুপস্থিত। দয়িতার সঙ্গে মিলনের সুখও যেন তেমন জোয়ার বইয়ে দেয় না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কুলফির বিশেষত্ব হল—তার বৈচিত্র্য। এখন শীতের সময়, আতা যাই যাই করছে, কমলালেবু সগৌরবে উপস্থিত। চিকু বা সপেটার কুলফিও পাবেন। আমার প্রিয় কমলালেবুর কুলফি। রূপে গুণে এমন বরবর্ণিনী আর পাবেন না। আস্ত একটি লেবুর মধ্যে থেকে কোয়াগুলি বের করে সেখানে কমলালেবু মিশিয়ে কুলফি জমান। কিন্তু স্বাদে গন্ধে, এমন প্রগলভ কুলফি বুঝি হিমগর্ভে কমলালেবুর সঙ্গে আশ্লিষ্ট থেকে তবেই সৃষ্টি হয়। ছুরি দিয়ে চার টুকরো করে কেটে আপনাকে কুলফিটি দেওয়া হবে। যৌগিক রসায়নের কোনও ক্রিয়ায় আপনি বুঝতে পারবেন না কোথায় কুলফি শেষ হল, কোথায় কমলালেবুর ত্বকের শুরু। ৪ টাকা দাম। কিন্তু আর একটি খাবার ইচ্ছা হবে। ইচ্ছা দমন করে এবার আতার কুলফি পরখ করুন। আতার দুর্লভ সুগন্ধ কেমন সহজে এই কুলফিতে ধরা থাকে। দুধ আর আতার অপূর্ব সংমিশ্রণ আপনাকে অন্য এক রসের জগতে উত্তীর্ণ করবে। দাম ঈষৎ কম, ৩.৫০ টাকা। এখানে কেসর বা পেস্তার কুলফিও পাওয়া যায়, তারাও কিছু কম যায় না। সহস্র রূপবান রাজকুমারের সামনে বেপথু স্বয়ংবরা যেমন বিভ্রান্ত হয়ে অনভিপ্রেত মাল্যদান করে ফেলেন, আপনারও তেমনি হতে পারে। তবু ঠকবেন না। এরা সবাই স্বাধীন রাজা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সভায় কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের স্থান নেই।

আমার শৈশবের স্মৃতিকে এরাই স্বাদে সুগন্ধে আলো অন্ধকারে মূর্ত করে রেখেছেন।

আনাজের রাজা

সুকুমার রায় যতই লিখুন না কেন,
লেখা আছে কাগজে
আলু খেলে মগজে
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে
বুদ্ধি গজায় না।

আলু আমাদের বাঙালিদের হেঁসেলে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। আলুর উপস্থিতি প্রায় সর্বত্র—ডালনা, ঘণ্ট এবং চচ্চড়িতে তার অব্যর্থ আবির্ভাব। হয়তো সেই জন্যই আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম।

তা ছাড়া শুধু বাংলা নয়, সমগ্র উত্তর এবং পশ্চিমভারতেও আলুর প্রতাপ। তবু উত্তরভারতে শুধুমাত্র কপির ব্যঞ্জন হয়, নিঃসঙ্গ বাঁধাকপিরও হতে পারে। আমাদের ভোজনপাত্রে কপি বা বাঁধাকপি আলু সঙ্গে না নিয়ে আসতে চায় না। ভাল তবলচি না থাকলে বড় গাইয়ে বাজিয়েরা যেমন আসরে বসতেই চান না।

কিন্তু আলুর এই প্রতাপ তো অতি সামান্য ঘটনা মাত্র। আলু হল ইতিহাসের বিষয়। বস্তুত, মানুষের ইতিহাসে আলু যে স্থান অধিকার করে বসে আছে, তার কাছে অন্য কোনও সবজি দাঁড়াতেই পারে না।

অথচ, আলুর সঙ্গে বহির্বিশ্বের পরিচয়ের এখনও পাঁচশো বছর হয়নি। আলু আসলে দক্ষিণ-আমেরিকার আনাজ। স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে অথবা স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আলু এনে এই পূর্ব গোলার্ধের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। স্যর ওয়াল্টার আয়ারল্যান্ডেও আলুর প্রচলনের পথিকৃৎ। ঘটনাটা ১৫৮৬ সালের।

কিন্তু আলুর সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের এমন ঝটিতি প্রণয় হয়ে গেল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আয়ারল্যান্ডের মুখ্য ভোজ্য হয়ে উঠল আলু। চাল নয়, গম নয়, বাজরা জোওয়ারও নয়, আয়ারল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ মানুষের সকাল সন্ধ্যার ভোজ্য তখন আলু।

অত প্রেম ভাল নয়। বিষময় ফলও হয়েছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ কী এক অজ্ঞাত মারি দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের সমস্ত আলুর ফলন ধ্বংস করে দিয়েছিল। মানুষ প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তারা আলুর ওপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শেষে আমাদের বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের মতো হা অন্ন হা অন্ন অর্থাৎ হা আলু, হা আলু, করতে করতে দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। আরও দশ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়া হয়েছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, শুনেছি আয়ারল্যান্ড আজও আলুনির্ভর। ইউরোপের অন্যত্র আলুর প্রবেশ অত সহজ হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে আলুর অভ্যর্থনা হয়েছিল। জার্মানি যখন আলুকে সাদরে গ্রহণ করেছে, তখনও ফরাসিরা আলুকে খুব সন্দেহের চক্ষে দেখেছে।

রাজা ষোড়শ লুই স্বয়ং আলুভক্ত। রানি আরও। অবশ্য ভোজ্য হিসাবে যত না হোক, রানি আলুগাছের ফুল ভালবেসে ফেলেছিলেন। চুলে আলুর ফুল গুঁজে পাত্র-মিত্রদের স্ত্রীদের ঈর্ষান্বিতা করতেন। রানি, অর্থাৎ মারি আন্তয়নেতকে আলুর ফুল উপহার দিয়েছিলেন ফরাসি সৈন্যবাহিনীর জনৈক প্রধান পেরমতিয়ে (Permentier)। অবশ্য আলু উদ্ভিদের সঙ্গে ফরাসিদের তখন পরিচয় হয়ে গিয়েছে। আলুর সুদৃশ্য চারা দিয়ে ঘর সাজানো পছন্দ করতেন অভিজাত ফরাসিরা।

সাধারণ ফরাসি নাগরিক আলুকে সুনজরে দেখে না বলে পেরমতিয়ে একটি কৌশল করলেন। প্যারিস শহরের কাছে এক মস্ত মাঠে তিনি আলুর চাষ শুরু করলেন। সারাদিন সেখানে প্রচণ্ড পাহারা থাকে। যাতে কেউ না ওই ফসল চুরি করতে পারে। রাত্রে প্রহরী থাকে না। আসলে সেটাই পেরমতিয়ের কৌশল। নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর মানুষের আকর্ষণ সেই স্বর্গোদ্যানের আপেল ভক্ষণের সময় থেকে চলে আসছে। ফরাসিরা যেই দেখল দিনমানে কঠোর-পাহারা-দেওয়া, তাদের আহরণের-অতীত ফসল রাত্রে অনায়াসে চুরি করা যায়, তখন তারা প্রচুর আলু গাছ তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ির বাগানে বা খোলা জায়গায় লাগাতে থাকল। ক্রমে আলু ফলল এবং ফরাসিরা স্বাদ নিয়ে দেখল যে আনাজটি নেহাত ফেলনা নয়। তারপর থেকে ফ্রান্সে আলুর চাষ বিস্তৃত হয়েছে। ফরাসি রান্নার মহাভারত লারুস গাস্ত্রোনমিকে দেখছি আলু দিয়ে প্রস্তুত অর্ধ শতাধিক পদের বিবরণ বা প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া আছে। একটি পদের নাম নেই। অথচ একদা এই পদটির জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী লালায়িত হয়েছিলাম।

আমরা সে বছর প্রথম প্যারিসে গিয়েছি। প্যারিসের অন্যতম রাজপথ গ্রাঁ বুলভার্দের কাছাকাছি একটা মাঝারি হোটেলে থাকি। ভ্রমণ সহায়িকা কোনও পুস্তিকায় পড়লাম, গ্রাঁ বুলভার্দের ওপর যে কাফে দ্য লা পে নামের কফিখানাটি আছে, তার বারান্দা, অর্থাৎ সংলগ্ন ফুটপাথে বসে কফি বা মদিরা পান করতে করতে সামনে দিয়ে সারা পৃথিবীর যাওয়া-আসা না দেখলে প্যারিস আসা বৃথা, হয়তো বা জীবনই বৃথা।

অতএব এক বৈকালে কাফে দ্য লা পে-তে উপস্থিত হলাম। কাফের ফ্রন্টেজ খুব বিস্তৃত, আর সংলগ্ন ফুটপাথ জুড়ে সেই বিস্তারে ছোট ছোট টেবিল পাতা রয়েছে, সঙ্গে একাধিক চেয়ার। স্থান পাওয়া কঠিন। তবু সামান্য ধৈর্য ধরতেই একটা টেবিল খালি পাওয়া গেল। বসে পড়লাম। জানি একবার বসলে কেউ উঠতে বলবে না। যতক্ষণ খুশি বসে থাকতে পারেন। সম্ভব হলে একপাত্র পানীয় নেবেন, নাও নিতে পারেন। সত্যিই আশ্চর্য লোক চলাচল, কত দেশবিদেশের মানুষ, স্বপ্ন-সম।

আমরা মাঝে মাঝেই সেখানে যেতাম। ইচ্ছা হল এখানে রোজ প্রাতরাশ সারি। ডিম ভাজা, এক চিলতে বেকন, কিছু পাঁউরুটি ও হট চকোলেট, এই ছিল আমাদের দৈনন্দিন মেনু। দু একদিনের পর আর ভাল লাগে না, অন্য কিছুর স্বাদ নেবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সাহস করে আদেশ করতে পারি না, কারণ ফরাসি ভাষা আমাদের অধিগত নয়।

মেয়েদের চোখের বাহাদুরি আছে, একদিন আমার স্ত্রী আর এক টেবিলের দিকে দেখালেন। দেখি তারা এক পাত্র ফুলুরি জাতীয় কিছু খাচ্ছেন।

কী করে পরিচারককে বলি ওই পদটি আমাদের চাই। খাদ্যতালিকা অনেক গভীরভাবে দেখে মনে হল একটি পদ সম্ভবত ওই ফুলুরি হবে। আদেশ করা গেল। সম্পূর্ণ অজানা এবং সুখদায়ক নয়, এমন একটি পদ উপস্থিত হয়েছিল। পরের দিন আবার গবেষণা করলাম দু জনে, এবং যে পদটি এল আমাদের আদেশে, সেটি পাঁউরুটির ছোট ছোট টুকরো ভাজা। আরও একবার বৃথা চেষ্টা করে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পদ খাবার পর, একদিন আমাদের শ্রম ও গবেষণা সার্থক হল। সেদিন একপাত্র সদ্য কড়া থেকে তোলা আমাদের পরম-আরাধ্য দূর-থেকে-দেখা সেই ফুলুরি এল। কী আনন্দ হয়েছিল, বোঝাতে পারব না। একটি ফুলুরি মুখে দিতে আনন্দ যেন দ্বিগুণ হল। যে পদ আদেশ করেছিলাম, তার নাম, পম নাপলিটান। ফরাসিরা আদর করে আলুকে বলে পম দ্য তেয়র। অর্থাৎ ক্ষেতের আপেল। ফুলুরিগুলি আলুর বড়া বলতে পারি, যেন টিকিয়ার আলু আরও মিহি করে বেটে, রসুনের সুগন্ধে সুবাসিত করে ভাজা।

সে পদের তুলনা হয় না। প্রস্তুতের যে পদ্ধতি আমি বললাম, সেটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে, কিন্তু পদটিকে ভুলতে পারি না।

লারুস গাস্ত্রোনমিকে পম নাপলিটান না থাকা আশ্চর্য নয়। হয়তো এটি নতুন একটি পদ, এখনও অভিধানে ওঠেনি, অথবা কাফে দ্য লা পে-র নিজস্ব এই নাম।

ইউরোপে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হয়নি আলুর। ইংল্যান্ডে প্রটেস্টান্টরা এক সময় আলু ভক্ষণ গর্হিত মনে করতেন। ক্যাথলিকরা আলু খেতে সাহস পেতেন না, কারণ বাইবেলে এই সবজির উল্লেখ নেই। আলু খেলে কুষ্ঠরোগ হতে পারে এমন ভয়ও ছিল কোনও কোনও মানুষের।

ভারতবর্ষে আলুর প্রবেশ ১৬১৫ সালে, এই কথা বলেন ঐতিহাসিকরা। চারশো বছর আগে লেখা মুকুন্দরামের কাব্যে বিবিধ ব্যঞ্জনের তালিকায় আলুর উল্লেখমাত্র নেই। তার পরেও ভারতচন্দ্রের অতিবিস্তৃত ব্যঞ্জন তালিকাতেও আলু বা আলুযুক্ত কোনও ব্যঞ্জনের নাম পাওয়া যায় না। তার একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে আলু এ দেশে পৌঁছলেও সাধারণের প্রিয় ছিল না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বইতে

তাঁর শৈশবের কিছু ভোজ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁর ছোটবেলায় আলুর চল ছিল না। পরে আলু এসেছিল মহেন্দ্রনাথের ছোটবেলায়, ১৮৮০ সালের আশেপাশে।

অনুমান করি ওই সময়ের পরই আলুর জয়যাত্রা শুরু হয়ে যায়। কারণ ১৯০০ সালের আশেপাশে প্রকাশিত প্রজ্ঞাদেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' বইতে এবং বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাকপ্রণালী'তে আলুজাত ব্যঞ্জনের ছড়াছড়ি।

গবেষকরা বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে আলুর চল হয়েছিল দু-হাজার বছর আগে। সেখান থেকেই আলুর সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু। বছর দুই আগে পেরু রাষ্ট্রের কুজকো শহরে গিয়েছিলাম। কুজকো শহর আন্ডিস পর্বতমালার এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। প্রথম যুগের আলু নাকি এমন উচ্চতায় জন্মাত। পেরুতে সত্তর আশি প্রকারের আলু পাওয়া যায়। কুজকো শহর থেকে সামান্য দূরে উরুবাম্বা নদীর পাড়ে পুকাপুকারার ইন্ডিয়ান বাজারে গিয়েছিলাম। দেখলাম দশ-বারো রকম আলু বিক্রি হচ্ছে। শুনলাম চাইলে অন্যান্য প্রজাতির আলুও পাওয়া যাবে। এতেও ওখানকার আদিবাসীদের মন ভরে না, বাজারে উপরন্তু রোদে শুকনো আলুও বিক্রি হচ্ছিল।

অবশ্য আট-দশ প্রকারের আলু কিছু বড় কথা নয়। খোদ আমেরিকাতেও সাধারণ সুপার মার্কেটে পাঁচ-সাত প্রকারের আলু বিক্রি হয়। হবার কথাও। ভোজনরসিকের কাছে বিভিন্ন প্রজাতির আলুর স্বাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরা পড়ে। তা ছাড়া, যে আলু রোস্টের জন্য প্রশস্ত, তাই দিয়ে তো পম ফ্রিট বা আলুভাজা বানানো যায় না। বানালেও সেটা গর্হিত কাজ হবে। এ ছাড়া সিদ্ধ করে খাবার আলুর যে যোগ্যতা, তাই দিয়ে তো আর হ্যাশ ব্রাউন করা যায় না। চিপস বানাবার আলুও অন্য বিশিষ্ট জাতের। ম্যাশড পোটাটোর জন্যও বিশেষ আলু আছে। অন্য আলু দিয়ে ম্যাশড বানালে তো পাপাচার হবে।

আমেরিকানরা প্রচুর আলু খায়। তাদের নানা পদের মধ্যে আমার প্রিয়তম হল বেকট পোটাটো ইন জ্যাকেট। এই পদটি আমাকে আমার বাল্যপ্রণয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপ্লুত করে দেয়। ছোটবেলায় আমাদের ছোট শহরে কাঠের উনান এবং কয়লার উনান উভয়ই চালু ছিল। বেগুনপোড়া এবং আলুপোড়া কি কয়লার আগুনে হয়? তার জন্য কাঠের আঁচ অবিচ্ছেদ্য। আলুপোড়া আমার অতি প্রিয় ভোজ্য ছিল। তার স্বাদ অন্য জগতের। আলুর খোসার পোড়া পোড়া মাদকতাময় সৌরভ আমাকে জাদু করেছিল। ক্রমে ছোট শহর থেকে বড় শহরে এলাম, কাঠের উনুন নির্বাসিত হল, তার সঙ্গে আমার বাল্যপ্রণয় আলুপোড়াও লুপ্ত হয়ে গেল। আমেরিকার বেকড আলু যেন সেই আলুপোড়ারই শোভন সংস্করণ। শোভন মানে সর্বথা সুন্দর নয়। বেকড আলুতে দগ্ধ খোসার সৌরভ নেই, কিন্তু মন ভোলাবার অন্য উপকরণ উপস্থিত। প্রথমত বৃহৎ আইডাহো পোটাটো বুঝি বেকড হবার জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন। তার ওপর অনুষঙ্গ দুটিও তার অপার্থিব স্বাদে সাহায্য করে। বেকড আলু প্রচুর পরিমাণ মাখন এবং ততোধিক স্বাদু সাওয়ার ক্রিম সহযোগে গ্রহণ করা বিধেয়। আমার বাল্যপ্রণয়ের কথা মনে পড়ে, অথবা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ পাবার সুখে চোখে জল এসে গিয়েছিল, বলতে পারব না। আমাদের আলুও বেক করা যায়, কিন্তু সে সুখের তিলমাত্রও পাওয়া যায় না।

আরও একটি আলুঘটিত পদ আমার প্রিয় ছিল। এখনও আছে। আলুর খোসা ভাজা। আমেরিকাতে এই পদটির জন্যও বিশেষ এক প্রজাতির আলু আছে যার খোসা কিঞ্চিৎ স্থূল। ছোটবেলায় মা কাকিমারা আলুর খোসা ফেলে না দিয়ে, সামান্য পোস্ত ছিটিয়ে এবং শুকনো লঙ্কা সহযোগে ভেজে যে পদটি প্রস্তুত করতেন, কখনও ভাবিনি আর কেউ তার সমকক্ষ পদ প্রস্তুত করতে পারবে।

বছর কয়েক আগে লস এঞ্জেলেসে এক বন্ধু সমুদ্রের জেটির ধারে এক ভোজনশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই পানীয়ের সঙ্গে আদেশ করেছিলেন পোটাটো স্কিনের। পোস্ত নেই, শুকনো লাল লঙ্কা নেই, কী এমন স্বাদ হবে পোটাটো স্কিনের? অকারণ আশঙ্কা করেছিলাম। এই পদটিও অপূর্ব, তার কারণ বিশেষ প্রজাতির স্থূল আবরণের আলুর খোসা দিয়ে তৈরি করা হয়। তার ওপর এখানেও সাওয়ার ক্রিম সহযোগে মদিরার সঙ্গে গ্রহণ করে সন্ধ্যাটা মোহময় হয়ে উঠেছিল।

তারপর যখনই আমেরিকা গিয়েছি পোটাটো স্কিনের খবর নিয়েছি। আলু চিপসের মতো আলুর খোসা ভাজা প্যাকেট-বন্দি পাওয়া যেত। ঘরে এনে সাওয়ার ক্রিম সহযোগে লস এঞ্জেলেসের সেই প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যাটাকে নতুন করে সৃষ্টি করতাম।

সেবারে গিয়ে দেখলাম প্যাকেট-বন্দি পোটাটো স্কিন আর পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করি, আমেরিকানরা ওই পদটিকে গ্রহণ করেনি।

দুঃখ হল। আনন্দও হল এই ভেবে যে, আমেরিকানরা যদিও সব দেশের ভাল খাদ্যগুলি খেয়ে নিচ্ছে, তারা সুখাদ্য আলুর খোসাটা অন্তত আমাদের জন্য রেখে দিয়েছে।

এখন ইউরোপের সর্বত্রই আলুর চল। কোথাও কম, কোথাও বেশি। আলুর সুপ, আলুর সালাদ, বিভিন্নরূপে আলু ভাজা, আলুর রোস্ট—সব দেশেই উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। তার মধ্যে জার্মানি ও রাশিয়াতে ভোজ্যে আলুর প্রাধান্য দেখা যায়। রাশিয়ানরা আবার আলুর অন্য একটি প্রয়োগে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। রাশিয়ার ভদকা আলু থেকে উৎপন্ন হয়। ভদকা রাশিয়ার জাতীয় পানীয়। ভদকার জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যা আহারের জন্য রাশিয়াতে আলুর বিস্তৃত চাষ হয়।

একবার ভারতীয় এক ছাত্রের সঙ্গে তাশকেন্টে দেখা হয়েছিল। ছেলেটির বাড়ি কলকাতায়। সে বলেছিল, রাশিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে। ওদেশে পঠনপাঠন হয় রাশিয়ান ভাষায়। অথচ, সে এবং আরও অনেক ছাত্র রুশ ভাষার বিন্দুবিসর্গ জানে না। তাদের তাশকেন্টে বিদেশি ভাষা শিক্ষার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে রুশভাষা শেখবার জন্য।

ছেলেটি বলল, রাশিয়ান ভাষা চরিত্রে সম্পূর্ণ পৃথক, ইংরাজি ভাষার মতো নয়। তার ব্যাকরণ, লিপিও আলাদা। শিখতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল।

তখন ক্ষেত থেকে আলু তোলবার সময়। অনেক শ্রমিকের দরকার। স্কুল-কলেজ থেকে বহু ছাত্র দেশ জুড়ে আলু তোলবার কাজে লেগে যায়। ওই ছেলেটির ভাষাবিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই আলু তুলতে যেতে হয়েছিল।

ছেলেটি বলল, পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু যেহেতু আশেপাশে সব ছেলেরা রাশিয়ান

বলে, সে এবং তার বন্ধুরা এক মাসেই অনেকখানি রুশ ভাষা শিখে গিয়েছিল। একটাই অসুবিধা ছিল শুধু। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা ভোজনপাত্রে শুধু আলু থাকত।

জার্মানির আলুঘটিত বিভিন্ন পদের আলোচনা করছি না এই কারণে যে, নতুন কোনও আলুযুক্ত ব্যঞ্জন পরখ করবার সুযোগ হয়নি। একটি পদ ছাড়া।

সেই পদটি আলুর সুপ। কিন্তু আলুর উপস্থিতি এখানে অন্যরূপে, ভিন্ন চরিত্রে। সুপের নাম গ্নয়ডেল। যখন সুপের বাটি এসে পৌঁছল, দেখি হালকা ঝোলে চারটি পিংপং বলের সাইজের গোলক ভাসছে। এই গোলকগুলি জটিল প্রক্রিয়ায় আলু থেকে উদ্ভূত। আলু কুরে, তার গোলক তৈরি করে ভাপিয়ে নিয়ে নাকি ওই পিংপং বল তৈরি হয়। সাবধানে খেতে হয়েছিল। বলগুলি কিছুটা রবারের মতো, হঠাৎ চামচের চাপে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। স্বাদ ভাল ছিল। যত অভিনব, তত স্বাদু নয়।

পুব দেশে ভারতবর্ষ পর্যন্ত আলু জনপ্রিয়, অথচ তার পর পুব দিকে আলুর চল ক্রমশ কমে আসে। চিন দেশে আলুর প্রসার হয়নি বললেই চলে। বছর পঁচিশ আগে, যখন চিনের নিয়মকানুন শিথিল হতে আরম্ভ করেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর, আমি চিনে গিয়ে তিন সপ্তাহের অধিক ছিলাম। মাত্র দু দিন খাবার টেবিলে আলু উপস্থিত হয়েছিল।

প্রথম ঘটনা সাংহাইতে। সদ্য হস্তান্তরিত একটি বিলিতি হোটেলে। তারা বোধহয় তখনও খোঁয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মাংসের কোনও পদের সঙ্গে কয়েকটি সিদ্ধ আলু ছিল।

দ্বিতীয়বার পিকিং হোটেলে। বেজিং শহরের সুপ্রাচীন হোটেল। সেখানে রাত্রের ভোজনে বারো-চোদ্দোটি পদের মধ্যে একটি ছিল চাকা করে কাটা আলুভাজা।

চিন দেশে প্রকাশিত পাকপ্রকরণেও দশ-বারোটির বেশি আলু-সংযুক্ত পদের উল্লেখ পাইনি।

কোনও কোনও দেশ আলুর প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দক্ষিণ ভারতে কোনও ব্যঞ্জনে আলুর ব্যবহার নেই। আলু পাওয়া যায় শুধুমাত্র মশালা দোসার মশালায়, অর্থাৎ পুরে। দোসার ওই পুরটুকু ছাড়া আর ত্রিসীমানায় আলু পাওয়া যায় না বিন্ধ্যপর্বত পার হলে। মনে হয় যেন বিন্ধ্যপর্বত আলুর জয়যাত্রা রুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আলুর সবই ভাল। কিন্তু সুকুমার রায়ের পাউরুটি আর ঝোলাগুড়ের মতো সবার চাইতে ভাল, আতপ চালের তপ্ত ভাতের সঙ্গে ঘি দিয়ে আলুভাতে। তার বুঝি তুলনা মেলে না।

বড্ড উপকারী বন্ধু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ডিম বললে আমরা বুঝতাম হাঁসের ডিম। মুরগির ডিমের প্রবেশ ছিল না হিন্দু হেঁশেলে। কী কারণে হিন্দু বাঙালি সংসারে মুরগির ডিম ব্রাত্য হয়ে ছিল, আমার জানা নেই। এ নিয়ে কোনও গবেষণাও করিনি। ডিমের, অর্থাৎ হাঁসের ডিমের মামলেটই আমাদের যৎপরোনাস্তি সুখ দিয়েছে। তখন পর্যন্ত, মুরগির ডিমের মতো অমলেট শব্দটাও আমাদের অপরিচিত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের রীতিনীতি, অভ্যাসে, আচরণে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তারপর থেকে আর হাঁসের ডিমের মামলেটের চল নেই। উত্তর কলকাতার পাড়ার কেবিন কাফে হোটেল রেস্টুর‍্যান্টেও নয়। বাজার থেকে ডিম আনতে বললে এখন অবশ্যই মুরগির ডিমই আসবে।

আমাদের কৈশোরে, ষাট বছর আগে হাঁসের ডিমের মামলেটের সর্বোত্তম রচনা হত চিত্তবিশ্রাম রেস্টুর‍্যান্টে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও হেদোর উত্তর-পশ্চিমদিকে বড় রাস্তার উপর ছোট এই রেস্টুর‍্যান্টে মামলেট গ্রহণের জন্য আমরা কলুটোলার হিন্দু হস্টেল থেকে এখানেই আসতাম।

আমরা, যারা মামলেট বা অমলেটকে সাধারণ, সামান্য ভোজ্য বলে গণ্য করি, তারা ইউরোপীয় পাকপ্রকরণ পড়ে অবাক হয়ে যাই। বিদেশি রন্ধন-বিশারদদের বিশ্বাস, অমলেট রচনা সহজ কার্য নয়। তাঁরা বলেন, পাকশাস্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণ অধিকার থাকলে তবেই যথার্থ সুখদায়ক অমলেট সৃষ্টি করা যায়। একটি ফরাসি মন্তব্য পড়েছি, অমলেটের জন্য শুধু পাকশাস্ত্রের জ্ঞান নয়, প্রচুর আত্মবিশ্বাসও প্রয়োজন। আনাড়ি হাতের কাজ নয় অমলেট!

তাও তো বিদেশী পিঁয়াজকুচি ও কাঁচা লঙ্কা সংযুক্ত হয় না অমলেটে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা যে যাই বলুন, বাঙালিধারায় কাঁচালঙ্কা-পিঁয়াজ যুক্ত না হলে অমলেটের কোনও স্বাদই হয় না, মৃদঙ্গহীন ধ্রুপদ গানের মতো, আলুনি তরকারির মতো মনে হয়। চিজ, মাশরুম অথবা হ্যাম বা মুরগির খণ্ড সহযোগে যে অমলেট তৈরি হয়, তাও আমাদের অমলেটের কাছে কলকে পায় না।

সে যুগের কফি হাউসে প্রবর্তিত হয়েছিল চিকেন অমলেট তার সঙ্গে, বলতে লজ্জা নেই, প্রথম পরিচয়েই আমাদের প্রণয় হয়েছিল।

কলকাতার আর একটি নতুন ভোজ্য তখন আমাদের আনন্দ দিয়েছিল। বিদেশি সেই পদটির নাম ডিমের ডেভিল। আজকের মহাত্মা গান্ধি রোডের ওপর দিলখুশা কেবিনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। দিলখুশাতেই প্রথম ডেভিলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। শুনেছি এখনও দিলখুশার ডেভিল সমঝদারদের আনন্দ দেয়। ডেভিলের শুদ্ধ, পুরো নাম স্কচ এগ। হয়তো স্কটল্যান্ডে উদ্ভূত হয়েছিল। আমার স্থির বিশ্বাস, জন্মভূমি স্কটল্যান্ডের চেয়ে কলকাতার দিলখুশার ডেভিল অনেক বেশি সুস্বাদু।

কলকাতার আরও একটি ডিমের পদ উল্লেখ না করলে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পদটির নাম নার্গিস কোফতা। একমাত্র রবীন্দ্র সরণির রয়্যাল ছাড়া আর কোথাও এই নয়নলোভন সুখস্বাদ পদটি পাওয়া যায় না। সিদ্ধ একটি ডিমের ওপর মিহি কিমার পলস্তারা, পরম রমণীয় ঝোলে নিমজ্জিত এই পদটির তুলনা পাওয়া ভার। সম্ভবত অতুলনীয় করে রাখবার জন্যই পদটিকে দুর্লভ করে রেখেছে রয়্যাল। শুধু বুধবার পাওয়া যায় নার্গিস কোফতা। অন্য কোনও দিন নয়।

নরওয়েজিয়ান অমলেট হল আদি নাম, এখন অনেকে বেকট আলাস্কা বলেন। আইসক্রিমের ওপর ডিমের শ্বেত অংশের প্রলেপ দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ করিয়াক বা কির্শ ঢেলে বেক করা হয় অথবা আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা-গরমের বিচিত্র সংযোজনে এই পদটির প্রলোভন রসিকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। নরওয়েজিয়ান অমলেট নিয়ে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে গুণীজনেরা যেটি বিশ্বাস করেন, সেই কাহিনী বলে শ'দেড়েক বছর আগে জনৈক চিনা পাচক সম্রাটের কাছে, প্যারিসের গ্রান্ড হোটেলের পাকশিল্পী এই পদটি প্রস্তুত করার গোপন মন্ত্রটি সংগ্রহ করেন।

এখন অবশ্য আমাদের অমলেটও মুরগির ডিম-সঞ্জাত হয়। সারা বিশ্বেই আদর করে কেউ হাঁসের ডিম খায় বলে শুনিনি। জাপানে তিন বিশিষ্ট পদের অন্যতম হল সুকিয়াকি। পাতলা, সরু বিফ খণ্ড মিনিট খানেক সয়া সসে রান্না করলে সুকিয়াকি তৈরি হয় শুনে খুব একটা আগ্রহ ছিল না পরখ করবার। যে পরিচারিকা আমার টেবিলে রান্না করছিলেন তিনি বললেন, কাঁচা ডিমে অসুবিধা হবে না তো?

মিনিট খানেক বিফ চিলতেগুলি সয়া সসে পাক হবার পর কাঁচা ডিমে ডুবিয়ে সেবন করা বিধি। আমার ভয় তত নয় কাঁচা ডিমে, যতটা মিনিট খানেক পাক করা মাংসখণ্ডে। ডিম ছাড়া সুকিয়াকি হয় না। বিফ শ্রেডস ও কাঁচা ডিম— দুয়ে মিলে অপূর্ব পদটি তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা সুকিয়াকির ভোজনশালা খোলেন, যেখানে একমাত্র পদ সুকিয়াকি। এক সন্ধ্যায় সুকিয়াকির স্বাদ নেবার পর, অন্য ভোজ্য কে গ্রহণ করবে? সে আর যাই

হোক জাপানি নয়।

ডিমের কথা লিখতে বসে আমরা হাঁস-মুরগির ডিমের কথাই কেন বলছি? সেরা ডিম তো কুক্কুট জাতীয় প্রাণীর নয়, মাছের। এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মতবিরোধ নেই। ইউরোপ, আমেরিকায় মাছের যে ডিম অতি মূল্যবান এবং অপরিমেয় স্বাদু বলে আদৃত হয় তার নাম কাভিয়ার। কাভিরায় সরষে ও ধনের মাঝামাঝি মাপের কৃষ্ণবর্ণ ডিম্বগুচ্ছ। পাওয়া যায় সামুদ্রিক মাছ স্টাজন থেকে। ওয়াইন ও কাভিয়ার পার্টি শুধুমাত্র ধনবানদেরই সাধ্যে কুলোয়। কেতাদুরস্ত নিমন্ত্রণের প্রথম পর্বে কাভিয়ার হলেই চলবে না, ক্যাসপিয়ান হ্রদের ইরানের উপকূলের স্টাজন মাছের ডিমের কাভিয়ার চাই। তবেই জাত্যভিমান বজায় থাকে। আরও এক ধরনের কাভিয়ার আছে, সোনালি রঙের সেই ডিম্বগুচ্ছ পাওয়া যায় সামন মাছ থেকে। তার আদরও কম নয়। নাম দেওয়া হয়েছে রেড কাভিয়ার। অথচ আক্ষেপের কথা, কাভিয়ার আমার আদৌ ভাল লাগে না। আমার বিশ্বাস, আপনাদেরও ভাল লাগবে না। কাভিয়ারের উৎকট গন্ধই আমাকে এই ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিরূপ করেছে।

তা ছাড়া, আমরা ইলিশ মাছের ডিমের ঐতিহ্যে মানুষ হয়েছি। মাছের ওই স্বর্গীয় ডিমের পাশে অন্য কোনও ডিমই দাঁড়াতে পারে না। অভাবনীয় এই ভোজ্যের বাঙালিদের যেমন পরিচয় আছে, ভারতবর্ষে আর কারও তেমন নেই। ইলিশও মূলত সামুদ্রিক মাছ। পশ্চিম উপকূলে মুম্বই থেকে করাচি পর্যন্ত ভিং এবং পালা নামের দুটি মাছ ইলিশের সগোত্র। কিন্তু তারা বাংলার ইলিশের মতো মিষ্টি জলের গঙ্গায় ধৃত হয় না। তাই তারা স্বাদে নিকৃষ্ট। তাদের ডিমের ছড়া বড় হয়, দানাগুলিও বড়, কিন্তু গঙ্গাজলের দাক্ষিণ্য পায়নি বলে স্বাদে একটু পিছিয়ে থাকে।

আমেরিকানরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখাদ্য খেয়ে নিচ্ছে বলে তাদের ওপর আমার চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে। মাছের ডিমের ক্ষেত্রেও কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্যাড নামে ইলিশ মাছের সগোত্র এক জাতের মাছ পাওয়া যায় আমেরিকাতে। শ্যাড স্বাদে ইলিশের অনেক পিছনে পড়ে। কিন্তু শ্যাডের ডিম ইলিশ মাছের ডিমের সঙ্গে পাল্লা দেয়। আমেরিকাতে শ্যাডের ডিম লোভনীয় খাদ্যের শ্রেণীতে পড়ে।

অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমেরিকাতেও ডিম প্রধানত প্রাতরাশের খাদ্য। বয়েলড, হাফ বয়েলড, ফ্রায়েড, পোচড এগ—এর কোনও একটি ব্রেকফাস্টে অবশ্য পাওয়া যাবে। আমেরিকাতে ডিমের আর একটি পদ আমাকে আকর্ষণ করে। তার নাম কিশ (Quiche)। ফেটানো ডিমের সঙ্গে মাংসাদি মিশিয়ে বিস্কুট জাতীয় কোনও পদার্থের ওপর সাজিয়ে বেক করা হয়। অলৌকিক কিছু নয়, তবে স্বাদবদলের জন্য উত্তম সংযোজন। ডিম দিয়ে তৈরি, আমাদের পাটিসাপটার মতো প্যানকেকও আমেরিকানদের সমান প্রিয়।

সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, রন্ধনকলায় ফরাসি এবং চিনারা সর্বাগ্রগণ্য। ফরাসি পাকপুস্তকে দেখেছি সাতাত্তর প্রকার ওমলেট প্রস্তুত করবার বিধি লেখা রয়েছে। চিনারা ডিমের তত অনুরাগী নয়। চিনা পাকপ্রণালীতে সামান্য কয়েকটি ডিম-আশ্রয়ী ব্যঞ্জনের বিবরণ আছে। ডিমের অন্যতম চিনা পদ হল থাউজান্ড ইয়ার ওল্ড এগ বা

হাজার বছরের পুরনো ডিম। নাম শুনেই চমকে ওঠবার কথা।

একদা চিন দেশে আমার নিমন্ত্রণকর্তা যখন গর্বের সঙ্গে আমার ভোজনপাত্রে হাজার বছরের পুরনো ডিম তুলে বললেন, না, না সত্যিই হাজার বছরের পুরনো নয়, তা হয়ও না, এ ডিম আমাদের রন্ধনবিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন, একদিনে তৈরি হয় না, অন্তত মাসখানেক সময় লাগে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে এবারে তাকিয়ে দেখলাম, সামান্য বেগুনির ছোঁয়া লাগানো কৃষ্ণবর্ণ একটি ডিম। সন্তর্পণে এক খণ্ড মুখে দিলাম। খুব যে আমোদিত হলাম তা নয়। তবু নতুনত্ব তো বটেই। শুনলাম, নানা জারকে মাসাবধি নিমজ্জিত থেকে সিদ্ধ করা ডিম অমনি কালো হয়ে যায়। আমার মনে হল স্বাদ অপেক্ষা পদটির নাম অধিক উপভোগ্য।

ফিলিপিন্সবাসীরাও তাঁদের একটি ডিমের পদের বিশেষ সুনাম করেন। পদটি পরখ করবার সুযোগ হয়নি আমার। ওঁরা নাম দিয়েছেন সলটেড এগ। নুন জলে মাসখানেক আস্ত ডিম ডুবিয়ে রাখলে সলটেড এগ তৈরি হয়। তারপর সেই ডিম ইচ্ছামতো নানাভাবে রন্ধন করা যায়।

হাঁস এবং মুরগি ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র প্লোভার সিগাল পাখির ডিম মূল্যবান খাদ্যের মধ্যে পড়ে। মুরগির ডিমের সঙ্গে স্বাদের তারতম্য কখনও ধরতে পারিনি। আকারে ছোট বলে সিদ্ধ অবস্থায় অন্যান্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। অমলেট বা অন্য কোনও পদ এই ক্ষুদ্র ডিমগুলি দিয়ে প্রস্তুত হয় না। কচ্ছপের ডিমের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত, ভালবেসে ভোজন করতেন এমন মানুষের সংখ্যা অল্প নয়।

নাইরোবিতে কার্নিভোর নামের এক ভোজনশালায় খাদ্যতালিকার মধ্যে ছিল উটপাখি বা অস্ট্রিচের ডিম। ওই বিশাল ডিমের খণ্ড দিয়ে কোনও পদ ভোজনের আগ্রহ হয়নি আমার।

আমাদের বাংলা ভোজ্যের তালিকায় ডিমের নগণ্য স্থান। বিপ্রদাস মুখুজ্জে মশায়ের পাকপ্রণালীতে দেখতে পাচ্ছি, ডিমজাত মাত্র সাতাশটি পদ বিধৃত হয়েছে। ফরাসি লারুস গাস্ত্রোনমিকে অমলেট বাদ দিয়ে ডিমের দুশো ষাটটি পাকপ্রণালী লেখা আছে। এ ছাড়া পাশ্চাত্য রান্নাবান্নায় নানাভাবে ডিমের ব্যবহার হয়। ওদেশি মিষ্টান্ন প্রস্তুতে ডিমের উপস্থিতি আবশ্যিক বলা যায়। আমাদের যেমন ছানা বা ক্ষীর ছাড়া মিষ্টান্ন হয় না, ডিম ছাড়া বিদেশি মিষ্টান্ন হয় না বলা চলে। ফল ও ক্রিম-যোগে অবশ্যই মিষ্টান্ন হয়, এবং আইসক্রিম। তবু ডিমের সঙ্গে পাশ্চাত্য মিষ্টান্নের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

বাঙালি পরিবারে একদা ডিম ফাস্টফুডের স্থান নিয়েছিল। সময়ে বা অসময়ে কেউ বাড়িতে এলে একটা মামলেট ও চা দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল। এখনও হয়তো অনেক বাড়িতে তাই হয়। কিন্তু বাইরের ফাস্টফুডের প্রতিযোগিতায়, ঘরের ফাস্টফুড বুঝি পিছিয়ে যাচ্ছে। তবু ডিমের আদর কম হওয়ার নয়। ফ্রিজে ছাড়াও বাড়িতে ক'দিন রাখা যায়, মোড়ের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, ডিমের মতো এমন উপকারী বন্ধু ক'জন আছেন বাড়ির গিন্নির? তা ছাড়া যতই কেন দেশবিদেশে ডিমের ইতিবৃত্ত শুনি, তীব্র লঙ্কা এবং ঝাঁঝালো তেল দিয়ে রান্না হাঁসের ডিমের ডালনার তুলনা আছে নাকি ভূভারতে? ওই একটি পদে হাঁসের ডিম ছাড়া জমে না।

পিঠে-পায়েস

ক্রিসমাসে যেমন কেক, বর্ষার দুপুরে খিচুড়ি, বিকেলে মুড়ি, পৌষ সংক্রান্তিতে তেমনি পিঠে। না হলে যেন দিনটা সম্পূর্ণ হয় না, অর্থশূন্য থেকে যায়। কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। সম্পূর্ণ হয় না এ কথা না বলে বলা উচিত, সম্পূর্ণ হত না। কেন না বহু পরিবারেই পিঠে এখন অতীতের বস্তু, তার সমস্ত আনন্দ কেবল স্মৃতিতে।

পৌষ মাস, সুখের মাস। কথায় বলে কারও পৌষ মাস। নতুন গুড়, নতুন চাল। পৌষ উৎসব। সেই উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল পিঠে। এখন আমরা পিঠের স্বাদ মেটাই কেক দিয়ে। কেকের দাম কিন্তু সহজে পাওয়া যায়। সর্বত্র। পিঠের দোকান নেই। বাড়িতে কে পিঠে তৈরি করবে? দোকানে পাওয়া গেলেও না হয় পুরনো স্মৃতিকে সুখে রূপান্তরিত করা যেত।

সাধারণের পিঠে ছিল আস্‌কে পিঠে। চাল-গুড়ির পুরু খোলের মধ্যে নারকেলের পুর, ভাপে সিদ্ধ করা। খুব মনোরম কিছু নয়। তবু নতুন গুড়ে মণ্ডিত হয়ে বহু দিন বহুজনকে তৃপ্ত করেছে। পিঠের রাজা ছিল গোকুল পিঠে। সুগন্ধি ক্ষীরের পুরে এলাচের সুরভি। দুধে গোলা ময়দার আস্তরণ চড়িয়ে ভাজার পর যে পদটি তৈরি হত, তার জন্য এখনও মন কেমন করে। আর ছিল মুগসাওলি। ভাজা মুগের ক্ষীণ একটা গন্ধ এই পিঠেকে একটা বিশেষ এবং বিচিত্র স্বাদ দেয়।

কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। সে-দিন চলে গিয়েছে, স্মৃতির রোমন্থন করে যে সুখ পাওয়া যাবে তার স্বাদ আর কারও চিত্তে সঞ্চারিত করা যাবে না। তবু আশার কথা, এই কলকাতা শহরে এখনও অন্তত একটা জায়গায় পৌষ সংক্রান্তির দিন বিবিধ পিঠে পাওয়া যাবে। অন্য দিনও এক রকমের পিঠে পাওয়া যায়। হয় পাটি-সাপটা অথবা গোকুল পিঠে। কিন্তু পৌষ উৎসবের দিনে পিঠের সম্ভার পাবেন। বসে খেতে পারেন কিংবা বাক্স করে বাড়ি

নিয়ে আসতেও পারেন।

দোকানটির নাম সুরুচি। এলিয়ট রোড যেখানে আচার্য জগদীশচন্দ্র সরণিতে এসে পড়েছে তার খুব কাছে, এলিয়ট রোডের উপর, উত্তরের সারিতে। সাইনবোর্ড একটা আছে ছোট, নজরে পড়বে না। বাড়িটাও চাকচিক্যহীন। আসলে এটি রেস্টুর্যান্ট। সকাল নটা থেকে প্রাতরাশ দিয়ে শুরু করে, রাতের ভোজনে শেষ। তবে রাত্রি আটটায় বন্ধ হয়। এমনিতে ওই পাড়ায় বিশেষ অফিস ইত্যাদি নেই বলে সন্ধ্যার পর লোক সমাগম সামান্য। দুপুরে ভিড় হয়, সুস্বাদু বাংলা খাবার পাওয়া যায়। আসলে, বাংলা খাবারের রেস্টুর্যান্ট। দোকানের বাইরেটার মতোই খাবারও চেঁচিয়ে কথা বলে না। গেরস্তবাড়ির মেয়ের মতো নম্র। কোথাও উগ্রতা নেই। তেল, মশলা, ঝাল পরিমিত। বাড়ির বাইরে বাংলা খাবার যদি পছন্দ হয়, কিংবা বিদেশি কাউকে আমাদের খাবারের সঙ্গে পরিচয় করিতে দিতে চান, সুরুচি প্রায় একমাত্র ভোজনশালা— যেখানে খাবার ও দাম উভয়ই মনোমতো হবে। বেশি নির্বাচনে না যেতে চাইলে এক থালার অর্ডার দিতে পারেন। ভাত, রুটি অথবা লুচি, ডাল, মোচার ঘণ্ট কিংবা এঁচোড়ের ডালনা, কিংবা ফুলকফির তরকারি, রুইমাছের কালিয়া, শেষকালে একটা পুলি পিঠে। সাত টাকা। যদি মাছের বদলে মাংস নেওয়া হয়, আট টাকা পড়বে। মুরগি নিলে সাড়ে দশ টাকা। সব রান্নাই ভাল, মনে রাখবার মতো নয় হয়তো। কিন্তু জায়গাটি পরিচ্ছন্ন, পাকশালাটি আরও। মেয়েরা পরিবেশন করে, যাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান, অল বেঙ্গল উইমেন'স ইউনিয়ন, নিরাশ্রয়, অনাথ মেয়েদের আশ্রয়। তাই আহার্যে, পরিবেশনে কোথাও চটক নেই। স্টিলের থালা বাটি, ভাত এবং ব্যঞ্জন পর্যাপ্ত পরিমাণ। এক থালা খাবার পর, অন্য কিছু আহার্যের ইচ্ছা না থাকাই স্বাভাবিক। তবু যদি অন্য কোনও পদ আস্বাদনের অভিলাষ হয়, মাছ, মুরগি, মাংস, দই আলাদাও অর্ডার দিতে পারেন। শেষ পাতে দই পাবেন, দেড় টাকা। প্রায় প্রতিদিনই তিন রকমের মাছ থাকে। ইলিশের ভাপা, চিংড়ির কালিয়া, কোন দিন কই-পাথুরি, এমনকী চিতল মাছের সেই বিখ্যাত পরম স্বাদ পদটিও। এদের ইলিশ মাছের ভাপা সত্যিই চমৎকার। ইলিশ মাছ যেমন হয়, বিনয়ে, নম্রতায় হারিয়ে যায় না। স্বাদের একটু উগ্রতা থাকেই, সরষের তীক্ষ্ণতা এবং কাঁচালঙ্কার প্রাখর্য কুশলী শিল্পীর হাতে পড়ে সমগ্র ভোজনকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। সে তুলনায় দাম সামান্য, ছ টাকা।

ভোজ্য-তালিকা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রত্যহ বদলানো হয়। সংযোগ হলে আপনি যেদিন গেলেন মটর ডাল তৈরি হয়েছে লাউ দিয়ে, নারকেলের কুচি দিয়ে এঁচোড় এবং কই-পাথুরি। মিষ্টি খেলেন পাটি-সাপটা। একটি আক্ষেপ ছিল। ভাতের চাল একটু বেশি পুষ্ট। সুগন্ধ সরু চাল এবং গব্যঘৃত থাকলে—আর যা-ই হোক, আজকের দামে দেওয়া সম্ভব হত না।

সুখাদ্যের ব্যাপারই এমন—কথায় কথায় কোথায় গিয়ে পৌঁছয়। কথা শুরু করেছিলাম পিঠে দিয়ে। আজ পিঠের পরব। সুরুচিতে আজ রাঙা আলুর পুলি পিঠে থাকবে—৬০ পয়সা। আরও কম দামে হবে রসবড়া, ৫০ পয়সা। গোকুল পিঠে, ৭৫ পয়সা। আর থাকবে চুষি, পুলি পায়স সহযোগে। আজকের বিশেষত্ব না হলেও পাটি-সাপটা থাকবে। তবে, এঁদের পাটি-সাপটা পুববাংলার পদ্ধতিতে তৈরি হয়। ভাজার পরে রসে নিমজ্জিত হয় না। আমার পক্ষপাত এই পাটি-সাপটা। সুগন্ধি ঘৃতে ভাজা, গাঢ় রসে সিক্ত হয়ে যা আপনাকে অন্য রসলোকে পৌঁছে দেয়।

নিরামিষ

তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ বলে আক্ষেপ করব না। জানি, আমাদের যে দিনগুলি গেছে তারা আর ফিরে আসবে না। আবার, আজকের যে দিনগুলি আমাদের মনে দাগ কাটতে পারছে না তাদেরই নিয়ে আজকের যুবকেরা কাল আক্ষেপ করবেন, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি। তবু, না লিখে পারছি না, দেশ থেকে নিরামিষ রন্ধনের পরম্পরা লুপ্ত হতে চলেছে। যখন বলি, আহা, মা কি দিদিমা যেমন ডালের বড়া দিয়ে কচুশাক রান্না করতেন, কিংবা কালোজিরা ফোড়ন দিয়ে মুগের ডাল, তেমনটির রসাস্বাদ আর হল না, তখন স্মৃতি নিয়ে অহেতুক বিলাপ করছি না। সত্যিই বাঙালি নিরামিষ রান্না বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা নিরামিষ রন্ধন ভোজনশালায় কোনও দিনই পাওয়া যেত না, আজও যায় না। কিন্তু উত্তর ভারতে যে অঞ্চলে অধিকাংশই নিরামিষভোজী, আগে সাধারণ ভোজনশালায় সুস্বাদু নিরামিষ পদ পাওয়া যেত। পঞ্জাবি ভোঁতা রন্ধনধারার আগ্রাসনে তারা এখন পলাতক। হানাদার পঞ্জাবি পিঁয়াজ টমাটোর আক্রমণ এমনই নীরন্ধ্র যে নিরীহ হিং বা জিরা অথবা সাহসী গরমমশলা বা সরষে ফোড়নের সামান্যতম আভাসও আর পাবার উপায় নেই। দক্ষিণী রন্ধনধারা এখনও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতবর্ষে অপ্রতিহত। কিন্তু উত্তর ভারতের সূক্ষ্ম স্বাদ ও সৌরভের সঙ্গে সেই ধারা তুলনীয় নয়। নারকেল ও কারি পাতা সেখানে পঞ্জাবি পিঁয়াজ টমাটোর মতোই অটল।

উত্তর ভারতীয় নিরামিষ রন্ধনের সন্ধানে তাই বৃথাই দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী গিয়েছি। কলকাতা, যে শহরে নাকি সব কিছু পাওয়া যায়, সেখানেও উত্তর ভারতীয় নিরামিষ রান্না তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। গুপ্ত বা জুনিয়র ব্রাদার্স এবং বিনীত ও অভিনন্দনের ভোজ্যের

কথা পূর্বেই লিখেছি। আজ মেপ্‌লের কথা বলি। এই নিরামিষ ভোজনশালাটি অপেক্ষাকৃত নবীন, তবু আশ্চর্য, পরম্পরার কিছুটা স্বাদ এখানে পাওয়া যায়। ভোজনশালাটি পার্ক স্ট্রিটের ওপর উত্তর ফুটপাথে আপিজি হাউসে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভাল কাজ করছে না। তবে এখন, প্রকৃতির রোষ যখন অনেকটা শান্ত, মেপ্‌লের মৃদু-আলোকিত পরিচ্ছন্ন ভোজনকক্ষে, সময় যাপনে ক্লেশ হবে না। সত্তর-আশিজন অতিথি বসবার আসন আছে। দোতলা। মেঝে কার্পেটে মোড়া। খাদ্যতালিকা বৃহৎ। জলখাবার বা বিনোদনের খাদ্য থেকে ক্ষুধার শান্তিপূর্ণ ভোজনের বন্দোবস্ত আছে। ভেলপুরি পাবেন, চাটও। তবে এগুলির জন্য মেপ্‌ল প্রশস্ত নয়। দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় ভোজনের জন্য যেতে পারেন। পরম্পরার আভাস পাবেন, এই পর্যন্ত। যে খাবার খাস উত্তর প্রদেশ থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছে, তা এখানে আশা করাই ভুল হবে। তবুও তৃপ্তিদায়ক নিরামিষ ভোজন হবে।

পরিচারকেরা নম্র, তৎপর। ক্ষুধাবর্ধক জিরা পানি পান করবেন এক পাত্র? জিরা, ভাস্কর লবণ, আমচুর ও লেবুর মিশ্র স্বাদ-গন্ধযুক্ত শীতল এই পানীয়টি ভোজনের পূর্বে সব সময়েই উপাদেয়। দাম একটু চড়া, ৩ টাকা। কোন জিনিসটাই বা সুলভ? যদি এক পাত্র লিম্বু সোডা পান করেন, দিতে হবে ৪ টাকা। এখানে এসেছেন দিশি নিরামিষ পদ আস্বাদনের জন্য। অন্য বিজাতীয় কিছু ভোজন গর্হিত হবে। তবু সন্তর্পণে বলে রাখি, মেপ্‌লে স্পাগেটি আ লা মেপ্‌লে উত্তম প্রস্তুত হয়। ইটালির জাতীয় এই পদটি মাংস ছাড়াও আপনাকে আনন্দ দেবে।

দম আলু নিতে পারেন, ৬ টাকা। যদি পুরি ইচ্ছা করে থাকেন তবেই দম আলু উপযুক্ত হবে। মেপ্‌লে আমার পক্ষপাত তন্দুরি রোটি। তপ্ত, কড়া করে সেঁকা। সঙ্গে গুচ্ছি-মটর উপযুক্ত দোসর হবে। রুটির দাম ১ টাকা। গুচ্ছি-মটর অর্থাৎ মাশরুম ও মটরের তরকারি, ১২ টাকা। সবচেয়ে মনোহর পদ এখানে ডাল তড়কা। মাসকলাই-এর ডালের আস্ত দানা দিয়ে প্রস্তুত এই পদটি অপূর্ব। পঞ্জাবি কেউ সঙ্গে থাকলে অবশ্য অনুযোগ করবেন—আরও মাখন না হলে এই ডাল হয়? তা ছাড়া, মা যেমন রান্না করতেন, সারাদিন ঘুঁটের আগুনের আঁচে, কালো মাটির হাঁড়িতে, সে দেবভোগ্য ডাল আর এই ডাল? অভাবে, আমাদের এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ ডালও কিছু ফেলনা নয়। রসুন দিয়ে সাঁতলানোর পর এ ডাল কায়কল্প করার মতো তাজা এবং রসালো।

মৌসুমে বাঙালির যেমন ইলিশ মাছ, পঞ্জাবিদের সরষোঁ কা শাগ বা, সরষে শাক। দীর্ঘকাল স্বল্প আগুনে প্রস্তুত হবার পর আর তাকে শাক বলে চেনা যায় না। স্বাদেও নতুন স্তর পায়। ইলিশ মাছের যখন যাবার সময়, তখন সরষের শাকের আসার কাল। অর্থাৎ শরৎ শেষে সরষের শাক পাওয়া যাবে। সবজিটি বড়ই ক্ষণস্থায়ী। মাস চারেক পরে আর তার দেখা পাওয়া যাবে না। তখন আবার ইলিশের ফেরবার সময়। মেপ্‌লে এখন সরষের শাক পাওয়া যাচ্ছে। অপরিচয়ের আকস্মিকতা অনেককে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত করে, কিন্তু একটু পরিচয় হলে এই পদটিতে অপার শাক পাবেন। সামান্য ভুরু তুলে বলা যেতে পারে, মাটির হাঁড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা সিদ্ধ না হলে কি সরষের স্বাদ তার অলৌকিক স্বাদ পায়? দীর্ঘ তপস্যা বিনা কখনও কি সিদ্ধিলাভ হয়? আর মাখন? পূজার যেমন বিল্বপত্র

ও পুষ্প, সরষের শাকের তেমনি মাখন। কখনও বেশি মনে হবে না। কিন্তু আমাদের অত উন্নাসিক হবার দরকার নেই। মৌসুমের প্রথম সরষের শাক, হোক না প্রেসার কুকারে রান্না, না হয় একটু মাখন কম, পরম উপাদেয় লাগবে। ৮ টাকা।

স্বাদ বদলের জন্য মাঝে একপাত্র খাম্ভভি নিতে পারেন। অতি কোমল, সুদৃশ্য, নারকোল কোরায় আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র আট খণ্ডে এক পাত্র, ৬ টাকা। মেপ্‌লের একটা দুর্বলতা থেকে খাম্ভভিও পার পায়নি। এরা একটু ধনেপাতা বেশি পছন্দ করেন, প্রায় সব.পদই ধনেপাতাযুক্ত। উগ্র সৌরভের এই পদার্থটি নির্দয় ডিক্টেটরের মতো সব পদে এক স্বাদ এনে দেবার চেষ্টা করে। মেপ্‌লে আর একটি সুখকর বিশেষত্ব হল এখানে পদগুলি পরিমাণে উদার। যে কোনও পদ দুজন বা তিনজনে ভাগ করে খেতে পারেন। দুটি বিভিন্ন সবজির পদ হলেই পর্যাপ্ত হবে। যদি দহিবড়া ইচ্ছা করেন, ৬ টাকা। কোনও বিশেষত্ব নেই, বরং মশলার দিকটা দুর্বল।

মেপ্‌লের বিশেষত্ব তার কুলফি। উজ্জ্বল, সুগঠিত এই পদটিও দু জনে ভাগ করে নিতে পারেন, ৭ টাকা। বাদাম ও পেস্তার কুচি মেশানো নির্ভেজাল, হিমেল এই পদটি যদি আপনার নির্বাচনে বা ভোজনে কোনও অভাব কি ত্রুটি থাকে নিমেষে ভুলিয়ে দেবে।
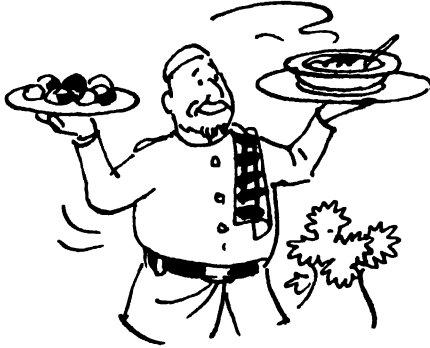
চিরকালের চিরদিনের

আমার মারাঠি সহকর্মী বলেছিলেন, কেন যে তোমরা বাংলা মিষ্টান্ন নিয়ে এত বড়াই করো বুঝি না। সাকুল্যে ওই তো দুটি মিষ্টি—সন্দেশ আর রসগোল্লা, তাও দুয়ের একইরকম স্বাদ।

যিনি রসগোল্লা ও সন্দেশকে স্বাদে এক বলেছিলেন, আমার সেই সহকর্মী ভূয়োদর্শী মানুষ। সৈন্যবাহিনীর কর্নেল ছিলেন। কর্মসূত্রে ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছেন। অনুমান অবাস্তব নয় যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভোজ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তবুও তিনি নির্দ্বিধায় বাংলার মিষ্টিকে নস্যাৎ করে দিলেন।

বিভিন্ন মানুষের রুচির ভিন্নতা নিয়ে তর্ক তুলব না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভুল হবে না যে, সাধারণ মানুষের স্বাদের জ্ঞান প্রখর নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। সবাই স্বাদের তারতম্য ধরতে পারে না। যেমন আমার সহকর্মী কর্নেল সাহেব।

বাংলার যে কয়েক ডজন মিষ্টান্নের নামের সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয়, স্বাদের ভিন্নতার জন্যই তারা অভিনব। বড়াই না করেও এই কথা বলতে পারি। ভারতচন্দ্রের রচনায় দেখতে পাচ্ছি, আড়াইশো বছর আগে একদিনের খাদ্য তালিকায় পায়স ছাড়া আজকের কোনও মিষ্টান্নের উল্লেখ নেই। শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'মিষ্টান্ন পাক' বইতে আড়াইশো মিষ্টান্নের প্রাকপ্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। তাদের মধ্যে অনেক মিষ্টান্নই এক গোত্রের, তবু স্বাদের সূক্ষ্ম ভিন্নতা প্রত্যেকটি মিষ্টান্নকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে।

মারাঠিদের মিষ্টান্নের তালিকা সংক্ষিপ্ত। মিষ্টান্ন পাক ও পরিবেশন তাঁদের বৈশিষ্ট্য নয়। মারাঠিদের একটি মিষ্টান্ন অতিশয় জনপ্রিয়। পুরনপোলি। পদটিকে নিয়ে অনেক

কিংবদন্তী আছে। বিয়ের পাত্রীর যেমন গান জানা প্রায় আবশ্যিক ছিল এ রাজ্যে, তেমনি মহারাষ্ট্রে পুরনপোলি প্রস্তুতের দক্ষতা পাত্রীর বিশেষ গুণের মধ্যে ধরা হত। আমাদের, বাঙালিদের মতে এই মিষ্টান্নটি স্বাদে অনির্বচনীয় কিছু নয়। তবে পুরনপোলি তৈরি করার দক্ষতা প্রায় চারুশিল্পের মতো মনে করেন মারাঠিরা। আসলে পুরনপোলি মিষ্টি ডালপুরি ধরনের। তবে ঘি তেল দিয়া ভাজা নয়, শুষ্ক তাওয়ার ওপর সন্তর্পণে এবং কুশলতার সঙ্গে সেঁকা। পুরনপোলির পুরও ক্ষীর ছানা খোওয়া বা নারকেলের নয়। নেহাতই ভেজানো ছোলার ডাল বাটা দিয়ে তৈরি হয় এই মিষ্টান্নের পুর। প্রস্তুত হওয়ার পর সামান্য ঘৃতে স্নিগ্ধ করা হয় পুরনপোলিকে। অনেকগুলি পুরনপোলিকে ওপর ওপর রেখে চাপে জুড়ে যাওয়ার পর কেকের মতো কেটেও দেওয়া হয় অনেক সময়।

প্রতিবেশী রাজ্য গুজরাতেও পুরনপোলির সমান আদর। তবে গুজরাতিদের মিষ্টান্নের প্রতি আসক্তি সামান্য নয়। সুরাটের মিষ্টান্ন গুজরাতিদের গর্বের বিষয়। গুজরাতে এবং মহারাষ্ট্রে শ্রীখণ্ড মিষ্টান্ন-সমাজের তারকা বিশেষ। পালাপার্বণে বিয়ে-শাদিতে শ্রীখণ্ড-পুরির উপস্থিতি সুনিশ্চিত। দই থেকে উৎপন্ন এই শ্রীখণ্ড আমাদেরও ভাল লাগে। তবে দই অথবা শ্রীখণ্ডকে আমরা ঠিক মিষ্টান্নের মধ্যে ধরি না।

অবাঙালি সমাজে মিষ্টান্নের উপস্থিতি সচরাচর শেষ পদ নয়। অর্থাৎ ভোজনান্তের পদ নয়, ভোজন শুরুর পদ। অনেকেই মিষ্টান্ন ভোজন প্রথমেই চুকিয়ে নিয়ে মূল আহার্যে মন দেন। আমাদের মিষ্টান্ন ভোজন কেন এবং কবে থেকে পাশ্চাত্য ধারায় ভোজনশেষের প্রতীক, সে তথ্য আমার অজ্ঞাত। তা ছাড়া, আমাদের মিষ্টান্ন শুধু ভোজনের পর মধুরেন সমাপয়েৎ নয়। আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব কেউ বাড়িতে এলে তাঁদের আপ্যায়ন করা হয় মিষ্টান্ন সহযোগে। এটা বাঙালি রীতি। আমাদের মিষ্টান্নগুলির রচনাও হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে। গুজরাতে দেখেছি, কেউ বাড়িতে এলে সর্বপ্রথম তাঁকে এক গেলাস জল দেওয়া হয়। আর আমরা কিছু ভোজ্য বিনা শুধু জল দেওয়া শালীন আচার বলে গণ্য করি না। গুজরাতিরা অবশ্য জলের পর ফরসানের পাত্রও হাজির করতে পারেন। ফরসান অর্থে টুকটাক খাবার, ডালমোঠ, মঠরি, খাখরা, ঢোকলা ইত্যাদি। তার সঙ্গে মিষ্টান্নের সংযোগ দেখিনি।

উচ্চ সমাজে যদিও এখন জল বা মিষ্টান্ন অপেক্ষা হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক-এর চল বেশি। সেখানে অবশ্যই মিষ্টান্নের স্থান নেই।

বাংলা মিষ্টান্নের অভিনবত্ব তার উপকরণে। দেশের অন্য রাজ্যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, ছোলা, ডাল, বেসন, আটা অথবা খোওয়া সহযোগে। ছানার ব্যবহার আদৌ ছিল না। বাংলা মিষ্টান্ন জগতে ছানার ব্যবহার অত্যন্ত মৌলিক উদ্ভাবন। বস্তুত, এই অঞ্চলে অন্যান্য স্থূল উপকরণের স্থান নেই মিষ্টান্নে। ছানা অথবা খোওয়া অথবা উভয়েই আমাদের মিষ্টান্নের মুখ্য উরকরণ।

সাহেবগণের দেশে ভোজনান্তে ডেসার্ট পরিবেশন করা হয়। ডেসার্টের অসংখ্য রূপ। ওই জাতের মিষ্টান্ন রচনার সামনে আমাদের পিঠা-পায়েস দাঁড়াতে পারে না। বৈকালিক চায়ের সঙ্গে কেক বিস্কুট গ্রহণের রীতি আছে পাশ্চাত্য উচ্চ সমাজে। অন্য সময় তাঁদের মিষ্টান্নের প্রয়োজন হয় না। কারণ, কেউ কারও বাড়িতে বড় একটা আসে না। নিমন্ত্রিত

হলে ভোজনের পরে যে মিষ্টান্নাদি পরিবেশন হয়, তার কথা আগেই বলেছি।

চায়ের অনুষঙ্গ কেক প্রস্তুতে সাহেবগণের দক্ষতার তুলনা হয় না। ভোজন ও পাকশাস্ত্রের ফরাসি বেদ লারুস গাস্ত্রোনমিকে দেখেছি ফরাসি কেকের তালিকা—১৪৯ প্রকার। এ ছাড়া স্কোন, কুকি ও বিস্কুট তো আছেই। চা পানের অনুষঙ্গ হিসাবে তারাও যুক্ত হয়।

বিবিধ কেকের সঙ্গে আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। ডেসার্ট, ভোজনান্তের মিষ্টিরও কয়েকটি আমাদের অতি পরিচিত। যেমন কাস্টার্ড পুডিং।

এই সাধারণ কাস্টার্ড পুডিংই যোগ্য হাতে পড়লে কত সুস্বাদু হতে পারে তার উদাহরণ পার্সি লগন নু কাস্টার। পার্সিরা বাঙালিদের মতোই সুখাদ্যকে সুন্দর জীবনের অঙ্গ মনে করেন। এঁরা এক পাতে মাছ ও মাংস গ্রহণ তো করেনই, ডিমও বাদ যায় না। পার্সিদের বিবাহ সংক্রান্ত ভোজে নিমন্ত্রিত হলে তাই খুব আনন্দিত হই। ভোজনান্তে মিষ্টান্ন হিসাবে লগন নু কাস্টার অবশ্যম্ভাবী। বিলিতি কাস্টার্ড প্রস্তুতকালে দুগ্ধ ঘন করে নিয়ে কিঞ্চিৎ বাদাম পেস্তা সংযুক্ত করলে আটপৌরে কাস্টার্ড আভিজাত্যে উন্নীত হয়। তখন তার স্বাদ-গন্ধই আলাদা। আক্ষেপ এই থেকে যায় যে, উদ্যোগী পার্সিরা আর অন্য কোনও মিষ্টান্নের দিকে নজর দেন না। যদিও এঁদের 'মিঠু দহি'র প্রতি আসক্তি বাঙালিদের মতোই। এবং উত্তম কুলফি প্রস্তুতেও এঁদের কুশলতা প্রকাশ পায়।

ডাল, বেসন, আটা দিয়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুতে গুজরাতিরা কম যান না। এবং পেঁড়াতেও তাঁদের দক্ষতা আছে। কিন্তু ওই লাইনে বিশিষ্ট হলেন রাজস্থানিরা। সামান্য মতিচুর উত্তম ঘৃত সহযোগে কত মায়াময় হতে পারে, গ্রহণ না করলে জানা যায় না। এঁরাও ক্ষীর ও খোওয়ার মিষ্টান্ন প্রস্তুতে পারদর্শী। ছানার ব্যবহার এঁদেরও অজ্ঞাত ছিল। রাজস্থানি একটি পদ আমার প্রিয়। ঘেবর। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের পাকপ্রণালীতেও তার উল্লেখ দেখেছি। মৌমাছির চাকের মতো খোপ কাটা নয়নলোভন এই মিষ্টান্নটি মূলত আটা-ময়দা-আশ্রিত হলেও স্বাদের নতুন দিক্‌নির্দেশ করে। সম্প্রতি ঘেবর প্রস্তুতে ছানার ব্যবহার করে রাজস্থানের স্বকীয় মিষ্টান্নের ক্ষুদ্র জগতে নতুনত্বের সূচনা হয়েছে। রাজস্থানের গুলাবজামুনও আমাকে লুব্ধ করে। সদ্য কড়া থেকে নামানো অতি কোমল সুমিষ্ট গুলাব জামুনের স্বর্গীয় স্বাদ ভোলা কঠিন। শুধু খোওয়া থেকে এমন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

উত্তর ভারতের, সম্ভবত দিল্লিরই, সোহন হালুয়ার যত না সুস্বাদ, পদটি তার থেকে বেশি অভিনব। এই মিষ্টান্নটির সেরা ভাষ্য পাওয়া যায় পুরনো দিল্লির খানদানি দুশো বছরের দোকান ঘন্টাওয়ালাতে। এই মিষ্টান্ন আমাকে চিরকালই বিস্মিত করেছে। প্রায় প্রস্তরবৎ কঠিন সোহন হালুয়া কী অভাবনীয় পদ্ধতিতে ভেতরে ঘৃত সঞ্চয় করে রাখে, প্রতি চর্বণে যার স্বাদ ও গন্ধ রসিককে মুগ্ধ করে, আমাদের জানা নেই।

আরও একটি উত্তর ভারতের মিষ্টান্ন শোনপাপড়ি (অথবা শুদ্ধ নাম বুঝি সোহনপাপড়ি) এখন সারা ভারতেই সহজলভ্য এবং গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছে। কলকাতার অলিতেগলিতেও শোনপাপড়ি প্রবিষ্ট হয়েছে। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে তার সমান দাপট। অকিঞ্চিৎকর মৈসুরপাক থেকে দাক্ষিণাত্য এখন

শোনপাপড়িতে উন্নীত হয়েছে। প্রায় একই উপকরণে প্রস্তুত দুই মিষ্টান্নের কী কল্পনাতীত প্রভেদ। ভাল শোনপাপড়িতে দুই বিপরীত গুণের সহাবস্থান। অতি মুচমুচে অথচ অধরস্থ করলেই মিলিয়ে যায়। দিল্লির বেঙ্গলি মার্কেটের কয়েকটি মিষ্টি ও চাটের দোকানে শ্রেষ্ঠ শোনপাপড়ি পাওয়া যায়। আসলে ব্রাত্য মিষ্টান্ন, ছানা খোওয়া ক্ষীরের নামগন্ধ নেই, তবু দিল্লি গেলে বেঙ্গলি মার্কেটে একবার না যেতে পারলে দিল্লি যাত্রাই যেন পূর্ণ হয় না।

বিদেশি অর্থাৎ ইউরোপীয় মিষ্টান্নে আমার আকুতি কোনটির জন্য বলতে পারব না। বিবিধ মিষ্টান্নের সম্ভার আমাকে বাক্যহীন করে, নিশ্চিত বলতে পারি না আজ সন্ধ্যায় কোন মিষ্টান্ন আমার কাম্য। স্মৃতিতে দুটি মিষ্টান্নের সুখ কখনও অস্পষ্ট হবে না। একটির নাম পাভলোভা, দ্বিতীয়টি বাকলাভা। পাভলোভা যেন একটি শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মধ্যে ফল ও ক্রিম ভরা। ভিয়েনার এক ভোজনশালায় আমার সঙ্গে পাভলোভার প্রথম সাক্ষাৎ। স্ট্রাউসের ওয়ালটসের মাদকতা ছিল ভোজনকক্ষে। পদটি যেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুখের আঁচল মেলে ধরেছিল।

বাকলাভার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অনুকূল পারিপার্শ্বিকে। পাহাড়ের ঢালে, সমুদ্রের তীরে, ছোট্ট এক ভোজনশালার বাগানে উইলো গাছের ছায়ায় তপ্ত বাকলাভা প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল। দারুচিনির গন্ধে আকুলকরা এই পদটি তার শোভা ও স্বাদে যে কোনও রসিককে সম্মোহিত করতে পারে। কোথায় শ্রেষ্ঠ বাকলাভা পাওয়া যায়, তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে। যেমন তর্ক আছে বাকলাভার জন্মস্থান নিয়ে। আমার ধারণা ছিল বাকলাভা গ্রিক অথবা তুর্কি পদ। কিন্তু সম্প্রতি পড়েছি এক রসিকের লেখা, যেখানে ইরানকে বলা হয়েছে বাকলাভার পিতৃভূমি। তিনি আরও লিখেছেন যে পার্শি মালাই-না-খাজার বাকলাভার সঙ্গে জন্মসূত্রের সম্বন্ধ। পার্শিদের মালাই-না-খাজা কিন্তু তেমন বিদগ্ধ কোনও পদ বলে আমার মনে হয়নি। যদিও খাজা জাতীয় ওই মিষ্টান্নের অন্তস্থলে গোলাপজলে সুবাসিত তাজা ক্রিম অভাবিতের আনন্দ দেয়।

বাকলাভা আরও অভিজাত মিষ্টান্ন। তার ভেতরে ওয়ালনাট ইত্যাদি নানা মূল্যবান শুষ্কফল থাকে। হলফ করে বলতে পারব না, হয়তো প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনও স্তরে তাজা মধুও ব্যবহৃত হয়, কারণ নতুন মধুর স্বাদ ও সুগন্ধ দারুচিনির গন্ধের সঙ্গে মিশে বাকলাভাকে অনির্বচনীয় করেছিল।

পাভলোভার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার সঙ্গে আমার প্রবল প্রণয়। অনেকটা প্লাটোনিক লাভ-এর মতো। কারণ, পাভলোভার সঙ্গে আমার বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। প্রেমের ক্ষেত্রে ক্ষণিক চঞ্চল চাউনির মতো পাভলোভার সঙ্গে আমার মাত্র দু বার দেখা হয়েছে। পদটি সম্ভবত নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব। পাভলোভার বৃত্তান্ত বলবার আগে মেরাঙের কথা বলা দরকার। কারণ মেরাঙের ভূমির ওপর পাভলোভার সৌধ গড়া হয়। চিনি ও ডিমের শ্বেতাংশ মিশিয়ে যে পদার্থটি তৈরি হয়, রূপে এবং স্বাদে অনেকটা ফেনিবাতাসার মতো। বাতাসার চেয়ে পরিশীলিত, ভঙ্গুর এবং অভিজাত। হালকা ওই একটি বৃহৎ মেরাঙের উপর তাজা ক্রিম এবং ফলের কুচি ভরে পাভলোভা তৈরি হয়। নতুন একটি ফলের সঙ্গেও সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, কিউয়ি। মাঝারি লম্বা

টমাটোর আকারের ফলটি গাঢ় সবুজ রঙের, ফলের ভেতরটাও সবুজ। পিচ, আপেল ইত্যাদির মতো কিউয়ির সবুজ রংও পাভলোভাকে বর্ণময় করেছিল। আমি যেহেতু মেরাঙের ভক্ত, পাভলোভা তাই স্পর্শমাত্রই আমার ভাল লেগেছিল। ভোজনের পর সে প্রেম অমর হয়ে আছে।

বিদেশি আরও দুটি মিষ্টান্নের প্রতি আমার আনুগত্য আছে। তাদের মায়াজাল কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতা আমার নেই। তাদের নাম বেক্‌ট আলাস্কা এবং ক্রেপ সুজেট। পদ দুটির নির্মাণ কার্যের শেষ পর্বে মিল আছে। শেষ পর্বে এদের মূল্যবান ব্র্যাণ্ডিতে অভিষিক্ত করে আগুন ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। থালার ওপর প্রজ্বলিত অগ্নি সুদ্ধ পদ দুটি টেবিলে আনা হয়।

আমার এক বন্ধু ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে প্রথম আমেরিকা ঘুরে এসে হতভম্ব আমাদের বলেছিলেন, জানো আমেরিকাতে আইসক্রিম ভাজা পাওয়া যায়।

অবশ্যই বিশ্বাস করিনি। সুকুমার রায়ের আমসত্ত্ব ভাজার চেয়েও আজগুবি। পরে ঠিক ভাজা আইসক্রিম নয়, তবে ওই ধরনের একটি ভোজনান্তের মিষ্টান্নের সঙ্গে এ দেশেই পরিচয় হয়েছিল। ভালও লেগেছিল। বেক্‌ট আলাস্কা। উত্তম আইসক্রিমে দরাজ হাতে মূল্যবান ব্র্যাণ্ডি ঢেলে আগুন ধরিয়ে টেবিলে আনা হয়। স্বাদের প্রচণ্ড পরিবর্তন হয় বলতে পারি না। তবে ঠাণ্ডা এবং গরম আইসক্রিম, ব্র্যান্ডির স্বাদ ও গন্ধযুক্ত হয়ে একটি মনোহরণ পদের সৃষ্টি হয়।

অনুরূপ আরেকটি বিদেশি মিষ্টান্ন আমার অধিক প্রিয়। নাম ক্রেপ সুজেট। ডিম দুধ ময়দা দিয়ে তৈরি পাটিসাপটার মোড়কের মতো বস্তুর নাম ক্রেপ। ক্রেপ অবশ্য বহু প্রকারের হয়। কিন্তু সব ক্রেপই প্রস্তুতের পর সুপক্ক হলেও অত্যন্ত নরম থাকে। সেই ক্রেপে মুড়ে ফল, জেলি ইত্যাদি ভরে, আপনার প্রিয় সসে নিষিক্ত করে তার ওপর ব্র্যান্ডি ঢেলে জ্বালিয়ে নিলে তৈরি হয় ক্রেপ সুজেট। কোমল ক্রেপ, সসের সুবাস (কমলালেবুর হলে আমার বেশি ভাল লাগে) জ্বলন্ত ব্র্যান্ডির স্বাদ ক্রেপ সুজেটকে সত্যিই অনির্বচনীয় করে দেয়। তার আগে, রাত্রে স্বল্পালোকিত ভোজনশালায় এক থালা ক্রেপের আগুন নিয়ে যখন পরিচারক এসে পৌঁছয় তখনই সুখের শুরু।

বিদেশি মিষ্টান্নের সম্বন্ধে অনেক বলা যায়, বিশেষ করে কেকের স্থাপত্যের বিষয়ে। কেকের মতো এমন বিচিত্র সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি আর কোনও মিষ্টান্নে করা হয় না। করা যায় না।

আমাদের নিজস্ব মিষ্টান্নের কথা বলা এখনও বাকি আছে। আমাদের মিষ্টান্নই তো সত্যিকারের মধুরেণ সমাপয়েৎ করাতে পারে। সমস্ত হৃদয় গান করে ওঠে, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'।

বাংলা মিষ্টান্ন শুধু সংখ্যাতেই নয়, স্বাদ বৈচিত্র্যে অনন্য। বাংলা মিষ্টান্নের বিশেষত্ব হল ছানার ব্যবহার। তার দু ভাগ, শুষ্ক ও রসযুক্ত। শুষ্ক মিষ্টান্নের মধ্যে সন্দেশ প্রধান। আমার বিশ্বাস, সন্দেশ প্রস্তুতের যে ঐতিহ্য আমাদের আছে, এমন পাকনৈপুণ্যের এবং উদ্ভাবনের তুলনা আর কোনও দেশের পাকশাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। সন্দেশ উপকরণ তো মাত্র তিনটি—ছানা, চিনি বা রস এবং আগুন। তিনের আনুপাতিক ভিন্নতায় লব্ধ কুড়ি

রকম সন্দেশের বিবরণ লিখে গিয়েছেন বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় একশো বছর আগে। এখন আর দু একটি নতুন অনুপান যুক্ত করে, যেমন চকোলেট, জাফরান, সন্দেশের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সবকটি নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, করার প্রয়োজনও নেই। বিপ্রদাসের পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে মাত্র চার প্রকারের সন্দেশের কথা বলেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

সিমলে স্ট্রিটের গোলাপি পেঁড়া সন্দেশ যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা জানেন, গোলাপের সুবাস যুক্ত হয়ে সন্দেশের দিগন্ত কত প্রসারিত হয়েছে। শুধু সুগন্ধ নয়, গোলাপি পেঁড়ার পাকও বিশিষ্ট। পাকের মানে হল চিনি ও ছানার অনুপাতের তারতম্য এবং আগুনের ব্যবহার। সন্দেশ তার চরিত্র পায় পাকের ওপর। পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে যে কেউ প্রথম ধাপ সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু আগুন বা তাপের ব্যবহার কতক্ষণ এবং কী পর্যায়ের—সেখানেই সন্দেশশিল্পীর নিজস্বতার স্বাক্ষর। সব অঙ্কনশিল্পী তো রং ব্যবহার করেন, সবার আঁকা ছবি কি সমান হয়? একই নিসর্গ বিভিন্ন শিল্পীর তুলিতে বিভিন্ন রূপ পায়। সন্দেশও তেমনি। শিল্পীর দক্ষতাই সর্বপ্রধান উপকরণ।

বাংলা সন্দেশে ঋতু বদলের স্পর্শ আনে নতুর গুড়ের দেদো সন্দেশ। এক্ষেত্রেও আবার সিমলে স্ট্রিটে যেতে হয় এবং কালীচরণ দাসের দোকানে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। নতুন খেজুর গুড়ের গন্ধে এক প্রকারের মাদকরা আছে, যার ধর্ম মদিরার বিপরীত। মদিরা তার পূর্ণতা পেতে সময় নেয়। পুরনো হলে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তখনই তার স্বাদ, গন্ধ চূড়ায় পৌঁছয়। খেজুর গুড়ের কৈশোর যৌবনের মায়াময় সুবাস বয়স বাড়লে কমে যায়। তাই দেদো সন্দেশ তৈরি হয় নলেন গুড়ের প্রথম আবির্ভাবের ঋতুতে। নলেন যখন খেজুর গুড়ে পরিণত হয়, তখন দেদোর আর সেই অপার্থিব স্বাদ থাকে না। সন্দেশ প্রস্তুতের শিল্পকলা অতি সূক্ষ্ম বলে ভারতের সর্বত্র 'বেঙ্গলি সুইটস' নাম দিয়ে যে মিষ্টান্ন বিক্রি হয়, তার মধ্যে রসজাত মিষ্টান্নই সর্বাধিক। সন্দেশে সবার হাত দেওয়ার ধৃষ্টতা হয় না। রেনোয়া-মাতিসের ছবির কি নকল হয়?

কুড়ি রকম সন্দেশ নিয়েই এক কাহন লেখা যায়। বাংলা মিষ্টান্নের সংখ্যা তার দশ গুণের বেশি। তার ওপর যদি পিঠা-পায়স ধরা যায় তা হলে সংখ্যাটা আমাদের ধরবার বাইরে চলে যাবে। তবু দুটি বিচিত্র সন্দেশের নাম উল্লেখ করি। প্রথম, ওড়িশার ছানাপোড়া। প্রস্তুত কালের কারুকার্যে এই নিছক ছানার নিরলঙ্কার সন্দেশটি নিঃসন্দেহে অভিনব। অভিনবত্বের বিচারে কলকাতার বাগবাজারের স্টিম সন্দেশও ফেলনা নয়।

সন্দেশ সমাজের কুলীন বাঞ্ছারামের আবার খাব এবং গিরীশের বাবু সন্দেশে শুধুমাত্র নামোচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকছি। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য তাদের নামই যথেষ্ট।

বাংলার দুটি প্রাচীন মিষ্টান্নের কথা না বললে এই পাঁচালি সম্পূর্ণ হয় না। প্রথমটি মালপোয়া। দ্বিতীয় পাটিসাপটা। এই মিষ্টান্ন দুটিও জাতে আলাদা। তাদের আসল রূপ দেখা যায় বাড়িতে প্রস্তুত হলে। দোকানে এরা যোগ্য রূপ পায় না। মোলপোয়া অনেক দোকানেই বিক্রি হয়। কিন্তু হয় তারা অনুপানে কার্পণ্য করে শক্ত পরটার মতো তাওয়ায় ভাজে, তাই মালপোয়া শুষ্ক ও স্বাদহীন হয়। মালপোয়ার তরল গোলা ছাঁকা ঘৃতে ভাজলে তার ভেতরটা নরম, ঈষৎ পুষ্ট যুবতীর মতো আকর্ষণীয় হয়। প্রক্রিয়াতে আমার

সম্পূর্ণ অধিকার নেই। কিন্তু স্বাদে দোকানের মালপোয়া বাড়ির মালপোয়ার কাছে কলকে পায় না।

উত্তর ভারতের আদরের মিষ্টান্ন গাজরের হালুয়াও এই শ্রেণীর। বাড়িতে যেমনটি হয়, কোনও দোকানে বা ভোজনশালায় হয় না।

পাটিসাপটা প্রায় কোনও দোকানেই এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ এই মিষ্টান্নের পাকপ্রক্রিয়া কঠিন নয়। সরুচাকলির মতো যে আস্তরণটি ভাজা হয়, সেটি পূর্ণ পাকের পরও নরম থাকতে হবে বলে ধৈর্য সহকারে অল্প আঁচে ভাজতে হবে। পুর তৈরি করা সহজতর। অভিলাষ অনুসারে, খোওয়া বা নারকেলের পুর হতে পারে। তারপর আস্তরণে পুরকে মুড়ে যে পাটিসাপটা তৈরি, তার স্বাদ যুগান্তকারী কিছু নয়। ভাজার পর পাটিসাপটাকে হাল্কা রসে নিষিক্ত করলে তখনই সেই মিষ্টান্ন স্মরণযোগ্য হয়। সামান্য রসের সংযোগে পাটিসাপটার যেন রূপান্তর হয়, যেমন হয়েছিল সোনার কাঠি ছোঁয়াবার পর রূপকথার রাজকুমারীর।

আফলাতুন

আফলাতুন শব্দটির সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। অর্থ জানতাম না। সেদিন আজকালে পড়েছি, ক্রিকেট মাঠে সৌরভের পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে মুম্বইয়ের দর্শক সৌরভের নাম দিয়েছে আফলাতুন। আজকাল লিখেছে, আফলাতুন মানে অতি বিশেষ, দুষ্প্রাপ্য।

আমার উর্দুভাষী বন্ধু বললেন আফলাতুন শব্দের অর্থ, নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাসী, যে অন্যের মতামতের অপেক্ষা করে না। এবং উদার। অভিধান খুলে দেখি আফলাতুন মানে ঘমন্ডি, গর্বিত, দাম্ভিক।

আমি নিশ্চয় জানি মুম্বইয়ের মানুষেরা সৌরভকে দাম্ভিক বলেননি। গর্বিত বলতেও পারেন। সম্প্রতি নাকি একটি হিন্দি ফিল্ম এসেছে, যার নাম আফলাতুন। কোন অর্থে, আমার জানা নেই।

সৌরভকে নিয়ে আমাদেরও দম্ভ না থাক, কিঞ্চিৎ গর্ব নিশ্চয় আছে। আমরা, বাঙালিরা আরও একটা জিনিস নিয়ে গর্ব করে থাকি, বাংলা মিষ্টান্ন। আমাদের বিশ্বাস এবং অনেক অবাঙালিও সেই বিশ্বাস পুষ্ট করে বলেন, বাংলা মিষ্টি অতুলনীয় এবং নিঃসন্দেহে অভিনব। যখন দাক্ষিণাত্যে মৈসুরপাক অর্থাৎ মহীশূরপাকের অতিরিক্ত কোনও মিষ্টান্নের চিহ্ন ছিল না, যখন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে কিছু ক্ষীর আর খোওয়া-সংযুক্ত কতিপয় মাত্র মিষ্টান্নে মানুষ সন্তুষ্ট ছিল, তখনই বাংলায় সাধারণ্যে প্রচলিত মিষ্টান্ন অন্তত পঞ্চাশটি ছিল। পিঠে-পুলি যোগ করলে আরও অনেক বেশি। শত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের মিষ্টান্নপাক গ্রন্থে প্রায় দুশো বাংলা মিষ্টান্নের পাক-প্রণালী বিধৃত আছে। তার ওপর বহু পিঠে-পুলি।

পশ্চিম ভারতে কয়েকটি বিচিত্র মিষ্টান্নের প্রচলন ছিল। এখনও কোনও কোনও সমাজে আছে। তার মধ্যে অন্যতম আফলাতুন। আরও দুটি মিষ্টান্ন উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে যথাক্রমে জনপ্রিয়, সোহন হালুয়া এবং করাচি হালুয়া। আমাদের হালুয়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সহজে সবার প্রিয় হয় না। কিন্তু যাঁরা এই মিষ্টান্নের অনুরাগী, তাঁদের একনিষ্ঠতা যে-কোনও দম্পতির আদর্শ হতে পারে।

আফলাতুন পশ্চিম ভারতের মিষ্টান্ন। বছর পঁচিশ আগে কলকাতায় আফলাতুনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আফলাতুনের দোকানটির নাম হল 'বম্বে রয়্যাল সুইটমিট সেলুন'। ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের ওপর। নিউ আলিয়া হোটেলের কোনাকুনি। বসে খাবার জায়গা নয়, নামেতেই স্পষ্ট। এঁরা মিষ্টান্নের কারবারি। অনেক দিনের দোকান। পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। দোকানের শো-কেসে নাম-না-জানা নানাবিধ এবং নানা বিচিত্র বর্ণের মিষ্টান্ন দেখতে পাবেন। এবং সবগুলিই সুদৃশ্য। সব থেকে ভাল লাগে এঁদের মিষ্টান্নের বাক্সগুলি। বাঙালির দোকানের মতো প্যাতপ্যাতে কাগজের ক্ষুদ্র বাক্স নয়, যেখানে বারোটা সন্দেশ রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে জুড়ে গিয়ে ছটা হয়ে যায়। বম্বে সুইটসের বাক্স শক্ত কার্ডবোর্ডের। তার ওপর রুচিসম্মত নকশা।

আফলাতুন আগে পাওয়া যেত কানা-উঁচু ফয়েলের ট্রে-তে। ওই ট্রে-তেই বোধহয় মিষ্টান্নটির সৃষ্টি হয়। ট্রে-র সাইজ আধ কিলো বা সিকি কিলো। এখন দেখছি, ট্রের পরিবর্তে ছোট ছোট খণ্ডে আফলাতুন পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বা একশো গ্রামের খণ্ড। পরিপাটি কাগজের মোড়কে। বেশি চাইলে আদিষ্ট খণ্ডগুলি বাক্সবন্দি করে দেওয়া হয়।

এই মিষ্টান্নটি অতি নম্র চরিত্রের। চমকপ্রদ নয়। চেঁচিয়ে কথা বলে না। কালিয়া কবাব বিরিয়ানির মতো উগ্র ব্যঞ্জনাদির পর আফলাতুন ভাল লাগে শুধু তার সরল নম্র রূপের জন্য। মূলত দুধ থেকে তৈরি, আগে নাকি ডিমও মেশানো হত, এখন ডিম অনেকের অপ্রিয় বলে মিষ্টান্ন থেকে ডিম বর্জন করা হয়েছে। মিষ্টি কম, মৃদু একটা সৌরভ কালিয়া কোর্মার উগ্র গন্ধ ও গুরুভারের পর কোমল, মসৃণ, সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়া সৃষ্টি করে। মিষ্টান্নটি নিচু সুরে বাঁধা বলেই এত সৌন্দর্য।

বলা যেতে পারে, আফলাতুন আমাদের পরিচিত স্নিগ্ধ কেকের মতো। তা হলেও সবটা বলা হয় না। কুকুর তো নেকড়ের মতো দেখতে, অথবা বাঘের বাচ্চাও তো বিড়ালের মতো। তুলনা নিয়ে সব কিছু কি বোঝানো যায়? 'বম্বে রয়্যাল সুইটমিট'-এর সঙ্গে সেলুন শব্দটি কেন যুক্ত হয়েছে, কেউ বলতে পারবেন না। ভোজ্য দ্রব্যের দোকানের সঙ্গে সেলুন শব্দের সংযোজন আশ্চর্যজনক। বিশেষ কায়দা বা ইনডোর কোনও খেলার স্থানকে সেলুন বলা হত। পরে আমরা কীভাবে চুল কাটার দোকানকে এবং এখন প্রসাধনের স্থানগুলিকে সেলুন বলতে আরম্ভ করেছি, তাও জানি না।

'বম্বে রয়্যাল সুইটমিট' সেলুনের মালিকেরা আদিতে রাজস্থানি, পরে মুম্বইতে বহুদিনের অধিবাসী। প্রায় সত্তর বছর আগে পরিবারের এক সদস্য কলকাতায় এসে এই দোকানটির পত্তন করেন। আমাদের মিষ্টান্নের দোকানে স্বল্প পরিমাণ কেনবার খদ্দের অনেক, এখানে তা নয়। প্রধানত বড় বড় অর্ডার আসে, এবং তাই নিয়েই মালিকেরা

সন্তুষ্ট। খুচরো ক্রেতা দেখা যায় না।

দোকানে আরও বহুবিধ মিষ্টান্নের মধ্যে মাওয়া খাজা এবং মালাই খাজা আপনাকে আকর্ষণ করবে। তেমনি অন্য অনেকগুলির বর্ণময় উগ্রতা আপনাকে নিরস্ত করবে। আফলাতুন বিক্রি হয় কেজি দরে।

এঁদের আর একটি নিবেদন জিলিপি। আধকিলো ওজনের একটি জিলিপি নেওয়াই বিধি, যদিও আড়াইশো গ্রামের জিলিপিও পাওয়া যায়। আগে অর্ডার না দিলে পাওয়া যাবে না। হাওয়ায় আর্দ্রতা থাকলে তৈরি করা হবে না। শীতকাল তাই বম্বে সুইটসের জিলিপির জন্য প্রশস্ত সময়। তাও অন্তত পাঁচ বা তিন কিলোর অর্ডার দিতে হয়। শীতকাল প্রস্থানোদ্যত হলে জিলিপির আলোচনার দরকার নেই।

আফলাতুন সব ঋতুতে পাওয়া যায়। এবং দোকানে তৈরি থাকে। মিষ্টান্নটির বাড়তি গুণ হল তার আয়ু। অনেক দিন রাখা যায়। এই ঋতুতে রেফ্রিজারেটর দরকারও হয় না।

আফলাতুন শব্দের মানে অথবা উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বম্বে সুইটমিট সেলুনের মালিককে। তিনি বলতে পারলেন না। তিনি বিক্রির পরিমাণ নিয়েই খুশি। তাঁর কর্মচারী বললেন, আফলাতুন মানে পালোয়ান।

সৌরভকে হয়তো সেই অর্থে আফলাতুন নাম দিয়েছে মুম্বইয়ের মানুষ।

সন্দেশ

লন্ডন শহরে শুনেছি সাতশো ভারতীয় ও বাংলাদেশি ভোজনশালা আছে। কলকাতা শহরে ভোজনশালার সংখ্যা হয়তো সাত হাজার হবে। কিন্তু লন্ডনে যেমন সাতশো-এর মধ্যে সাতটার অধিক নাম মনে রাখবার যোগ্য নয়, কলকাতাতেও তেমনি। কলকাতার গোটা চল্লিশ ভোজনশালার সম্বন্ধে লেখবার পর তালিকার শেষাংশে পৌঁছে যাব, এই কলম শুরু করবার আগে এমন কথা মনে হয়নি। ভোজন তো আমরা এ জীবনে অনেকবার করি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ কয়েকবার। তার কটা-ই বা মনে থাকে, না, মনে রাখবার মতো? ভোজনশালার অভিজ্ঞতাও তাই। হয়তো সবাই হতাশ করে না। কিন্তু ক্ষুধার শান্তির অধিক দিতে পারে, মনকে সন্তুষ্টির পূর্ণ করতে পারে এমন ভোজনশালার সংখ্যা অধিক নয়। আর যারা ভোজনের মতো এমন একটা নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে দৈনন্দিন মলিনতার উর্ধ্বে পৌঁছে দেয় তেমন ভোজনশালা কোটিকে গুটিক। তাদের কাহিনী প্রায় শেষ হল।

ভোজনশালা নয়, অথচ পরম রমণীয় ভোজ্য পাওয়া যায় এই কলকাতার কয়েকটি দোকানে। মিষ্টান্নের দোকানে মিষ্টান্নের জন্যই বাংলার বাইরে বাঙালির সুনাম।আর বাংলার মিষ্টান্নের আকর হল কলকাতা। আশ্চর্য কী করে পুবে মারাঠা ডিচ আর পশ্চিমে প্রবাহিনী গঙ্গার মধ্যে এই মিষ্টান্ন প্রস্তুতের রহস্য গোপন আছে। গঙ্গা পার হলেই রসিকরা অনুভব করেন, মিষ্টান্নের জাত বদল হল। ফরাসডাঙার কাঁচাগোল্লা, কি জনাই-এর মনোহরার ভক্তেরা বিরক্ত হবেন না। তারা ব্যতিক্রমের দলে পড়েন, যে ব্যতিক্রম নিয়মটাকে প্রতিষ্ঠা করে মাত্র। জনাই-এর মনোহরার শিল্প অস্তমিত প্রায়। ফরাসডাঙা, অর্থাৎ চন্দননগরে গেলে এখনও কাঁচাগোল্লা মুগ্ধ করে। এদিকে দেখুন বউবাজার পার

হয়ে দক্ষিণে ভীমচন্দ্র নাগ এখনও প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছেন। কিন্তু এই একমাত্র। না হলে বউবাজার বা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের পরই অন্ধকার।

কেন এমন হল, এই শিল্পের সুমিষ্ট রহস্য কলকাতার মতো প্রসারিত শহরে এইটুকু জায়গার মধ্যে সঙ্গোপন থাকল কখনও ভেবে দেখিনি। ভোগ করেই আনন্দ পেয়েছি, আনন্দলোকে পৌঁছে গেছি। ক্যাসাবিয়াঙ্কা বলেছিলেন না তাঁর প্রশ্ন করার বাসনা নেই, অধিকারই নেই। আমারও তেমনি। প্রশ্ন কেন করব। এঁরা যে এখনও আছেন তাই তো জীবনের স্ফূর্তির ফোয়ারা। তাছাড়া দুরূহ প্রশ্নে যাবার প্রয়োজন কী? উত্তর পাওয়ার বেশি আর কী পাব? কখনও ভেবে দেখেছেন কি ক্ষুদ্র রাজ্য রাজস্থানের কয়েকটি মাত্র জেলার বণিক, যাঁদের আমরা মারওয়াড়ি বলি, তামাম ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্যে সর্বাধিকার করে বসে আছেন কোন জাদুবলে? আমাদের ক্ষুদ্র মোদক সম্প্রদায় যদি তেমনি করে তা হলে আর যাই হোক ভাবনার কোনও কারণ নেই।

আরও বিচিত্র এই যে ওই সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যেই যে সবাই এক কদরের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন তাও নয়। যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের শিরোমণিরা যেখানে অবস্থান করেন, সেই অঞ্চলের নাম সিমলা। সিমলের রামদুলাল স্ট্রিটে গিরিশচন্দ্র দে, নকুড়চন্দ্র নন্দীর আদি এবং একমাত্র দোকান। দোকানে কোনও সাজসজ্জা নেই, আলোর বাহারও অনুপস্থিত। একজন প্রায় বৈরাগী সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত চিত্তে আপনার প্রয়োজন শুনবেন। তারপর, অত্যন্ত মন্থরে তাঁদের কৃতি একটি কাগজের বাক্সে ভরে প্রায় অনিচ্ছায় আপনার হাতে ধরিয়ে দেবেন। অনিচ্ছার কারণ বুঝি। কোনও সার্থক শিল্পীই সহজে তাঁর সৃষ্টি খদ্দেরের হাতে দিতে পারেন না—যতই কেন না দাম পান। আর, এখানে তো দাম বাঁধা। গিরিশচন্দ্র নকুড়চন্দ্রের রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হল বাবু সন্দেশ। এই সন্দেশটির তুলনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। ছানার বিশেষ পাকের সন্দেশের মধ্যে একটু ক্ষীরের পুর। জিহ্বা স্পর্শ করলে স্বাদে গন্ধে একেবারে রসের ঝরণাধারা বইতে থাকে। এক টাকা মাত্র। মাপে বড়ই ছোট। কিন্তু ছবির গুণ কি মাপে নির্ণয় হয়? চিরকালের বিখ্যাত ছবি মোনালিসা লম্বায় চওড়ায় দেড়ফুটের কাছে। তাই বলে তার খ্যাতি পৃথিবীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কোথায় পৌঁছয়নি। ওই পাড়াতে আমার আর একজন প্রিয় আছেন—কালীচরণ দাস। কালীচরণের সৃষ্টি গোলাপি পেঁড়া গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একপশলা ক্লান্তিহর বৃষ্টির মতো শান্ত সুশীতল। তার ওপর মৃদু গোলাপের সুগন্ধ। পাক অবশ্য বাবুর থেকে একেবারে আলাদা। অথবা বলতে পারেন ভোরবেলার ফুলের মতো স্নিগ্ধ প্রাণজুড়ানো। আট আনার পাওয়া যায়। তাতে স্বাদ পাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ই ক্ষণিক। এক টাকার সন্দেশ নেওয়াই ভাল। তবু কিছুক্ষণ ভক্ষণ করা যায়, শুধু স্মৃতির রোমন্থন করতে হয় না।

যাঁরা উত্তরে এত দূর আসতে দ্বিধা করেন, তাঁরা রাসবিহারী অ্যাভিনিউর যাদবচন্দ্র দাসে যেতে পারেন। যাদবের সন্দেশের নাম আবার খাব। গিরিশের বাবুর সহধর্মী। তা হলে কি আমার থিসিস ভুল হল? দক্ষিণেও যদি সমান সুস্বাদ পাওয়া যায়? একটু গভীরে গেলে আমার মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যাদবের আদি এবং প্রধান বিপণি উত্তর কলকাতায় এবং সেখানেই এঁদের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়।

এখন শীতকাল। এখন আপনার কালীচরণের নলেন গুড়ের কাঁচাগোল্লা পরীক্ষা করা দরকার। একবার স্বাদ নিলে আর ভুলবেন না। স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। নলেন গুড়ের মাদকতাময় সুগন্ধ, অতি কোমল গোধূলির ছায়া ছায়া রঙের এই সন্দেশ এত অপরূপ আর কোথাও হয় বলে জানি না। আমি নাম দিয়েছি ডবলমণ্ডা। কারণ দু খণ্ড মিলে একটি সন্দেশ হয়। যেমন চেহারায় অপরূপ, স্বাদেও অসাধারণ। আবার সেই কথা। আট আনায় নিতে পারেন কিন্তু এক টাকার সন্দেশ কিনতে পারলে ভাল হয়।

বাগবাজার দুর্গাচরণ স্ট্রিটে এক নতুন ঘরানার সন্দেশ শিল্পী আছেন। সব গায়ক নতুন রাগরাগিনীর সৃষ্টি করতে পারেন না। সব শিল্পী যেমন পারেন না নতুন কোনও স্টাইলে আঁকতে। এঁরা অসাধারণের দলে। প্রচলিত ঘরানার বাইরে নতুন সুর রাগ নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁদের সৃষ্টিতে এক নতুন স্বাদ উপস্থিত করেছেন। এঁদের নাম স্বাধীন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। সন্দেশের নাম স্টিম সন্দেশ। এবং এঁরা বাক্সের ওপর ঘোষণা করেন: স্টিম সন্দেশের আবিষ্কারক। সার্থক শিল্পীর কাজই তাই। রসের উৎসের আবিষ্কার। এঁদের রচনা একেবারে অন্য স্বাদের। বিলিতি পুডিং এর একটু স্পর্শ আছে সেই স্বাদে। সে, বোধহয় সন্দেশটা ভাপানো বলে। শুনেছি উত্তরবঙ্গে এই ধরনের ভাপানো সন্দেশের প্রচলন আছে। কলকাতায় এই ঘরানার আর কেউ আছেন বলে জানি না।

বাঙালি মিষ্টির দুটি ধারা সন্দেশ ও রসগোল্লা। সন্দেশের ইতিহাস প্রাচীন। রসগোল্লা সবে শতাব্দী পার করেছে। রসগোল্লার আবিষ্কারক নবীনচন্দ্র দাস কবেই তাঁর সাধনার কেন্দ্র বাগবাজারের দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। মহৎ শিল্পের মৃত্যু হয় না। উত্তরসূরীরা সাধনায় রত থাকেন। এখন কলকাতার সর্বত্র রসগোল্লা পাওয়া যায়। এবং আবার আশ্চর্য, গঙ্গা পার হলেই তার স্বাদগন্ধ একটু পেছিয়ে পড়ে। রসগোল্লার স্রষ্টা এই শহরে অনেক। আমার প্রিয় দোকান শ্যামবাজার, এ. ভি. স্কুলের কাছে শ্যামবাজার স্ট্রিটের ওপর চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। এঁদের রসগোল্লা আট আনার হলেও আপনাকে মুগ্ধ করবে। এমন হালকা, অতি কোমল জুই ফুলের মতো পবিত্র রসগোল্লা আমার অভিজ্ঞতায় কমই এসেছে। পথিকৃৎরা চলে যাবার পর সভ্যতা যে স্তব্ধ হয়ে যায় না অগ্রসর হয়, তার কারণ নতুন সাধকেরা যোগ দেয়, ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখেন, মহিমান্বিত করেন। নবীনচন্দ্রের সৃষ্টিকে চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার চির নবীন করে রেখেছেন।

আলফানসো নয়তো ম্যাঙ্গোস্টিন

বর্ষা সমাগমে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়। একটা বছর চলে গেল, এবারও বর্ষার আগে যাওয়া হল না মুম্বই এবং ব্যাঙ্কক। বর্ষার পূর্বে পৌঁছতে পারলে এই দুই স্থানেই যে সুখের আকর, বর্ষা সে সুখ নিঃশেষে ধুয়ে দেয়।

মুম্বইতে বর্ষার আগে অসহ্য ঘর্মাক্ত গরম। আর সে সময় ব্যাঙ্কক ছ্যাঁকা লাগিয়ে দেয় গায়ে। তবু এই দুই শহরেই বর্ষার অব্যবহিত পূর্বে পৌঁছতে চাই।

বর্ষার আগমনে মুম্বই থেকে নিরুদ্দেশ হয় আলফানসো। তেমনি, সারা গরমকাল জাঁকিয়ে রেখে জুন-জুলাই থেকে বিদায় চায় ব্যাঙ্ককের ম্যাঙ্গোস্টিন।

পাঁচ হাজার বছর আগেও আমের উপস্থিতি ছিল ভারতবর্ষে। আরও নানাস্থানে, নানা দেশে আম পাওয়া যায়। কিন্তু আলফানসো আমের মতো এমন অনির্বচনীয় ফল ভারতের পশ্চিম তট ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। পশ্চিম তটের কোন বিন্দুতে আলফানসো তার স্বমহিমায় প্রকাশিত সে অনন্ত তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি। গুজরাতিরা বিশ্বাসে অনড় যে, বালসার জেলার আলফানসোই আসল জাত কুলীন। অন্য পক্ষে, মারাঠিরা বিশ্বাস করেন এবং এই নিয়ে বছরের পর বছর তর্ক করতে পারেন যে, রত্নাগিরি জেলার আলফানসোর পাদনখকণার যোগ্য নয় বালসারের আলফানসো। পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করা হয়। আমি অনধিকারী, সে সব যুক্তি-তর্কের সম্যক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু মনে মনে বলি, আলফানসো যে রাজকুলজাত সে তো প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়— তা সে বালসারের হোক, অথবা রত্নাগিরির। রূপ, স্বাদ, গন্ধে আলফানসোর তুলনীয় কোনও আম সারা পৃথিবীতে দুর্লভ। আমের এমন বিদেশি পর্তুগিজ নাম আলফানসো

কেন হল তাই নিয়ে গবেষণা করিনি। পুর্তগিজরা ভারতে আসবার কয়েক হাজার বছর পূর্বে আমের স্বাদে মুগ্ধ হয়েছে ভারতীয়েরা। পর্তুগিজেরা গুজরাটের সুলতানের কাছ থেকে পশ্চিম উপকূলের সাতটি ছোট দ্বীপ জয় করে নিয়েছিল ১৫৩৪ সালে। ১৬৬১ সালে পর্তুগিজ রাজকন্যার সঙ্গে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহে পর্তুগালের রাজা জামাইকে দ্বীপগুলি যৌতুক দিয়েছিলেন। সেই সাতটি দ্বীপ ক্রমে যুক্ত হয়ে আজকের মুম্বই শহর। দরিদ্র কয়েকঘর মৎস্যজীবীর গ্রামগুলি মিলে আজ ভারতবর্ষের প্রথম শহর মুম্বই। মৎস্যজীবী কোলিদের দেবতার নাম মুম্বাদেবী, যার থেকে শহরের নাম। এখন শহরটা কুবেরের আরাধনায় মত্ত। অতীতকে মুছে ফেলে দ্রুত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। যে ভবিষ্যতের সম্পদ ছাড়া অন্য আকাঙ্ক্ষা নেই। সুতরাং আলফানসো তিনশো টাকা ডজন বিক্রি হবে মুম্বইয়ের বাজারে, তাতে আশ্চর্য হওয়া নেই। দুধেআলতার সঙ্গে কাঁচা হলুদ মেশানো রং। প্রথম দর্শনেই আলফানসো রসিককে মুগ্ধ করে। স্বাদের পর তো আজীবনের ভালবাসা। আমার বার বার মনে হয়েছে স্বাদে-গন্ধে ভরা দেবতাদের নন্দনকাননচ্যুত এই ফলটি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছল কেন? আবার ভেবেছি, বিধাতা কী অপার করুণাময়, যে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ফলটি তিনি মনুষ্যজাতিকে দান করেছেন।

অবশ্য ক্রমশ আলফানসোর স্বর্গারোহন শুরু হয়েছে। দামের দিক থেকে বলছি। আলফানসোর মহিমা অনেকেই জেনে গিয়েছেন, পৃথিবীর দিকে দিকে এখন তার জয়যাত্রা। এ বছর শুনলাম, ক্রফোর্ড মার্কেটে ধোবলের দোকানে আলফানসোর দাম উঠেছিল তিনশো টাকা ডজন।

কলকাতা-মুম্বইয়ে বিমানে যাতায়াতের ভাড়া এগারো-বারো হাজার টাকা। কলকাতা-ব্যাঙ্কক যাতায়াতের বিমান ভাড়া তেরো হাজার। সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে না হলেও অথবা সেই জন্যই, ব্যাঙ্ককের ফল ম্যাঙ্গোস্টিন আমাকে প্রবল চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। ভ্রমণের অভিলাষে ব্যাঙ্কক, সেখান থেকে পটায়া এবং নতুন প্রমোদকেন্দ্র ফুকেট এখন পর্যটকের বৃত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে।

ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের রাজধানী। সাতশো বছর পূর্বে তখনকার শ্যামদেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র হয়েছিল। শ্যামদেশের নাম এখন থাইল্যান্ড, থাই স্থাপত্যে নৃত্যধারায়, ভাষায়, মানুষের নামে স্পষ্ট ভারতীয় প্রভাব। এত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের সঙ্গে ম্যাঙ্গোস্টিনের পরিচয় হয়নি। আশ্চর্য, ব্যাঙ্কক থাইল্যান্ডের রাজধানী হয়েছে ১৭৮২ সালে, রাজা প্রথম রাম অয়োথিয়া (অযোধ্যায়) থেকে রাজধানী নিয়ে এলেন ব্যাঙ্কক। চাও ফ্রায়া নদীর প্রধানত পূর্ব তীরে শহরের পত্তন হল। অধিবাসীরা বলে ক্রুং থেপ।

ম্যাঙ্গোস্টিন, পূর্ব এশিয়ার এই অভিনব ফল মানুষকে বিধাতার উপহার। পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও বর্ষাপূর্ব সময়ে চেন্নাই, বাঙ্গালোর, তিরুবনন্তপুরমের বাজারে ম্যাঙ্গোস্টিনেরা স্বল্প কালের জন্য উপস্থিত হয়। ঈশ্বর অনেক বস্তুই মানুষকে সোজাসুজি দেন না। সুখ তাই খুঁজে নিতে হয়। ম্যাঙ্গোস্টিন প্রথম দর্শনে আকর্ষণ নয়, বরং বিকর্ষণের সৃষ্টি করে। টেনিস বলের চেয়ে কিছু ছোট,

ক্ষুদ্র একটি তালের মতো। তেমনই বোঁটার কাছে সবুজ ফুলকাটা। তালের মতোই সর্বাঙ্গে শক্ত আস্তরণ, তেমনই কালোর থেকে বেগুনি রঙের আভা। আলফানসোর মতো আদৌ রূপবান নয়, বরং তার বিপরীত। পাকা ম্যাঙ্গোস্টিনে চাপ দিলে কঠিন আস্তরণ ছিঁড়ে ভেতরের শিমুল তুলোর মতো সাদা, তুলোরই মতো নিষ্পাপ কোমল ফলটি উঁকি দেয়। কঠিন আবরণের ভেতরের দিক গাঢ় বেগুনি। মনে হবে যেন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে কোনও অপ্সরার উদয় হল। তিনটি বা চারটি কোয়া। বিচি থাকে একটি বা দুটি। মৃদু সূক্ষ্ম বিবশ করা ঘ্রাণ, অনির্বচনীয় কোনও স্বাদ। বাকিটা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের। প্রথম পরিচয়ে আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল, বিধাতা নিজেকে বঞ্চিত করে মানুষকে এ কী অপার্থিব উপহার দিয়েছেন।

ফলের ঋতু এই গ্রীষ্ম

যতই কেন উদ্বাহু হয়ে এসো এসো, এসো হে বৈশাখ বলে সমবেত গান ধরি, বৈশাখের আগমন এবং তার তাপমাত্রা কিছু আরামের ঘটনা নয়। অপেক্ষিতও নয়। গ্রীষ্ম মানেই প্রখর তপনতাপে তৃষিত ভূখণ্ড। গরমে, ঘামে চিত্ত বিক্ষিপ্ত, তালু শুষ্ক। গ্রীষ্মের আগমনে বৎসরের আবর্জনা যে দূরে যায় না, শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে এই কলকাতা শহরকে এক নজর দেখলেই সেটা বোঝা যায়। বরং এই ঋতুতে আবর্জনা যেন আর একটু বাড়ে। ডাবের খোলা, লিচুর ডালপাতা, আমের ভাঙা চুপড়ি পথে ও পথের ধারে ছোটখাট শৈলশ্রেণী তৈরি করে। কাঁঠালের ভূতিপচা যে এখন আর তেমন দেখতে পাই না, সে বোধকরি কোনও শহিদের নামে কিনু গোয়ালার গলির নামান্তর হয়েছে বলেই। কিন্তু এই স্তূপীকৃত নতুন আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে শান্তির সুজল, তৃষ্ণার শান্তি। কারণ গ্রীষ্মকাল হল ফলের, ফলমূলের কাল, অন্তত এই বঙ্গসংস্কৃতিতে। কবে মেঘের ভস্মে সূর্যের রোষবহ্নি আবৃত হবে, দক্ষিণ থেকে সলজ্জ হাওয়া বিগত বসন্তের দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনবে, তার জন্য যখন অপেক্ষা, তখন গ্রীষ্ম তার ফলের পসরা ডালিতে সাজিয়ে দেয়। পশ্চিমবাংলা ফলের জন্য বিখ্যাত নয়। আপেল, আঙুর হয় না, পেস্তা বাদামও অনুপস্থিত। দক্ষিণে ডাব নারকেল সপেটা বা সবেদা, উত্তরে আনারস ভালই পাওয়া যায়—কিন্তু ঋতুবদল হয়ে গ্রীষ্ম একবার পৌঁছলে সঙ্গে আসে আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, গোলাপজাম, তরমুজ, লিচু, তালশাঁস, ফলসা, ক্ষণস্থায়ী এবং বিরলদর্শন লোটকা। ফলভারে অলংকৃত দেশটা তখন আমাদের গ্রীষ্মের সান্ত্বনা।

ফলের রাজা হল আম। কিন্তু আমের রাজা? বিষয়টি নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে মতভেদ আছে। মনে করুন গ্রীষ্মের ভর দুপুরে ট্রেনে করে চলেছেন দিল্লির পথে। কামরার

জানালা খুললে আগুনের হলকা সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কাচের এপার থেকে বাইরে চেয়ে আছেন। এক রঙা ছবির মতো সবকিছু ধুলার রং, ধুলার রুক্ষ সূর্যের রং রক্তহীন, গাছপালা স্থির, যেন কোনও মহা আশঙ্কা 'জপিছে মৌন মন্তরে।' হঠাৎ জানলার ফ্রেমে ধরা পড়ল এক ঝলক দীর্ঘ গভীর নীল সবুজ মেশানো ছায়াঘেরা গাছের জটলা। গ্রীষ্মের অগ্নিমূর্তিকে হেলায় অস্বীকার করে ঘন সবুজের একটা দ্বীপ। ট্রেন দ্রুত চলেছে, নইলে নেমে পড়তে পারলে পৌঁছে যেতেন কারও যত্ন-রক্ষিত আমবাগানে।

এই হল আম্র-সম্রাটের কেন্দ্রভূমি। এলাহাবাদ, বারাণসী অঞ্চলে। সম্রাটের নাম ল্যাংড়া। কেন এমন নাম হয়েছিল জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। গায়ের রং হালকা সবুজ। ভেতর থেকে হলুদ উঁকি দিচ্ছে। ল্যাংড়ার খোসা সুন্দরীর ত্বকের মতো পাতলা। যে রসাল পদার্থটি তার সমস্ত তরল সম্ভার নিয়ে ভেতরে বন্দি হয়ে রয়েছে, তার থেকেই বুঝি আমের অপর নাম রসাল? শুধু কি মিষ্টত্ব? ঘুমঘোরে নিশির ডাকের মতো আকুল করা ঈষৎ অম্লের স্বাদ নিমেষে মনপ্রাণ আপ্লুত করে। আঁটিটি অত্যন্ত পাতলা এবং ছোট—এমন করে সর্বস্ব নিবেদন করে না আর কোনও আম।

ল্যাংড়ার প্রশস্তি শুনলে মুম্বইবাসীরা ক্ষুণ্ণ হবেন। এমনকী দীর্ঘকাল মুম্বইবাসী বাঙালিরাও। এই নিয়ে অনেক তর্ক শুনেছি, তর্কে যোগ দিয়েছি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বিতর্কের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। পশ্চিম উপকূলের মানুষের হৃদয় জুড়ে বসে আছে আলফানসো। সোনায় আলতা মাখা রং, ভেতরটাও কমলা ও লালে রঞ্জিত। অবশ্যই মিষ্ট কিন্তু এ কোন অপার্থিব মিষ্টতা—যার তুলনা শুধু আলফানসোর সঙ্গেই হয়—যার অপর নাম হাপুস। একটু অম্লের আভাস আছে বিস্মৃতপ্রায় সুখস্বপ্নের মতো।

সুখের কথা, দুই সম্রাট একত্রে সভাস্থ হন না। নইলে আমাদের মতো রাজভক্ত মানুষের বড় সমস্যা হত। এপ্রিল—প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে, অর্থাৎ আমাদের নববর্ষে গ্রীষ্মের বোধনের জন্য পাওয়া যায় আলফানসো। প্রাচীন রাজপরিবারের যেমন হবার কথা, সব কিছু ঐতিহ্যের কড়া নিগড়ে বাঁধা, আলফানসোরও তেমনি জুন মাসের দশ তারিখ আসতে না আসতে যেই মুম্বইয়ের আকাশ আর সমুদ্র মেঘের মায়ায় আচ্ছন্ন, আলফানসো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হবেন। হবার কথাও, এবার ল্যাংড়ার পালা, তার নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

ল্যাংড়া অপাপবিদ্ধা কিশোরীর মতো বড় স্পর্শকাতর আম। হবেই তো, এ আমও বিশিষ্ট রাজপরিবারের। ল্যাংড়ার রস সম্যক উপলব্ধি করতে হলে একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণ হওয়া চাই। তার আগে যদি আপনি আমটির স্বাদ নেন, অম্লের ভাব বেশি হবে। আর যদি দেরি করে ফেলেন, পার হয়ে যান সেই মাহেন্দ্রক্ষণ তা হলেই ঝাঁঝালো একটা স্বাদ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, আপনি পরমক্ষণটি ধরতে পারেননি। ল্যাংড়ার সৌরভ তার আর একটি চরিত্র লক্ষণ। প্রসাধনের শ্যানেল অথবা চার্লির সুগন্ধের যেমন বর্ণনা করা যায় না, ল্যাংড়ার সৌরভও তেমনি অবর্ণনীয়।

আলফানসো ল্যাংড়ার মতো এত স্পর্শকাতর, অত লাজুক নয়। আমটা বেশি দিন থাকে। সময়ের ছাপ তার স্বাদে ও শরীরে কম চিহ্ন ফেলে। তাই আলফানসো অক্লেশে

বিদেশযাত্রা সইতে পারে। দীর্ঘ সফরে কাবু হয় না। তাই আলফানসো এখন বিদেশি মুদ্রা অর্জনে কাজে আসে। আমাদের রসনা বঞ্চিত হয়।

বলতে পারেন, আমের কথাই তো পাঁচ কাহন, বাকি ফলেরা কি তবে বানের জলে ভেসে এসেছে? নিঃসন্দেহে গ্রীষ্মের অন্য ফসল লিচু, জাম এবং অন্যান্যেরাও সামান্য নন। তাঁরাও তৃষ্ণা নিবারণে, নিজেকে বিলিয়ে আমাদের সুখ দেবার ক্ষেত্রে কারও চেয়ে কম নন। কে কতখানি ভিটামিন বা কী কদরের মিনারেল সরবরাহ করেন, সে আলোচনা করব না। আমি আহার ও পথ্যের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বিভাজনরেখার পক্ষপাতী। লিচুর কোনও পথ্যধর্মী গুণ আছে বলে শুনিনি। কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী ফলটিও তার মন্দ জীবনে যে সুখের ভাণ্ডার উন্মোচন করে দেয় তার কি তুলনা আছে? কিন্তু লিচু বলুন, কিংবা জাম অথবা জামরুল—তাদের নিজেদের মধ্যে কি কোনও রকমফের আছে? লিচু দুই প্রকারের হয়—ভাল অথবা সাধারণ। এই শ্রেণীভাগ আম ব্যতীত সব ফলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জামও হয় ভাল, অথবা সাধারণ। জামরুলও তেমনি। কিন্তু আমের প্রজাতির কি শেষ আছে। তাই আম বিশিষ্ট এবং বিশেষ। মানুষ অথবা পাখির ক্ষেত্রে যেমন, কত জাতি, প্রজাতি, উপজাতি। আমেরও তেমনি। হিমসাগর আম হয়েও আলফানসো বা ল্যাংড়াও নয়। অথচ অমন যে দেবভোগ্য লিচু, যদি দ্বারভাঙ্গার হয়, তা হলে আরও একটু ললিত, গভীর রক্তাভ, সুগন্ধে বারুইপুরের লিচুকে হার মানায়।

জামরুল যদি তাজা হয়, এবং আকারে কিঞ্চিৎ বৃহৎ তা হলে এমন সুস্বাদ তাপনিবারক, তৃষ্ণাহর আর কিছু হয় না। কিন্তু জাতি, প্রজাতি মিলিয়ে জামরুলও একমেব। তবে ভালয় মন্দে ব্যবধান সামান্য না হতেও পারে। পুষ্ট বিচি ও সামান্য তুকাশ্রয়ী কালোজাম এবং সুপুষ্ট কালোজামের স্বাদের প্রভেদ আকাশ পাতালের মতো। কিন্তু ওই দুই জাত। ভাল আর সাধারণ। একটি ফলের প্রতি আমার আকিঞ্চন থেকে যায়। ফলটি আমাকে প্রায়ই পরিহার করে। বাজারে তার দেখা পাই না। যখন পাই, তার দেহ শুষ্ক, শরীর রসহীন, ঝুমঝুমির মতো ভেতর থেকে বিচি দুটির অস্তিত্ব শুনতে পাই। তখন তার দেবার বিশেষ কিছু থাকে না। সেই গোলাপজামই শুনেছি বয়ঃপ্রাপ্তিতে সুপুষ্ট হলে তার বিশিষ্ট সৌরভে ও স্বাদে মায়া রচনা করে। ফলটি যেমন দর্শনলোভন, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ওই দুই জাতের শুধু—ভাল আর সাধারণ।

হিমসাগরের কথা বলেছিলাম ক্ষণকাল পূর্বে। ভস্মলিপ্ত সন্ন্যাসীকে দেখে যেমন বোঝা যায় না তিনি অসাধারণ কোন স্তরে পৌঁছেছেন, হিমসাগরের সামান্য কালিমা লিপ্ত সাধারণ চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে ওই অপ্রীতিকর আবরণের নীচে অমন সুস্বাদ ফল অপেক্ষা করছে। দুই সম্রাটের সমকক্ষ নয়। তবে স্বভাবে ও প্রকৃতিতে অতি হৃদয়গ্রাহী। তা ছাড়া সহজলভ্য। ভালবাসার মানুষ যদি অধিগত না হল তা হলে তো পরের হাতে তামাক খাওয়ার সমান।

আমের ভক্তের সংখ্যা অগণিত। বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন জগতের আমের প্রতি আনুগত্য এবং অনুরাগ প্রকাশ করেন।

জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে এখনকার মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডু নামের জনপদে আম সেবন করে তিনি মোহিত হয়েছিলেন। লিখেছিলেন, এদেশের আমের সঙ্গে অন্য কোনও আম

গন্ধে, মিষ্টত্বে আঁশহীনতায় ও আকারে পাল্লা দিতে পারবে না।

শ্রীসুকুমার সেনের স্মৃতিচারণ থেকে জেনেছি চৈতন্যদেব খুব আম পছন্দ করতেন, কিন্তু কোন আম লেখা নেই। আরও একটা বিচিত্র খবর দিয়েছেন শ্রীসুকুমার সেন, ল্যাংড়া আমের নাম সত্তর-আশি বছর আগে ছিল আনারসি। আরও কয়েকটা বিখ্যাত আমের হদিস দিয়েছেন শ্রীসুকুমার সেন। লাউ-এর মতো প্রকাণ্ড মহারাজপসন্দ (মহারাজের পছন্দ অনুমোদন করতে পারলাম না), সুপুরির মতো ছোট, কর্পূরের গন্ধে ভরা আম নম্বুরি। আরও কত নাম—কলামোচা, বেলখাস, ইলশেপেটি, মিছরিভোগ।

আমের বর্ণনার কি শেষ আছে? উত্তর ভারতের দশেরি যার বিশেষ মিষ্টতা সবাইকে নির্ভেজাল আনন্দ দেয় না, সেই দশেরি নাকি এই বাংলার বিস্মৃত ইলশেপেটির মতো। আমের রাজত্বে বছরের শেষ রাজা চৌসা। ইনিও উত্তরভারতের। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে এর প্রতিপত্তি বেশি। বছরের শেষ ফসল। আর সবাই যখন প্রায় অনুপস্থিত, তখন সামান্য ভালও সবাই স্বাগত করবেন। কিন্তু চৌসা তার চেয়েও ভাল। আকার আকৃতিতে সুশ্রী নয়, ওজনে ভারী কিন্তু স্বাদে অবিমিশ্র সুখের।

এবার আমের যাবার সময় হল। অন্যান্য ফলেরা আগেই বিদায় নিয়েছে। এর বিদায়ের সময়ে এমনিতেই মন ভারাক্রান্ত হয়। যাকে কখনও দেখিনি তার জন্যও বিয়োগব্যথা অনুভব করি। যেমন কোহিতুর। উত্তরবঙ্গের এই প্রবাদ-প্রতিম আমটির সঙ্গে কখনও পরিচয় হবার সম্ভাবনাও নেই। পরিচয় হয়েছে এমন মানুষও দেখিনি। শুনেছি অপার্থিব এই ফলটি নাকি অত্যন্তই লাজুক, স্পর্শকাতর। এই ফলের চরম ও চূড়ান্ত স্বাদের কাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রত্যাশায় বৃক্ষতলে দিনরজনী অতিক্রান্ত করেও কেউ নাকি কোহিতুরকে তার পরম রসঘন মুহূর্তে ধরতে পারেনি।

শতবর্ষে বাঙালির রুচিবদল

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি
তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিই তাতে।
হাপুস হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

রবীন্দ্রনাথের সাত-আট বছর বয়সের লেখা কবিতাটি যদি সেকালের ছবি বলে ধরি, তা হলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এই সামান্য আয়োজন তখন এতই রমণীয় ছিল বাঙালির কাছে যে তার কণামাত্র পাতে পড়ে থাকে না। নিরাশ পিঁপড়ে কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়।

এ তো ১৮৭০ সালের আশপাশের ঘটনা। তার আগে ঈশ্বরী পাটনি অন্নপূর্ণার কাছে আরও সামান্য প্রার্থনা করেছিল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'

কাবাব কোফতা নয়, পোলাও বিরিয়ানি নয়, পরমান্ন সন্দেশ নয়, শুধু দুধেভাতে।

এই প্রার্থনা কি বাঙালির উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিখর, অথবা ভোজন সম্বন্ধে তার কল্পনার সীমান্ত?

সদ্য-নিষ্ক্রান্ত বিংশ শতাব্দীতে বাঙালির রন্ধন-ভোজন প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথাগুলি মনে এল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনার দশ বছর আগে একটি বিশাল রন্ধনপ্রকরণ লিখেছিলেন,

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। তিনি ছ'শোর অধিক ভোজ্যের পাকপ্রণালী উপস্থিত করেছিলেন। তার মানে বালক রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত কবিতাটির বিশ বছরের মধ্যেই বিপ্রদাস তাঁর বিশাল রন্ধনকোষ লিখেছেন। তাঁর পরেও যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা অনেকেই পাঁচ-ছ'শো ব্যঞ্জনের পাকপ্রকরণ বাঙালি পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। যেমন, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। শতখানেক বছর পরে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রেণুকা চৌধুরির বই 'নিরামিষ রান্না'-তে চারশোর বেশি পদের বিবরণ আছে।

এইসব পদ রবীন্দ্রশৈশব এবং উনিশ শতাব্দীর প্রস্থানের পূর্বেও নিশ্চয়ই বাঙালির হেঁশেলে প্রত্যহ না হলেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হত, তাতে সন্দেহ নেই। এখন নতুন শতাব্দীর শুরুতেও জোর করে বলা যায় না যে, ওইসব বিশিষ্ট ভোজ্যের সঙ্গে আমাদের জনসাধারণের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। তবু পাকপ্রক্রিয়ার অমন সুচারু ব্যাখ্যান থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, গত শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালি খেতে শিখেছে।

তারপর থেকে এই একশো বছরে বাঙালি রুচি অনুরাগের কী পরিবর্তন হয়েছে তার আলোচনার সূত্রপাতের জন্য এই প্রাক্‌কথন।

সে রাম থাকে না, সে অযোধ্যাও নয়। এটাই নিয়ম। যে সব ভোজ্য একদা আমাদের নজর আবিষ্ট করেছিল, তার অনেকগুলিই আমরা ভুলতে বসেছি—আবার তেমনি নতুন কিছু ভোজ্যও দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর মতো আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ভোজন সম্বন্ধে আমাদের অভ্যাস রীতি রেওয়াজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঘটেছেও তাই।

সেকালের, অর্থাৎ উনিশ শতকের রন্ধন-ভোজনের কথা বেশি আমার জানা নেই। নানা স্থানে যা কিছু পড়েছি, তার বেশি বলতে পারব না। অন্য পক্ষে বিংশ শতাব্দীর তিন পাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা ব্যক্তিগত।

উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে রন্ধন-ভোজন সম্বন্ধে মূল্যবান টুকরো টুকরো খবর পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের চটি বই 'কলকাতার প্রাচীন প্রথা ও কাহিনী' থেকে। মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৯ সালে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। তাঁর শৈশব মানে ১৮৭০-১৮৮০ সালের ঘটনা। বিপ্রদাস মুখুজ্যে মশাইয়ের বইয়ের প্রকাশকাল ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের শৈশব প্রায় এক সময়ের।

তখনও মাছেভাতে বাঙালি। ভাত আর মাছের ঝোল পেলেই বাড়ির সবাই খুশি। তার ওপর গৃহকর্ত্রী যদি মাছের ঝাল কি কালিয়া প্রস্তুত করে থাকেন, তা হলে তো কথাই নেই।

অনেক পরে, গত ত্রিশের দশকে, তখনও যৌবনোদ্গম হয়নি, হাফ প্যান্ট ছেড়ে সবে ধুতি পরব-পরব করছি, চিংড়ি মাছ ভাপা ও চিংড়ির মালাই আমাদের খুব আলোড়িত করত। এই দুটি পদের সঙ্গে যদিও কদাচ দেখা হত। বিয়ে-শাদির মত বড় উৎসবে কখনও চিংড়ির মালাই-এর সুখ পেয়েছি। চিংড়ির ভাপা, আমরা বলতাম 'ভাতে' গৃহস্থের বাড়িতেই প্রস্তুত হত। অর্থাৎ হওয়ার কথা, কিন্তু বাজার আসবার আগেই ভাত হয়ে যায় বলে চিংড়ি-মাছ-ভাতের দর্শন কঠিন ছিল। মা চিরকাল এই অজুহাত দিয়েছেন।

চিংড়ি-মাছ-ভাতে তাই হঠাৎ কোনও আকস্মিক অলৌকিক ঘটনার মতো বিস্ময়ের বস্তু ছিল আমাদের কাছে।

এখন হয়তো মাঝে মাঝে চিংড়ি মাছ-ভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবলতর। কিন্তু স্বয়ং চিংড়ি মাছই এমন দুর্লভ হয়ে উঠেছে যে, চিংড়িভাতে হয়তো আমাদের ভোজনপাত্র থেকে চিরবিদায় নেবে।

যখন যৌবনোদ্গমে কলকাতায় পড়তে এলাম, সর্ব বিষয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যদিও আজকের মতো তখন কারণে-অকারণে গেরস্ত বাড়িতে পার্টি অজানা। তবু এ শহরে দৈনন্দিন ভোজনেও কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত ছিল।

আমাদের পরিবার চরিত্রে বৈষ্ণব। ছাগমাংস আমার বাবা-কাকাদের আগ্রহে সবে গৃহপ্রবেশের অনুমতি পিয়েছিল। তাও কি, মাসে হয়তো একবার, আবার তাও নয়। রান্নাঘরে রান্না হবে না। বাড়ির মেয়েরা মাংস রান্না করতেন না। বাড়ির এক কোণে সিঁড়ির নীচে কাকারা কেউ রান্নার শেফ। আলাদা বাসন ছিল। সে বাসন বাড়ির অন্য বাসনের কাছে একঘরে। ছোঁওয়াছুঁয়ি পর্যন্ত নেই। সাধারণত কলাপাতায় ভোজন হত। আমার ঠাকুমা এমনও প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু বেশি চাপাচাপি করেননি, মাংস খাওয়ার পর কাপড় বদলাতে হবে।

এ হেন সংসারে যখন আমাদের বায়নায় মুরগি ঢুকল, তখন আমরা স্বর্গ জয়ের স্বাদ পেলাম। যদিও মুরগি বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি। রান্না হত গোয়ালের এক কোণে, পাশের একটা চালায় বসে ভোজন। সে স্বর্গীয় ভোজের তুলনা আর এ জীবনে পেলাম না। এ কোনও স্বর্গচ্যুত পাখি আমাদের অমৃতের স্বাদ দেওয়ার জন্য প্রাণ দিয়েছে।

কলকাতায় এসে দেখি, মুরগি যদিও সাধারণ গৃহস্থের পাকশালায় তখনও নিষিদ্ধ, কিন্তু পাড়ার হোটেলে, দোকানে, রেস্টুর‍্যান্টে মুরগির ব্যঞ্জন অপ্রাপ্য নয়। সেই প্রথম পরিচয় হল চাচার হোটেলের সঙ্গে। তাঁদের অবদান ফাউল কাটলেটের সঙ্গে প্রথম দর্শনে, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের মতো, স্থায়ী প্রণয়। যদিও চাচার হোটেলের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে, বা হতে চলেছে, ফাউল কাটলেট তার মর্যাদার বেদি থেকে অপসৃত। এখন সর্বত্র চিকেন কাটলেট পাওয়া যায়। তাদের কারও স্বাদ চাচার ফাউল কাটলেটের সমকক্ষ নয়, সে স্বাদ ফিরিয়ে আনতেও পারে না। স্বয়ং চাচার হোটেলে ফাউল কাটলেটের সেই মায়াবী স্বাদও আজ নেই, যা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল বাল্যকালে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাঙালি মধ্যবিত্ত ভোজনশালাগুলির অধোগতি সর্বথা আর্থনীতিক কারণের জন্য। চাচার ফাউল কাটলেটের মায়াজালের যে সময়ের কথা বলছি, তখন এক টাকায় দুটি মুরগি পাওয়া যেত। তখন চাচার কাটলেটের দাম ছিল চার আনা। হিসেব করলে দেখতে পাই মুরগির দাম বেড়েছে একশোগুণ। সে নিরিখে আজ ফাউল কাটলেটের দাম হওয়া উচিত অন্তত পঁচিশ টাকা। অথচ চাচার এখন চিকেন কাটলেটের দাম পনেরো টাকা। স্বাভাবিকভাবেই, অন্য কোথাও কিছু কম করতে হয়। কিছু বিকল্প যুক্ত না করে চলে না। তাতে স্বাদের অব্যর্থ হানি হয়। তা হোক, মধ্যবিত্ত দোকানে বাজারে ভাল জিনিসের দাম ইচ্ছামতো বাড়ানো যায় না। বিকল্প বেসন, ডাল অথবা পাউরুটি মেশালে মুরগির কাটলেটের স্বাদ কিন্তু ফিরিয়ে আনা যায় না।

ইতিমধ্যে মুরগি সাধারণ বাড়িতে প্রবেশ করেছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেটাই বিশিষ্ট পরবির্তন। তা ছাড়া এখন মুরগি ছাগ-মাংসের চেয়ে সস্তা। মুরগির অস্পৃশ্যতা ঘোচার সেও একটা কারণ।

তবু আমার মতো মানুষেরা সেদিনের চাচার ফাউল কাটলেটের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করে। বড় বিশিষ্ট ছিল সে কাটলেট। প্রথমত আকারে সম্পূর্ণ গোলাকার হত চাচার ফাউল কাটলেট। তার ওপর সেই কাটলেট পর্যন্ত পৌঁছবার পথ সহজ ছিল না। নির্দয় চাচা কী কারণে এমন নিয়ম করেছিলেন জানি না, চাচার হোটেলে একখণ্ড কাটলেট বিক্রি হত না। একসঙ্গে তিনখণ্ড কাটলেট কিনতে হত। যে বালক চার আনা সংগ্রহ করেছে বিশেষ অধ্যবসায়ের পর, তার পক্ষে বারো আনা জোগাড় করা 'অলস কুসুমবনে স্বপন চয়নের' সমান। কে না জানে দুর্লভ বস্তুর আকর্ষণ দুর্বার হয়।

ষাট-সত্তর বছর আগে, এত মূল্যবান রেস্টুর‍্যান্ট ছিল না, যেমন আজ হয়েছে। সেখানে আমাদের যাবার নিত্য সুযোগ মেলে না, তার জন্য দুঃখ নেই। রসভঙ্গ এবং আশাভঙ্গ হয় তখনই, যখন স্বাদ নিয়ে দেখি তাঁদের ভোজ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, সব বৈশিষ্ট্য বুঝি আটকে গিয়েছে সুদৃশ্য চেয়ার-টেবিলে, স্তিমিত আলোর আধা-অন্ধকারে, পরিচারকের পরিচ্ছন্ন চমকপ্রদ পোশাকে।

গত এক শতাব্দী ধরে যে প্রশস্তি এবং আদরে বিশিষ্ট হয়েছিল বিশেষ কোনও ভোজ্যের জন্য বিশেষ দোকান, এখন শতাব্দী শেষে সেই ধারাটাই বর্জিত, বিস্মৃত। কে না শুনেছে চাচার ফাউল কাটলেট, সাবিরের রেজালা, রয়্যালের চাঁপ, দিলখুসার ডেভিল ও মটন কাটলেট অথবা হাজরা রেস্টুর‍্যান্টের ফিশ রোল বা নিজামের কাটি রোল—তাদের খ্যাতি অন্তর্হিত, সে স্থানও কেউ পূরণ করতে পারেনি। ভয় হয়, এই শতাব্দীতেও সব দোকানের পরিচয় হবে তার মূল্যতালিকা থেকে, বিশিষ্ট কোনও পদের জন্য তার দিকে কেউ তাকাবে না।

একশো বছরে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ-ভালবাসা নানাভাবে বদলে গিয়েছে। আজ বাঙালির অনেক পদে ধনেপাতা যোগ করাবার প্রকরণ পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না। নিজের কথা বলি, চল্লিশের দশকে কাশীতে পড়তে গিয়েছিলাম। হস্টেলে থাকতাম। মেসের খাবার আদৌ পছন্দ হয় না। ছুটিতে মার কাছে এলে অনুযোগ করেছি, কাশীর রান্না মোটেই ভাল নয়। খেতে রুচি হয় না, সব পদেই এক ধরনের অপ্রিয় গন্ধ। মা প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন খারাপ তেলের জন্য এমন হয়েছে। পরে সহজেই ধরে ফেললেন, এর কারণ ধনেপাতা। উত্তর ভারতে সব পদে ধনেপাতা, ধনেপাতার মশলা অথবা ধনেপাতার সম্বুরা দেওয়ার চল। তার গন্ধে পশ্চিমের মানুষেরা খুশি হয়, আর অপরিচিত ওই গন্ধ আমার কটু লাগে। বাংলার যে অংশে আমরা বাস করেছি, সেখানে ধনেপাতা অচল।

পরে জেনেছি, বাংলার পূর্বাঞ্চলে অত ব্যাপক না হলেও ধনেপাতার চল আছে। এটা তাদের নতুন লব্ধ রুচি অথবা সাবেকি প্রচলন জানি না। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এখন আর ধনেপাতার ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অপছন্দের নয়। বস্তুত কোনও কোনও

পদে ধনেপাতার গন্ধ এখন আমাকেও আনন্দ দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেখেছি ভিয়েনের ঠাকুরেরা, (তখনও ক্যাটারারদের আবির্ভাব হয়নি) ফর্দের মধ্যে ধনেপাতা লেখাতেন। মাংসের চপেও ধনেপাতা দেওয়া হত। এখন তো আমরা মুড়ির জ্ঞাতি ভেলপুরিতে ধনেপাতার কুচো আদর করে খাই।

শস্যক্ষেত্রে আগাছা বাড়লে বুদ্ধিমান চাষি তৎক্ষণাৎ উন্মূলন করে। আমাদের বাঙালিদের খাদ্যপ্রকরণে অমনই একটি আগাছা এখন স্থায়ী আসন নিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত উদ্ভিদটি অজ্ঞাত পরিচয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অল্প মানুষেরই পরিচয় ছিল মেক্সিকো থেকে পশ্চিম দেশ হয়ে সদ্য-আগত টম্যাটো নামক সবজিটির সঙ্গে। আমাদের ছোটবেলায় টম্যাটোকে বলা হত বিলিতি বেগুন। চাটনি ছাড়া টকমিষ্টি এই আনাজটির কোনও ব্যবহার ছিল না।

ভাইরাস যেমন অদৃশ্য অগোচরে মানুষের দেহ আক্রমণ করে, টম্যাটোও তেমনি ক্রমশ আমাদের রন্ধনধারার ধর্মনাশ করছে। চাটনি থেকে টম্যাটোর প্রবেশ হয়েছিল সালাদে। ক্রমে এমন হল টম্যাটো ছাড়া চাটনি ভাবাই যায় না। ওই পর্যন্ত চলছিল। ভাল ছিল। ধীরে ধীরে নিশ্চিত পায়ে টম্যাটো আমাদের পাকশালায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এখন সব ব্যঞ্জনে টম্যাটো মশলার মতো ব্যবহার হয়। না দিলে রান্নাই হয় না। হালুইকর বামুন বলুন, কিংবা ক্যাটারারের পাচক, সব ব্যঞ্জনকে টম্যাটোযুক্ত করে সাম্যবাদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে, তাই সব ব্যঞ্জনের এক স্বাদ।

এ লাইনে অবশ্য সর্বপ্রথম পঞ্জাবিরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন রান্নায় যথেষ্ট পরিমাণ পিঁয়াজ আউর টমাটর ব্যবহার করলেই ব্যঞ্জন ভাল হয়।

বাংলা রান্নায় টম্যাটোর মতো আরও একটি, ক্রনিক জাতীয় রোগ উপস্থিত হয়েছে। বাংলা রান্নার বিশেষত্বই ছিল বিভিন্ন ব্যঞ্জনের ভিন্ন স্বাদ গন্ধ। এখন যথেষ্ট গুড়-চিনির প্রাবল্যে ক্যাটারারেরা ডাল-সুক্তো সব তরকারিকে মিষ্টিপ্রধান করে ফেলেছেন। যুবক-যুবতীর দল, মা-মাসির থেকে বিচ্যুত, নতুন সংসার পত্তন করে ব্যঞ্জনে চিনিযুক্ত করেই স্বাদিষ্ঠ করবার প্রবণতা দেখাচ্ছেন।

এ যুগের সব খারাপ, অথবা বিগত যুগের চেয়ে নিকৃষ্ট, এমন কথা বলা অন্যায় হবে। বাংলা ভোজ্যতালিকা কত বিস্তৃত হয়েছে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। নাম শুনে সব বোঝা যায় না—ফিশ ফ্রাই, ফিশ মুনিয়ের, বাটার (ব্যাটার) ফিশ, ফিশ ওর্লি, আরও কত কী—এ সবই বিপ্রদাস মুখুজ্যে মশায়ের বই-এর দুই মলাটে বন্দি ছিল। আর এখন উচ্চারণ যেমন হোক, নানা পদ সৃষ্টির প্রয়াস তো চলেছে। আরও কত আছে, তন্দুরি ফিশ, চিলি ফিশ, মাছের পাতুরি। নাইবা হল সাবেকি তপসে মাছ ভাজা।

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে দেখতে পাচ্ছি, আমরা ভালমন্দ মিশিয়ে বদলেছি। পাড়ার ছোট রেস্টুর‍্যান্ট থেকে বিকালে চপ-কাটলেট না আনালেও চলে—বাড়িতেই তো মাঝে মাঝে হয়।

নতুন আর একটি পদে এ যুগের বাঙালির প্রণয় দেখা যাচ্ছে। নুডল্‌। প্রধানত চিনা এবং ইটালিয়ান ভোজ্যের অন্তর্গত, বহুকাল থেকে কলকাতার চিনা ভোজনশালার অন্যতম পদ ছিল। পাক করা সহজ, সময় লাগে অল্প। এ যুগের কর্মবিমুখ বাঙালি কি

সময় বাঁচানোর জন্য নুডলের আসক্ত হয়েছে?

ভোজ্যের কোনও ধ্রুবত্ব নেই। যার যা ভাল লাগে, যখন ভাল লাগে সেই ভোজ্য তখনই তার কাছে পরমরমণীয়। এ নিয়ে তর্ক করা যায়, কোনও মীমাংসায় পৌঁছোন যায় না।

শুধু রুচিভেদের জন্যই যে আমাদের স্বাদ-বদল হচ্ছে, তা নয়। আমরা রুচি বদলাতে বাধ্যও হচ্ছি। সময়, সুবিধা, পারিপার্শ্বিক, প্রবণতা ইত্যাদি আমাদের রুচিকে রূপ দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এককথায় এই বাক্য বলবেন। উপর্যুক্ত কোনও কারণই যে আমাদের লুচির প্রতি অবহেলার মূল হতে পারে, সেটা কারও বিশ্বাস হবে না। লুচি তো বাঙালি সভ্যতার নির্যাস, তার ঐতিহ্যের সারাৎসার। তবু আজকাল সেই লুচি সচরাচর পাওয়া যায় না কেন—যা আপনাকে শরৎকালের লঘু মেঘের কথা মনে করিয়ে দেবে, যা আপনার ভোজনপাত্রে বসন্তকালের শিমুল তুলোর মতো ভেসে আসবে, তার স্বপ্নের সৌরভ আপনাকে অন্য কোনও সুখের পারাবারে নিয়ে যাবে? লুচি ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। একটা কারণ অবশ্য আমার জানা। লুচি প্রস্তুতের প্রত্যেকটি ধাপই সঠিক হওয়া দরকার, কোনও ধাপে সামান্য পদস্খলন চলবে না। দোকানে-বাজারে লুচি পাওয়া যায় কম, বিকল্পে সবাই পুরি হাজির করে। বলুন তো, বানরের পুচ্ছ কেটে দিলে সে কি মানুষ হয়?

চা-এর মতো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আর একটি অপরিচিত বস্তু আমাদের ভোজনপাত্রে অনধিকার প্রবেশ করে এখন স্থায়ী আসন নিয়েছে। রুটি। এমন নয় যে রুটি আমরা আদৌ জানতাম না। বিপ্রদাস মুখুজ্যে এবং প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁদের পুস্তকে রুটি তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি শহরাঞ্চলে মানুষের শরীর একটু কষ্ট দিলে, ভাতের বদলে রুটি ভোজনের নিদান ছিল। বাঙালি বিরক্তির সঙ্গেই একবেলা রুটি খেতে শুরু করে রেশনিং প্রথা চালু হবার পর। শহরাঞ্চলে এখন অনেক বাড়িতেই রাত্রে রুটি এবং দিনে ভাতের আয়োজন হয়।

রুটির কথা লিখতে গিয়ে বাঙালির রুটি ভোজনের প্রক্রিয়াটি মনে পড়ল। লক্ষ করে থাকবেন উত্তর ভারতীয়রা সাধারণত দুবেলাই রুটি খান। তাঁদের মধ্যে অনেকে এখন রুটি সহকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার পর শেষ পাতে একমুঠো ভাত পছন্দ করেন। আগে বাঙালি ধনী ব্যক্তিদের যেমন ছিল, ভাত দিয়ে শুরু করে শেষ পাতে দু-একটা লুচি মিষ্টান্ন সহযোগে ভোজন।

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, বাড়িতে গরম রুটি খাবার প্রচলন ছিল না। সবাই খেতে বসলে একের পর এক তপ্ত রুটি তাওয়া থেকে ভোজনপাত্রে পরিবেশন হবে তেমন কুশলতা আমাদের ছিল না। গোছা গোছা রুটি আগেই তৈরি করে চাপা দিয়ে রাখা হত, তারপর সবাই খেতে বসলে, সেটা এক-দুঘণ্টা পরেও হতে পারে, ঠাণ্ডা রুটি পরিবেশন হত। আরও একটা বিচিত্র প্রথা তখন দেখেছি। একজন রুটি সেঁকছেন, আর একজন একটা ছোট বাটির পেছনে জল লাগিয়ে তাওয়া থেকে নামামাত্র সেই বাটি তার ওপর বুলিয়ে দিতেন। তারপর দ্রুত রুটির গাদার ওপর রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে দিতেন।

বাঙালির কাছে তপ্ত রুটি অনাদরের ছিল। আমরা ঠাণ্ডা, নরম রুটিই পছন্দ করেছি।

বাঙালিদের পানদোষ ছিল বা আছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। চিরকালই মদ্যপানের সঙ্গে বাঙালিদের মিলন-বিচ্ছেদের সম্পর্ক। এমন দিন ছিল পাঁচ-ছ'শো বছর আগে যখন বাংলার তৈরি মদের আদর ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে। বাঙালিরা তখনও মদ্যাসক্ত না হলেও কেউ কেউ মদ্যপান করতেন। সমাজে বারণও ছিল। শাস্ত্রের অনুশাসন চিরদিন মদ্যপানের বিরুদ্ধে। 'বাঙালির ইতিহাস'-এ এই কথা লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়। ডিরোজিওর আমলে তাঁর ভক্ত-অনুগামীরা মদ্যপান করে সমাজের নিয়ম ও নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অতুল সুর মশাই 'সমাচার দর্পণ' থেকে একটি খবর উদ্ধার করে বলেছেন, বাবুরা মদ্যপানের পক্ষে নানা সাফাই এবং অজুহাত তৈরি করতেন। অনুগত পণ্ডিতের একটি ঘটনা সেখানে বিবৃত হয়েছে। পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল, মদ খেলে কি পাপ হয়? পণ্ডিত উত্তর দিলেন, মিথ্যা কথা, যে এ কথা বলে তারই পাপ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধনবানেরা মদ্যপানে বিরত থাকতেন না। উৎসবে ব্যসনে কিঞ্চিদধিক সুরাপানের রেওয়াজ ও বাড়াবাড়ির খবরও আছে। ছিল। অতুল সুর মশাই লিখেছেন, বাগবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের কালীপূজা ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাড়ির কর্তা, গিন্নি, বউ, ছেলেপিলে, এমনকী ঝি-চাকর পর্যন্ত সেদিন মদ খেয়ে একেবারে চুর হয়ে থাকত।

উপরোক্ত ঘটনা উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের।

সুরাপান সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীতে আমাদের ভাবনার কী পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় আমাদের আজকের আচরণে। প্রসঙ্গত বলি, বাঙ্গালোর শহরে চল্লিশ-পঞ্চাশটি পাব অর্থাৎ পানশালা হয়েছে প্রধানত তরুণ-তরুণীদের জন্য। তাদের প্রবল এবং সরব উপস্থিতি আমাকে চকিত করেছিল। কয়েকটি পাবের অলঙ্করণ ও শোভা দেখে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কলকাতাও আমাদের মদ্য সম্বন্ধে মুক্ত মন ও আধুনিকতার পরিচয় দেয়। অত সৌষ্ঠবের অতগুলি পাব এখানে না থাকার একমাত্র কারণ আমরা বাঙ্গালোর, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো সচ্ছল নই, নইলে আমরাও বাসনায় পিছিয়ে নেই।

এই ঐতিহ্যে পালিত বাঙালি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অল্পস্বল্প মদ্যপান ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখতেন। কিন্তু শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছর মদ্যপান বিলিতি কায়দায় সভ্য হবার উপচার বলে গণ্য হল। এখন মদ্যপানে আসক্তি না থাকলেও ফ্যাশন এবং স্টাইলের পর্যায়ে উঠে এসেছে। সন্ধ্যা সমাগমে কারও বাড়িতে গেলে, এখন আর চা আসে না অতিথি আপ্যায়নে, সম্ভব হলে তীব্রতর পানীয়ের আয়োজন হয়। মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালির কথা বলছি। সেই গ্রুপের ওপরে এবং নীচতলায় মদ্য সম্বন্ধে কোনও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ নেই।

পানীয়ের কথায় অব্যর্থভাবে চা এসে পড়ল। সারা ভারতবর্ষে, দক্ষিণ ভারত বাদ দিয়ে, চা এখন জাতীয় পানীয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। বাঙালি সমাজে চা-এর সর্বজনীন আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বিংশ শতাব্দীর দান।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চা-এর প্রবেশ হল বাংলায়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,

ওই শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে তিনি প্রথম চা দেখেছিলেন। তাঁর অসুস্থ কাকিমাকে ঔষধের মতো এক পাত্র চা খাওয়ানো হয়েছিল। আমাদের বাল্যকালেও, অর্থাৎ ত্রিশের দশকে শিশুদের চা-পান নিষিদ্ধ ছিল। তারও পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চা-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, 'চা-পান না বিষপান', দীর্ঘকাল চলেছিল। কোনও ফল হল না, চা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো আমাদের সবার বশ্যতা আদায় করে নিয়েছে।

বাঙালির পানাভ্যাস প্রসঙ্গে প্যারাডাইস প্যারাগন এবং পরে কপিলাশ্রমের কথা না লিখে পারি না। প্রথম দুটি নির্বাণলাভ করেছে। সেখানে অন্য নামে সেই ঘরানার একটি সরবতের দোকান এখনও আছে। কপিলাশ্রমের পুরনো প্র্যাকটিস এখন আর নেই। এক, জল নিয়ে ভয় কোনও কোনও প্রাণে, আর দ্বিতীয়, আজকালকার ছেলেমেয়েরা এখন সরবত অপেক্ষা বোতলের পানীয় অধিক পছন্দ করে। যদিও তার দাম বেশি। আগেও যে বোতলের পানীয় ছিল না, তা নয়। আমাদের কলেজজীবনে বায়রনের আইসক্রিম সোডা এবং রোজ এন্ড থিসলের ভিমটো আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করত। আজকের কোকাকোলা ও পেপসির দাপটে তারা আমাদের স্মৃতি থেকেও চলে যেতে বসেছে।

ভোজনের পরেই মদ্যপানে চলে এসেছি। মাঝে মিষ্টান্নের কথা বাদ গিয়েছে। বাঙালির যে মিষ্টান্নগুলি সাধারণত দোকান থেকে আহৃত হয় তার সূত্রপাত ভারতচন্দ্রেরও আগে। ক্রমশ মিষ্টান্নর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। উনিশ শতকের ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত মিষ্টান্নের এত বৈচিত্র্য ছিল না। তখন ক্ষীর ময়দার অতিরিক্ত ছানার মিষ্টান্ন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেই সময় সম্বন্ধে লিখছেন, সন্দেশ দু-তিন প্রকারের বেশি ছিল না। প্রধানত মাখা সন্দেশই পাওয়া যেত।

সত্তরের দশকে নবীনচন্দ্রের রসগোল্লা উদ্ভাবন বাঙালির মিষ্টিকে অন্য স্তরে তুলে দিয়েছিল। মোটামুটি স্বীকৃত হয় ভোলা ময়রার নাত জামাই নবীনচন্দ্র রসগোল্লা উদ্ভাবন করেন। আজকে সন্দেশের রকমভেদ, স্বাদে, গন্ধে, আকৃতিতে বাঙালির মিষ্টান্ন ভারতবর্ষের সব প্রদেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবং আরও আশ্চর্য, সন্দেশের তালিকায় নিত্যনতুন সংযোজন হচ্ছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু পেনেটির গুপো সন্দেশের নাম করেছেন, আজ আমরা জনাই-এর মনোহরা, চন্দননগরের কাঁচাগোল্লা আরও কত সন্দেশ হাজির করেছি। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে বাঙালির সৃজনশক্তি সবাইকে অবাক করে। ভাবি আমাদের সমস্ত কল্পনা, তাবৎ সৃজনশক্তি বুঝি মিষ্টান্ন নির্মাণেই পরিপূর্ণ ব্যয় হয়ে গিয়েছে, তার কণামাত্রও আমাদের জীবনের অন্য ক্ষেত্রে নেই।

একদিকে যেমন দোকানের মিষ্টান্নের ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে গৃহস্থের বাড়ির পিঠা-পায়স নির্বংশ হতে চলেছে। কারণ নির্দেশের প্রয়োজন নেই। ফাস্টফুডের প্লাবনে (রসগোল্লা, সন্দেশের মতো ফাস্টফুড কোথায় পাওয়া যাবে) বাড়ির পিঠা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কে করবে অজস্র সময় ব্যয় করে পাটিসাপটা, মালপোওয়া, পেরেকি, গোকুল পিঠে—একদা যাদের নামের তালিকা বর্তমান সন্দেশের তালিকার চেয়ে ছোট ছিল না। পায়সের চিহ্ন তবু দেখতে পাই—প্রধানত চালের পায়স, কদাচ সিমাই। কোথায় গেল আতার পায়স, লিচুর পায়স, কমলালেবুর পায়স—এই সব?

মিষ্টান্নের জগতে কিছু লোকসানও হয়েছে। বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত ঝকঝকে তিজেল

মাথায় নিয়ে নিয়মিত আসত ফিরিওয়ালারা। তিজেলে প্রধানত তিলকুটো ও চন্দ্রপুলি থাকত। আমাদের বালক বয়সে তাদের অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকতাম সকালবেলা। তারা নিঃশেষে বিদায় নিয়েছে। এখন কোনও দোকানে কখনও সেই মিষ্টান্ন দুটির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই স্বাদ, গন্ধ আর নেই। আজ ভেজালের ভিড়ে আমাদের বাল্যের সুখকর মিষ্টি দুটি হারিয়ে গিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে আর একটি জিনিস আমার নজরে এসেছে। বাঙালির পান খাওয়া ও পানসাজার বিরাট পরিবর্তন।

ভোজনের পরে একটি সুগন্ধি পান মুখে দেওয়া বাঙালির সুখের চূড়ান্ত ছিল। মা-জেঠিমা-ঠাকুমারা জলখাবারের পর মস্ত আয়েস করে পান সাজতে বসতেন। কেয়া খয়ের, দুরকমের এলাচ, শুকনো কমলালেবুর খোসা, কর্পূর ইত্যাদি সহযোগে পান সাজা হত। পানই কত প্রকারের ছিল। ঈষৎ ঝাল বাংলা পান, মিঠাপান—সুগন্ধ এবং স্বাদে স্বতন্ত্র এবং ছাচি পানে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুগন্ধ ও স্বাদ। তারপর এল মঘই ও মহোবা পান। সাজার ঘটাও ছিল খুব। ডাবরে পানের পাতা ভিজছে, বাটায় বিভিন্ন অনুপান আর পানের ডিবে, সম্ভব হলে রূপার। পান খাওয়া হয়তো ভাল নয়, হয়তো পানের কোনও অপরিহার্য ভেষজগুণ নেই, তবু পানের জন্য মন কেমন করে। দোকানের মিষ্টি মধু মেশানো দু টাকা-ছ টাকার পান পুরনো কালের স্বাদ ফিরিয়ে আনে না।

আর বাকি রইল কী? এবার জল পান করে উঠে পড়া যেতে পারে। এখন মিনারেল ওয়াটার খাবার সময় চলেছে। তারা সবাই কতখানি শুদ্ধ কেউ বলতে পারবে না। আমাদের বাল্যে পানীয় জলে সমান্য কর্পূর মেশানো হত, আর কাজের বাড়িতে মেশানো হত কেওড়ার জল। মুখে পান দেবার আগে সে জলও খুব ভাল লাগত। কতটা স্বাস্থ্যকর ছিল, বলতে পারব না।

ভাবি, অত জেনে কী লাভ?

পানশালায় আগুন

কোনও রেস্টুর‍্যান্টে বসার পর খাবারের তালিকা নিয়ে ওয়েটরের আসতেই পাঁচ মিনিট লেগে যায়। একটু ভাল ভোজনশালা হলে ওয়েটর নিজে অর্ডার নেয় না, সে অর্ডার নেবার লোককে ডেকে দেয়। সেই ব্যক্তির সুনজরের জন্য আরও পাঁচ থেকে দশ মিনিট। খাবার পৌঁছতে তারপরও বিশ পঁচিশ মিনিট আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আছে। তবু তো হিসাবে ধরিনি, প্রমাণ সাইজের খাদ্য তালিকার অরণ্য থেকে আপনার নির্বাচিত পদটিকে উদ্ধার করতে আপনার কত সময় লেগেছিল।

যাদের হাতে সময় এবং অর্থ কোনওটাই পর্যাপ্ত নেই তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল, ফাস্ট ফুড বা চট্‌জলদি খানার দোকান। অনেক বছর আগে লন্ডন শহরের বিভিন্ন চৌরাস্তায় মোড়ে মোড়ে একটি পরিচিত নামের ভোজনশালা দেখতে পাওয়া যেত। তাদের নাম ছিল লায়ন্স কর্নার হাউস। সেখানে ঈষৎ কম দামে খুব তাড়াতাড়ি খাবার পাওয়া যেত, যার অন্যতম ছিল 'ফিশ এন্ড চিপস'।

বছর কুড়ি আগে লন্ডন পৌঁছে দেখি লায়ন্স কর্নার হাউসেরা নিরুদ্দেশ। চৌরাস্তার মাথায় অত ভাল জায়গা পায়নি বটে, কিন্তু আর এক জাতের ভোজনশালা লন্ডনের সর্বত্র এখন ছড়িয়ে গিয়েছে। তারাও ফাস্ট ফুড জায়েন্ট। সেখানে বসবার আয়োজন সামান্য, অনেক ক্ষেত্রে নেই-ই, 'টেক এওয়ে' বা খাবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থাটাই আসল। খাবারের জন্য অপেক্ষার সময় সামান্য। বলা যায় তাৎক্ষণিক পরিবেশন। লায়ন্স কর্নার হাউসের পলাতক অবিস্মরণীয় মাছ ভাজাও যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি কিছু চিনা পদও পাবেন। আর এক জাতের খাবার দোকান দেখলাম, তারা বিক্রি করে দোনা কবাব, আমেরিকানরা বলে জাইবো কবাব। ফুট দুই উঁচু সিলিন্ডারের আকারে মাংসের তাল—খাড়া লম্বা

হিটারের সামনে মন্থরে ঘুরছে।

হিটারের তাপে মাংস থেকে সেই গলিত চর্বি আবার মাংসের তালের ওপর ঢেলে দিচ্ছে। ভাজা এবং ঝলসানোর মিশ্রণে নতুন স্বাদের সৃষ্টি হয়। খদ্দের উপস্থিত হলে ধারালো ছুরি দিয়ে সেই ঈষৎ ভাজা, সুপক্ক মাংস অত্যন্ত পাতলা পাতলা স্লাইস করে কিছু সালাড ও ড্রিসিং সহযোগে একটা ফুলো পাউরুটি চিরে তার মাঝখানে ভরে দিলে তৈরি হল দোনা কবাব। কোথাকার এবং কীসের মাংস জানি না, কত ঝড়তিপড়তি মিশিয়ে ওই সিলিন্ডার তৈরি হয়েছে জেনে লাভ কী? আমার দোনা কবাব খেতে বেশ ভাল লাগে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাউন্ড দেড়েক খরচায় একবেলার ভোজন তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত।

ইতিমধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার ম্যাগডোনাল্ড, উইম্পি, বার্গার কিং ইত্যাদিরা দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য দোকান খুলে ফাস্ট ফুডকে পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। খাদ্যতালিকা দীর্ঘ নয়, সব দোকানে রঙিন বড় মাপের আলো জ্বলা ছবি আছে সব পদের, পাশে লেখা আছে দাম। আপনার নির্বাচিত পদের দাম ক্যাশিয়ারের কাছে জমা করে দিয়ে দু চার মিনিট দাঁড়ালেই অভিলষিত পদার্থটি পাবেন। নীচে যাবার হলে বাক্সবন্দি, বসে খাবার হলে কাগজের প্লেটে। সামনেই প্লাস্টিকের গোছাগোছা ছুরি কাঁটা, মাস্টার্ড ও টমাটো কেচাপের শিশি। আহারের পর কাগজের প্লেট প্লাস্টিকের ছুরিকাঁটা দোকানের ভেতর আবর্জনার ড্রামে ফেলে দিন। বয় বেয়ারা নেই, টিপস দেওয়া নিয়ে ভাবতে হয় না।

সাহেবদের কিছু দেখলে আমাদের হামলে পড়ার স্বভাব। নইলে শালপাতার ঠোঙাতে কচুরি তরকারির ভূরিভোজ করে, রাস্তার ধারে যত্রতত্র পাতাটা ফেলে দিয়ে আমরা কি আনন্দ পাইনি? করি না অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়? ফাস্ট ফুড? মুড়ি তেলেভাজার চাইতে দ্রুতগতি আর কোন খাবার পাওয়া যায়? কোন দেশে? শালপাতার বা কাগজের ঠোঙাও যথেষ্ট ছিল বাড়িতে আনবার জন্য। কখনও কার্ডবোর্ডের কি প্লাস্টিকের বাক্সের দরকার হয়নি। অথবা মনে করুন, গরম সিঙাড়া, কিংবা ঘুঘনি। উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র মিঠাই-এর দোকানে তপ্ত দুধ ও ততোধিক তপ্ত জিলিপি কত শীতের সকালকে স্মৃতিতে মধুময় করে রেখেছে।

এদের কাউকেই আমরা ফাস্ট ফুড বলিনি। আসলে সাহেবরা ফাস্ট ফুড বলতে প্রকারান্তরে ডিনার আর লাঞ্চের খাদ্য বোঝান। টেনেটুনে ব্রেকফাস্টকেও সে দলে আনা যায়। ওই তিনকেতা ভোজনের অতিরিক্ত আমাদের টিফিন এবং জলখাবারের মহিমা সদ্যসভ্য সাহেবদের জানবার কথা নয়।

কলকাতায় এ যুগের চট্‌জলদি খানার শুরু হয়েছে ঠেলাগাড়ি বা অস্থায়ী কিয়স্কে। পরটা রোল দিয়ে পত্তন হয়েছে, এখন যুক্ত হয়েছে নুডল্‌। অনেকে অবশ্য পাওভাজি পছন্দ করেন। ঘুঘনির সঙ্গে দু চার খণ্ড পাউরুটি যোগ করলে তাও ফাস্ট ফুড।

আমরা ফাস্ট ফুডে মুগ্ধ হয়ছি। এখন, এতদিনে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রোলের দোকান দেখে। আমাদের স্মৃতিভ্রংশের বহরটা দেখুন একবার। এই শহরেই পরটা রোলের গোড়াপত্তন হয়েছিল, আজ নয়, ষাট-সত্তর বছর আগে। নিজামের কবাবপরটা।

নিজাম ওই একটি পদেই আমাদের সম্মোহন করেছিল। নিজাম এখনও আছে, আমাদের সম্মোহন আজও কাটেনি। স্বীকার করি, নিজামের খবর শুধু গুণীজনেরাই জানেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা তো সামান্য নয়। ষাট বছর পরে ফাস্ট ফুডকে আবার নতুন করে আমরা চিনছি ওই ভ্রাম্যমাণ, অস্থায়ী রোল সেন্টারের দৌলতে, এমনই আমাদের ভাগ্য!

চট্‌জলদি খানা পরিবেশনে লালদিঘির চৌহদ্দিতে যে সব কলাবিৎ আছেন, তাঁরাও সামান্য নন। কত রকমের আহার্য পাওয়া যায়, ফ্রুট চাট থেকে দহিকচৌরি পর্যন্ত। ঠিক টেক এওয়ের বা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য নেই। আজকাল সর্বত্র দোসা ইডলিরও রবরবা হয়েছে। দোসা তাৎক্ষণিক ভোজনের জন্য অপূর্ব, কিন্তু বাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তখন দোসার স্বাদ এবং যে কাগজে দোসা মোড়া হয়েছিল তার স্বাদে বিশেষ তারতম্য থাকে না। চল্লিশ দশকে একমাত্র রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কোমলা বিলাস ছাড়া আর কোথাও দোসা পাওয়া যেত না। বাঙালিরা নামই শোনেনি, শুনলেও অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে নিত। এখন দেখুন শ্যামবাজার, কি দর্জিপাড়া, কি কাঁসারিটোলা, কোথায় দোসা নেই? কোনদিন দেখব সিমলের গিরীশ নকুড় দোসা বানাচ্ছে। এমন ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে আছি।

পাঁচশো বছর আগে দিল্লিতে নিরুলা যখন চট্‌জলদি খানার প্রবর্তন করে, তখন তার অভিনবত্ব সবাইকে চমকে দিয়েছিল। পরে উইম্পি, পিৎজাহাট হয়েছে দিল্লিতে। যে শ্রেষ্ঠীগৃহিণীরা রটিসেরি, কাসামেদিচিন অথবা বালি হাই-এর ভোজনকক্ষে অলস, মন্থর দ্বিপ্রহরে এনপোর্টেড পাতে দ্য ফোয়া গ্রা কিংবা অজানা সমুদ্রের শামুকের স্বাদ গ্রহণ করেন, তাঁরাও নতুনত্বের আকর্ষণে ওই সব নিরুলা উইম্পির মতো টেক এওয়ের দোকানেও ভিড় করে আসছেন। মূল্যবান মণিরত্নের কণ্ঠহার দুলিয়ে দু হাতের মহার্ঘ্য কঙ্কণ বাজিয়ে তাঁরা যখন সরু টেবিলের ওপর কাগজের প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজন করেন, তখন তাই দেখতেও দর্শক জমে যায়।

অথচ এঁরা সবাই দিল্লির অলিগলি চেনেন। যখন যে কাজ বা যে স্থান আভিজাত্যের টীকা পায়, সেখানে তখন এঁদের যাওয়া চাই-ই। এঁরা দেখেছেন দরিয়াগঞ্জের মতিমহলে পঞ্চাশ বছর আগে ফাস্ট ফুডের প্রবর্তন হয়েছিল। দরিয়াগঞ্জের শ দেড়েক অতিথি বসতে পারেন, এমন প্রশস্ত স্থান। সব সময় প্রবেশপথে জন দুই কর্মী দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনা করবার জন্য। আপনি পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে টেবিলের কাছে পৌঁছে দেবে একজন। চেয়ার টেনে বসবার আগেই আপনার টেবিলে আচার ও চাটনি উপস্থিত হবে। খাদ্যতালিকা অকিঞ্চিৎকর, গুণীজনেরা তাকিয়ে দেখেন না, আগে ছিলও না। তালিকা দেখাও বিশ সেকেন্ডের কাজ। আপনি আদেশ করলেন চিকেন পকৌড়া, এক সময় তিতির এবং বকের পাওয়া যেত, একটু দীর্ঘশ্বাস পড়ল আপনার, চাইলেন রোগনযোশ অথবা দহিওলা মটন এবং নান। ইতিমধ্যে গ্রীন স্যালাড এসে গিয়েছে, আপনি একটা গাজর বা শশার ফালি চাটনিতে নিষিক্ত করে মুখে তুলেছেন সবে। হুসহুসে গরম চিকেন পকৌড়া এসে পৌঁছল। ভাল করে তার স্বাদ নেবার পূর্বেই দহিওলা মটন এবং নান এসে গিয়েছে। যদি বাড়িতে নিয়ে আসতে চাইতেন, কাগজের ঠোঙাতে চিকেন পকৌড়া এবং মাটির ভাঁড়ে দহিওলা দিতেও মতিমহলের অধিক সময়

লাগত না। সেই একই দোকানে যদি রসিয়ে রসিয়ে আহার করতে চাইতেন, সময়ের লাগাম ছেড়ে দিয়ে, তা হলে কানে আসত কাওয়ালি, ছোট একটা মঞ্চের ওপর জনচারেকের আসর, গাইয়ে বাজিয়ে মিলিয়ে। গাইয়ে তার দুর্দৈবের কথা শোনাচ্ছে, কেমন সে দুর্দৈব, কত করুণ? য্যায়সা কিসিনে আগ লাগা দী শরাবখানেমে।—যেন কেউ পানশালায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—এমন দুঃসময়।

আমার বিশ্বাস, সব খাবার ফাস্ট করা যায় না, সব খানা চট্‌জলদি উপযুক্ত নয়। ভোজনকে আহারের অতিরিক্ত কোনও স্তরে নিয়ে যেতে হলে পদগুলি উত্তমরূপে প্রস্তুত করা দরকার। তার জন্য নির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট উপকরণের প্রয়োজন। অনেক পদের উপকরণ হল সময়। সময় দিয়ে রন্ধন না করলে, সময় দিয়ে গ্রহণ না করলে সে পদ তার রসে আমাদের সিক্ত করবে না। যেমন অনেক আহার্যের উপকরণ সঙ্গী। একা বসে কখনও সুইস ফণ্ডু খাওয়া যায়?

ফাস্ট ফুডের অন্বেষণে এই রহস্যময় সত্যটা যেন ভুলে না যাই।

থুকপা-মোমো

আমাদের এই দুর্মূল্যের পরিবেশে এখনও দু-একটি সুলভ সুখাদ্য-শালা থেকে গিয়েছে। শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এবং বিধান সরণি বেষ্টিত বাড়ির নাম লেখা আছে রাউণ্ড বিল্ডিং বা গোলবাড়ি। সেই বাড়ির সামনের অংশে পঞ্জাবি হোটেল। আসলে রেস্টুর‍্যান্ট, ভোজনশালা। ভেতরে স্থানাভাব, সাত-আটজন বসতে পারে। কিন্তু রসিকেরা সাধারণত এখান থেকে খাবার কিনে নিয়ে যান, ভোজনকক্ষে স্থানাভাব তাঁদের অসুবিধা ঘটায় না। খাদ্যতালিকা দীর্ঘ নয়। কিন্তু তা নিয়েও রসিকেরা ভাবেন না। বস্তুত, তাঁরা খাদ্যতালিকা তাকিয়েও দেখেন না। নির্ভুল তাঁদের আদেশ ঘোষণা করেন, কষা মাংস এবং পরটা। দুপুরের অনেক আগে থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওই দুটি পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় এখানে গুণীজনেরা সমবেত হন। স্বীকার করতেই হবে আমার অভিজ্ঞতার তিন দশকে কষা মাংসের স্বাদ অপরিবর্তিত আছে। একপাত্রে চার পাঁচ খণ্ড মাঝারি আকারের মাংস থাকে। একটু থকথকে ঝোল মাখানো। দাম ৩.৫০ টাকা। সম্ভবত অতি সাধারণ মশলার প্রস্তুত, ঘৃতের সঙ্গে একেবারেই দেখা সাক্ষাৎ নেই, অথচ কী স্বাদ কষা মাংসের এবং কী তার সুগন্ধ। শিল্পীর হাতের জাদুদণ্ডে এই সাধারণ ভোজ্যটি অতি মনোহর স্বাদ ও রূপ পেয়েছে। মাংস খুব নরম করা এখানে বিধি নয়। সেটাও যেন স্বাদকে আরও তীক্ষ্ণ করে। একটু তেল বেশি, ঝালও, কিন্তু আপনার ও সব দেখবার দরকার নেই। সব মিলিয়ে যে অপরূপ স্বাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাই মর্মে মর্মে অনুভব করুন। সঙ্গে পরটা নেওয়া প্রায় নিয়মের মতো। ময়দার ছোট গোল পরটা। এখানে ঘি তেলের স্পর্শ বড় কম। পরটা প্রায় শুকনো তাওয়াতে সেঁকে নেওয়া মনে হবে। একে ময়দার, তায় ময়ান নেই, তার ওপর ভাজার সময় স্নেহ পদার্থের সংসর্গ

হয়নি, কাজেই পরটা একটু জেদি, সহজে হার মানতে চায় না। বিশ্বাস করুন মাখা-মাখা কষা মাংস দিয়ে সেই পরটাও রসনাকে মুগ্ধ করে। হবেই তো, দুয়ের মধ্যে সুরের একাত্মতা আছে যে। পরটার দাম ২৫ পয়সা। খান তিনেক পরটার বেশি এক আসরে কাবু করা যায় না। তা হলে মোট কত পড়ল? ৪.২৫ টাকা?

আর একজন সুখাদ্য শিল্পীর কথা বলি। তাঁর মজলিশ দক্ষিণ কলকাতায়। বসত বাড়ির একটি ঘর নিয়ে। ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যেমন জটা বল্কলের অধিক সাংসারিক যন্ত্রণা বহন করেন না, ইনিও তেমনি। বোধ হয় দুটি টেবিল। ৬/৭টি চেয়ার। রাত্রে এই ঘরটিই শিল্পীর শোবার ঘর হয়। এখানেও অধিকাংশ গুণী এঁর সৃষ্টি টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে বাড়ি নিয়ে যান।

জায়গাটা শম্ভুনাথ হাসপাতালের পেছন দিকে। লী রোড থেকে একটি রাস্তা পেরিয়ে, তার ওপর। সাইনবোর্ড আছে কি না দেখতে পাইনি। খোলা দরজা, পর্দা ছিল অবশ্য, দেখে জিজ্ঞাসা করতে জানলাম সেটাই ভোজনশালা। এঁদের চেহারায় যেমন সন্ন্যাসীর ছাপ, খাদ্যতালিকাও তেমনি। দুটিমাত্র পদ পাওয়া যায়। মোমো এবং থুকপা। সবাই বলে দোকানটি তিব্বতি। হলফ করে বলতে পারব না। খাবারের নাম দুটি সবাই বলে, তিব্বতি। হতে পারে। থুকপা আসলে নুড্‌ল সুপ। তবে সুপও বলা যেতে পারে, নুড্‌লও বলা যায়। কারণ সুপের মতো তরল নয়। একটু ঝোল ঝোল তারল্যে এক রাশ নুড্‌ল। ইতস্তত ছোট ছোট মাংসের কুচি। সুসিদ্ধ এবং প্রায় ফুটন্ত অবস্থায় পরিবেশিত হয়। কষা মাংসের বিপরীত মেরুর। তেল মশলার ইশারা পর্যন্ত নেই। পিঁয়াজ বা রসুনের কলি কিছু কুচি করে মেশানো। অনাস্বাদিত একটা সুগন্ধ পাবেন।স্বাদও তৃপ্তি দেবে। ছোট একপাত্র যথেষ্ট হবে। ৩ টাকা। তিনজন গিয়ে থাকলে বড় পাত্র সুপ চাইবেন। ৬ টাকা।

অতঃপর মোমো আদেশ করতে হয়। মাংসের কচুরির বন্য রূপ বলতে পারেন। চিনা ওয়াং টাং বা পশ্চিমের ডামপ্লিঙের সগোত্র। মোমো আবার দু প্রকারের হয়। ভাজা এবং ভাপানো। আমার ভাজা মোমো পছন্দ। অনেকের পক্ষপাত ভাপানো মোমো। চিলি এবং সয়াসস যোগে ভালই লাগবে। তবু আমি ভাজা মোমোর পক্ষে। প্রায় মশলাবিহীন মাংসের নামমাত্র পুর এত সুস্বাদ কী করে হয় অনেকবার ভেবেছি কিন্তু অনুসন্ধান করিনি। সব রহস্যভেদ করে কী লাভ হবে। জীবনটাই যখন কড়া আলোর নীচে নগ্ন, থাকুক না একটা না জানা কিছু। এক পাত্র পাঁচটি মোমো—৩ টাকা। ৬ টাকায় তাহলে ভরপেট ভোজন হল। বেশি ক্ষুধার্ত হলে তাড়াতাড়ি যাবেন। মোমো বেশিক্ষণ পাওয়া যায় না। থুকপা অফুরন্ত, যখনই যান।
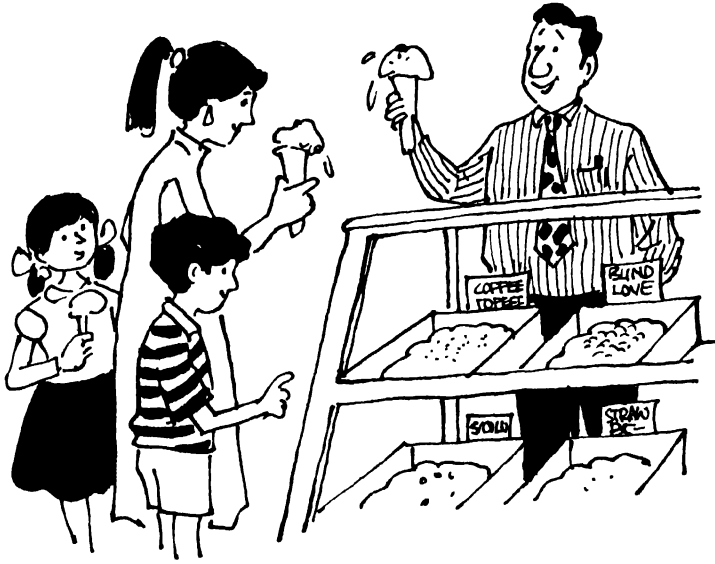
আইসক্রিম

আগে আইসক্রিম এমন দোকানে পাওয়া যেত না। ঠেলাগাড়িতে করে ফিরিওয়ালা আইসক্রিম নিয়ে আসত। তখন ছিল ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিম আর হ্যাপিবয়। তারা আমাদের কিশোরচিত্ত জাদু করে রেখেছিল। ভারত বিভাগের পর কোয়ালিটি কোম্পানির আবির্ভাব হল। অধিক উৎপাদনে পারদর্শী বিপণনে অভিজ্ঞ, বিতরণে দক্ষ কোয়ালিটির আগমনে নিষ্প্রভ হয়ে অচিরে অন্যান্য প্রতিযোগীরা বিদায় নিলেন। এখন, সারা কলকাতায় যেখানেই যান—দোকানে, ফিরিওয়ালার কাছে, ভোজনশালায়,—সর্বত্র প্রধানত কোয়ালিটি আইসক্রিম। প্রথমে ছিল কাগজের কাপে, কিংবা একটা কাঠির ডগায় লাগানো, আমাদের বাল্যের পাংখা বরফের মতো।

বেশ চলল। রকমফের ইচ্ছা হলে মূল্যবান ভোজনশালায় প্রফিটারোলস, বা বেক্‌ট্ আলাস্কা নেওয়া যেত। এগুলি আইসক্রিমের নতুন স্তর। সেইজন্যই না হোক সে জন্যও উপভোগ্য। প্রফিটারোলসের কথা আগে লিখেছি। আলাস্কার কথা বলি। প্রথমে খানিকটা ভ্যানিলা আইসক্রিমের ওপর ফেটিয়ে নেওয়া ডিমের শ্বেতাংশের প্রলেপ। এবার, সামান্য বেক করা, ঝলসিয়ে নেওয়া আর কী। ডিমের আস্তরণে হালকা বাদামি রং হয়ে যাবার পর আপনার টেবিলে এনে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি তার ওপর ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। যেমন শোভা, তেমনি স্বাদ। আইসক্রিম, ডিম আর ভাল ব্র্যাণ্ডির মদির সুগন্ধ।

বছর কুড়ি আগে আইসক্রিম জগতে এল সফটি। দোকান ছাড়া সফটি বেচা যায় না। কয়েকটা ছোট ছোট দোকানও হল, বিশেষ করে বড় বড় শহরে। এত দিন পর্যন্ত সব আইসক্রিম মূলত এক ছিল। তফাতের মধ্যে বিভিন্ন ফ্লেভার বা সুরভি। এই প্রথম তার গঠনের বা ঘনত্বের পরিবর্তন হল। বলতে পারি, নতুন পাকের আইসক্রিমের সংযোজন

হল। সফটি নরম পাকের। দোকানে দোকানে খুব ভিড় হল কিছু দিন। কিন্তু জনতার রুচি বড় চপল। তা ছাড়া সন্দেশের বিবিধ পাকে অভ্যস্ত জিহ্বা আইসক্রিমের দুটি মাত্র পাকে সন্তুষ্ট হবে কেন?

আবার দিগন্ত প্রসারণের চেষ্টা শুরু হল। উদ্ভব হল আইসক্রিম পারলারের। এখানকার আইসক্রিম ঘনত্বে ভিন্ন। তা ছাড়া একুশ রকমের সৌরভে আইসক্রিম পাওয়া গেল—যেটা আপনার পছন্দ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার ব্যবস্থা। এই শহরে গোটা কুড়ি দোকান হয়েছে। নতুনত্ব শুধু আইসক্রিমেই নয়, নামেও। সাবজিরো, ডিজিল্যান্ড, ইনভেডার সেন্টার, আইসবার্গ। বিকালে সন্ধ্যায়, গ্রাহক উপছে পড়ে। তার অনেকটা অবশ্য স্থানাভাবের কথা। কিন্তু, আগেই বলেছি, সর্বত্র সেই এক কোম্পানির আইসক্রিম, কোয়ালিটির। একটু একঘেয়ে। বিভিন্ন গুণীর হাতের স্পর্শের বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত। শুনছি, রাসেল স্ট্রিটের সাবজিরো নাকি কোয়ালিটি শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে, অন্য আইসক্রিম বিক্রি করছে অথবা করবে? আমি এখনও পরীক্ষা করিনি।

অনেকের ধারণা আইসক্রিম নির্ভেজাল বিলিতি খাদ্য। প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধজাত আইসক্রিম এশিয়ার উদ্ভাবন। মার্কোপোলো আর পাঁচটা বিদ্যার সঙ্গে আইসক্রিমের পাকপ্রণালী ইউরোপে নিয়ে যান। আমাদের কুলফি, বিপণনের অভাবে কি ব্যর্থতায় অনাদরে পড়ে রইল, আমরা দলে দলে আইসক্রিম পারলারে ভিড় করলাম। পারলারে ভিড়ের অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। প্রায় সব পারলারে ভিডিয়ো গেমস খেলতে পাওয়া যায়। মাসুল দিতে হয় অবশ্য। টেলিভিশনের পর্দায় সেই খেলার সঙ্গে নানা বিকট শোঁ শোঁ, সাঁই সাঁই, চোঁ চোঁ শব্দ হয় লাল নীল আলো দপদপ জ্বলে নেভে। জানি না, এই শব্দলহরী ও আলোর ধাঁধা আইসক্রিমের ক্ষুধাকে উদগ্র করে কি না। করে নিশ্চয়। কারণ, আমার প্রাণ যদিও পরিত্রাহি হয়, দোকানে ভিড়ের হেরফের দেখি না।

আইসক্রিম সুস্বাদু, সুখস্পর্শ, স্নিগ্ধ মিষ্টান্ন। বিয়েবাড়িতে দেখি আইসক্রিম পড়তে পায় না। পারলারগুলিতে সে একুশ প্রকারের আইসক্রিম পড়তে পায় না। পারলারগুলিতে যে একুশ প্রকারের আইসক্রিম পাওয়া যায়, তাদের ভিন্নতা এবং বিশেষত্ব শুধু বর্ণ ও সৌরভে নয়, স্বাদেরও। এমনকী নামগুলিও স্বাদিষ্ঠ। যেমন, টোস্টেড আমণ্ড, চকোডাস্ট, জামাইকি রাম, কফিটফি, ব্লাইন্ড লাভ। মূলত এক আইসক্রিম থেকে উদ্ভূত হলেও স্বাদের ভিন্নতা আসে আইসক্রিমে আর কিছু মিশিয়ে। আমার যে পদটির ওপর অনুরাগ, ব্লাইন্ড লাভ, না, শুধু নামের জন্য নয়, তার স্বাদ সত্যিই বিশিষ্ট। সাধারণ ভ্যানিলা আইসক্রিম, স্বাদেও সাধারণ হবার কথা, কিন্তু তার সঙ্গে চকোলেটের কুচি কুচি মেশানো থাকায় জিহ্বা একটা নতুন স্পর্শ পায় এবং অনির্বচনীয় স্বাদ। কাপে নিতে পারেন, কিংবা ফুরফুরে হালকা বিস্কুটের মোচকে (ইংরাজিতে যাকে কোণ বলে)। দাম চড়া। ৪.৭৫ টাকা। পারলারে বর্ণাশ্রম আছে, মানে আইসক্রিমের মধ্যে। প্রথম শ্রেণীর আইসক্রিমগুলির দাম ৩ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীয় ৩.২৫। যেগুলি ভাল, তারা সবাই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে, দাম যথাক্রমে ৪.৫০ টাকা এবং ৪.৭৫ টাকা।

আর একটি আইসক্রিমও ব্লাইন্ড লাভের অনুরূপ কারণে আমার মনোমতো। কফিটফি। এটা কফি সুগন্ধিত আইসক্রিম। সঙ্গে মেশানো রয়েছে কুচো কুচো টফি। আর

তাই স্বাদ ও স্পর্শে অভিনবত্ব। অবশ্যই চকোডাস্ট এবং জামাইকা রাম পরীক্ষা করবেন। তারাও কিছু কম যায় না। কিন্তু তাদের শক্তি সৌরভ আশ্রিত।

যন্ত্রে তৈরি অটল মানের আইসক্রিম নিশ্চয় ভাল। কিন্তু গুণীর হাতের ছোঁয়ার জন্য, যা কি না সাধারণকে অনির্বচনীয় করে, আমার মন কেমন করে। কেমন একটা অন্ধ বিশ্বাস, গুণীর স্পর্শ না পেলে কী করে সুখের স্বর্গরাজ্যে উত্তরণ হবে? দেখে আশ্বস্ত হলাম, লাইডন স্ট্রিটের ইনভেডার সেন্টার, আইসক্রিম পারলার আমার সমধর্মী। তাঁরাও গুণীর হাতের স্পর্শের দাম দেন, অথবা দাম আদায় করেন। ওই, একই হল গুণীর মর্যাদা বুঝতে পেরেছেন এই যথেষ্ট, তাতে আমার যদি সামান্য জরিমানা হয় তবু। ইনভেডার সেন্টারে হ্যান্ডমেড কেসর আইসক্রিম অর্থাৎ হাতে তৈরি জাফরান সুরভিত আইসক্রিম পাওয়া যায়। যে পদটি দামে সর্বোচ্চ। পাঁচ টাকা। হাতে তৈরি, অর্থাৎ সেই যে আমাদের কালো কাঠের বালতির মতো একটা যন্ত্র ছিল, তখন পথে-ঘাটে দেখা যেত, কিংবা, বিলেতফেরত মেজমামা নিজে বানাতেন, হাতল ঘুরিয়ে আইসক্রিম জমানো হত, তাতে তৈরি করা আইসক্রিম। যন্ত্রযুগে শিল্পীকে মর্যাদা দেবার জন্য অন্তত এই আইসক্রিমটা পরখ করবেন। আনন্দ পাবেন।

উদ্ধত চূড়ায় লাল চেরি

মফস্বলের ছেলে কলকাতায় প্রথম কেক হাতে পেয়ে কাগজ-সুদ্ধ খেয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। এক আনা দামের সেই ছোট্ট কেকের তলায় মাখন বা তেল জবজবে এক টুকরো কাগজ থাকে আমার জানবার কথা নয়। আমার মাসতুতো ভাই সে কথা সবাইকে বলে দিয়েছিল। মাসতুতো ভায়েরা যে ভাল লোক হয় না সে কথা কে না জানে? তার ওপর সে আবার কলকাতার ছেলে।

তখনও জানি না কেক আর পেস্ট্রি এক পদার্থ নয়। হলই বা সগোত্র। প্রভেদটা কোথায় জানতে সময় লেগেছিল। বুঝেছিলাম কেক আর পেস্ট্রির মধ্যে প্রভেদ বাড়ি আর এপার্টমেন্টে যেমন তফাত অনেকটা সেই ধরনের। পেস্ট্রি যেন ছোটখাট, ছিমছাম সুসজ্জিত এপার্টমেন্ট, সুখের নীড়। আর কেক বলা চলে ছড়ানো, মস্ত মতো, আশ্রয়ের সুখ।

তারও পরে নানা দেশে নানাবিধ কেক খেয়েছি। অনেক স্বাদ এখনও স্মৃতিতে বিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এমনই বাংলা ভাষ্যর দুর্বলতা যে সেই সব অলৌকিক বিভিন্ন স্বাদ লিখে বোঝানো যায় না। 'লারুস গাসত্রোনমিক' (ফ্রান্সে প্রকাশিত রান্নার বেদ) পড়ে জেনেছি ফ্রান্সে বহু প্রকারের কেক হয়। কুলীন কেকের সংখ্যাই একশো আটচল্লিশ। মৌলিকদের ধরলে কোনও না হাজার হবে। পেস্ট্রি নিশ্চিত তার কয়েক গুণ হবে। পশ্চিম দেশে সব উৎসবে কেক অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ পূজায় যেমন বিশেষ ফুলের বিধি, ভজনপূজনের আচারপদ্ধতির মতো তেমনি বিভিন্ন উৎসবে অবসরে বিভিন্ন কেক। ধরুন, এই বড়দিনে, মানে ক্রিসমাসে সাহেবরা ক্রিসমাস কেক খান। অনেক ফল বাদাম কিশমিশ মেশানো সেই সম্ভ্রান্ত কেক সহজেই আমার চিত্ত হরণ করে। যা আমাকে মত্ত

করে তা হল অবশ্য ওই কেকের একটু রকমফের যাকে মাখন-ব্র্যান্ডি সস মিশিয়ে গ্রহণ করা বিধেয়।

জন্মদিনে, বিয়েতে, ইস্টারে নববর্ষে কেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমাদের বাঙালি ছেলেমেয়েরাও এখন জন্মদিনে পায়সের বদলে কেক পায়, পছন্দও করে। পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বালানো হয় না। সেখানে জ্বলে মোমবাতি। ফ্রান্সের একটি প্রাচীন পরম্পরায় বিখ্যাত কেক যা অনায়াসে কয়েক শতাব্দীকে অগ্রাহ্য করেছে, তার নাম টুয়েলথ নাইট কেক—বা দ্বাদশ রজনীর কেক। দ্বাদশ রজনী অর্থে বাইবেলে কথিত দীক্ষার দিন, এপিফ্যানি। শুনেছি ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে ওই কেকের বিভিন্ন সংস্করণে আবির্ভাব হয়। আমি কখনও ওই কেক খাইনি। শোনা কথাতেই বিভোর হয়ে আছি।

একবার সুইটজারল্যান্ডের সারমট শহরে একটি পেস্ট্রি আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়েছিল। রূপে এবং গুণে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে নামটাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। পৃথিবীর অন্যতম সুশ্রী পর্বতশিখর ম্যাটারহর্ন ওই সারমট শহরের কাছে। তাই বোধহয় পর্বতচূড়ার প্রতীকের মতো একটি পেস্ট্রি এসে পৌঁছল। গায়ে দু-একটা বাদামি চকোলেটের ছোপ, যেন ঋতু পরিবর্তনে ম্যাটারহর্নের পাথর বেরিয়ে পড়েছে। মাথার ওপর ম্যাটারহর্নের চূড়ায় সদ্য তুষারপাতে গুঁড়ো বরফের মতো চিনির একটা হালকা আস্তরণ। উদ্ধত চূড়ার ওপর একটি রক্তিম চেরি। আগের দিন প্রত্যূষে দেখা ম্যাটারহর্নের শিখরে যেন সদ্য সূর্যালোক পড়েছে। অনেকক্ষণ বিস্ময়াহত পর্যবেক্ষণের পর সন্তর্পণে এক খণ্ড মুখে তুললাম। শরীর প্রথমে শিউরে উঠল। বিশ্ববিখ্যাত জাপানি শিল্পী হোকুসাইয়ের একটা পাহাড়ের ছবি কি চিবুনো যায়? কিন্তু পেস্ট্রির ভেতরে দুই স্তরে ভিন্ন স্বাদের দু রকমের ক্রিমের আয়োজন, চকোলেটের ওই মসৃণ আস্তরণ, বাকি অংশটা কোন অজানা দেশের কোমলতায় ভরা। ভেবেছি, কোন বিদ্যাধর স্থপতি এমন সুদৃশ্য সুস্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন আমার জন্য।

আমার চার ইন্দ্রিয় আজও সেই স্বাদে মগ্ন হয়ে আছে। রূপে, রসে, গন্ধে স্পর্শে এমন অপরূপ কীর্তির সঙ্গে আর সংযোগ হয়নি। কানেও বোধহয় তার অস্ফুট আপ্যায়ন শুনতে পাই।

কেক খাবার সুযোগ বেশি হয় না। বড়দিনে এবং নববর্ষে অবশ্যই হবে। কোথায় সেই ফ্রান্সের মহারানি যিনি রুটির অভাব হলে সবাইকে কেক খেতে বলেছিলেন? প্রত্যহ?

বড়দিন

বর্ষার দিনে যেমন তেলেভাজা, রথের মেলায় পাঁপড়, তেমনি ক্রিসমাসে কেকের কথা মনে আসে। ক্রিসমাসকে আমরা বাঙালিরা বলি বড়দিন। উত্তর ভারতেও যীশুর জন্মের দিনটিকে বড়া দিন বলা হয়। বড়দিন, মানে বিশেষ দিন। জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব আমরা জানিও না, জানলেও ভুলে গিয়েছি। ২৫ ডিসেম্বরের দিন তিনেক আগে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, দিন বড় হতে থাকে । হয়তো সেই থেকে বড়দিন কথাটির উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের কাছে, ধর্ম নির্বিশেষে, বড়দিন মানে উৎসবের দিন, আনন্দের দিন। শৈশবের স্মৃতি এখনও মলিন হয়নি, যখন নিউমার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট আমাদের কাছে এত সহজগম্য ছিল না। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো, ক্রিসমাসে বাবা-কাকার হাত ধরে আমাদের নিউমার্কেটে রূপকথার রহস্যালোকে প্রবেশ হত। আর কিছু কেনা হত কি না মনে নেই, তবে দু চার খণ্ড কেক কিনে এনে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে আমাদের হিন্দু বাড়িতে সেই কেক সহযোগে যীশুর জন্মদিন উদযাপন করেছি। কখনও কখনও চিড়িয়াখানায় গিয়েছি, সেখানে মানুষের অরণ্যে পশুপক্ষী নজরে আসত না, কোথায় যেন আহারাদি হত, ফেরার পথে সেই আশ্চর্য কেক কিনে আনা হত। তখনও আমরা কেক, পেস্ট্রির পার্থক্য জানতাম না। পরে, ফেরাজিনি, ট্রিঙ্কা, ফ্লুরিও অধিগত হয়েছিল।

ফেরাজিনি কবে বিদায় নিয়েছে, তুলনায় ট্রিঙ্কা নিষ্প্রভ। এখন সগৌরবে সাম্রাজ্য করছে ফ্লুরি। কিন্তু এখানে কেনাকাটা বড় কঠিন। উদাসীন সেলসম্যানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভাগ্যের ব্যাপার। সব সময়ে ক্রেতার ভিড়, মনোমতো বস্তু মুহূর্তে নিঃশেষ হয়। আজ ২৪ ডিসেম্বর, যদি পারেন একবার যাবেন। কাল কী পাওয়া যাবে বলা মুশকিল।

বড়দিনে প্লাম পুডিং বা প্লাম কেক সেবা করা বিধেয়। ইচ্ছাধিকার থাকলে আমার অবশ্য ফ্লুরির চকোলেট কেক বেশি পছন্দ। কিন্তু পৌষ সংক্রান্তিতে কেউ যেমন পিঠেপুলি ফেলে সন্দেশ রসগোল্লা খোঁজে না, বড়দিনেও তেমনি প্লাম কেক মালা পায়। ভালও লাগে। লাগবেই তো। প্রচুর রাম অথবা ব্র্যান্ডি সহযোগে প্রস্তুত হবার কথা বলে কেমন যেন মাদকতাপূর্ণ, হৃদয়কে বিবশ করে দেয়। বলা যেতে পারে কেক তৈরি করার শিল্পাকলায় ফ্লুরি অত্যুঙ্গ চূড়ায় পৌঁছেছে। প্লাম কেকের দামও অবশ্য চূড়া ছুঁই ছুঁই। এক কেজির দাম ৫৬ টাকা। প্লাম কেক স্বাদের স্বর্গে পৌঁছয় ব্র্যান্ডি সসের সহযোগে। এই সসের ব্যবস্থা বাড়িতেই করতে হবে। অভাবে রামও চলতে পারে। বাচ্চারা যদি আরও কিছু খেতে চায়, পেস্ট্রি কিনতে পারেন। দুই প্রকারের পেস্ট্রি পাবেন, প্রথম ২৭ টাকা ডজন, দ্বিতীয় ৩৩ টাকা। সব গোলাপের কাঁটা থাকে, সব সুখের কিছু অন্তরায়। ফ্লুরিতে অপেক্ষার সময় প্রভূত সেলসম্যানের দয়া-নির্ভর। সময় হাতে নিয়ে যাবেন।

সম্প্রতি আর একটি দোকান বেশ নাম করেছে। তারাও উত্তম কেক, পেস্ট্রি করে। ক্যাথলিন। দোকানটি মির্জা গালিব স্ট্রিটের উপর, পশ্চিমদিকের ফুটপাথে, নিউমার্কেটের কাছাকাছি। এখানে দাম সামান্য কম। প্লাম কেক ৫২ টাকা কেজি। আধ কেজির সুন্দর কেক পাবেন। আর যদি পেস্ট্রি চান, ২২ টাকা ডজন।

খ্রিস্টানরা শুনেছি বড়দিনে নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে গৃহে ভোজন করেন। পারিবারিক অনুষ্ঠান। সাধারণত খাদ্যতালিকা সংক্ষিপ্ত, রীতির শৃঙ্খলে বাঁধা। স্টাফ্‌ট্ টার্কি এবং প্লাম পুডিং বা কেক থাকবেই। আমরা যারা খ্রিস্টান নই তাদের জন্য ক্রিসমাস লাঞ্চ পাওয়া বিবিধ ক্লাবে অথবা হোটেলে। সেখানেও আরও নানাবিধ রসনালোভন আহার্যের মধ্যে প্লাম কেক এবং স্টাফ্‌ট টার্কি অবশ্যই থাকবে। কুক্কুট বংশীয় এই কুদর্শন পক্ষীটির মাংস কত স্বাদিষ্ঠ আহার না করলে অনুভব করা কঠিন। যদি হোটেলেই যেতে হয় ক্রিসমাস লাঞ্চের জন্য ধরুন গ্র্যান্ড হোটেলের গার্ডেন কাফেতে, মাথা পিছু খরচ পড়বে ৮৫ টাকা, তার ওপর সার্ভিস ও কর মিলিয়ে আরও ২১/২২ টাকা দিতে হবে।

ক্লাবে খরচ অবশ্যই কম। তা হলেও নগণ্য নয়। একটি ক্লাবে সদস্যদের জন্য ৪৫ টাকা। তাঁদের অতিথিদের জন্য দিতে হবে ৬৫ টাকা। সমারোহের ভোজন হবে। আরও বহুবিধ লোভনীয় আহার্য থাকবে, কিন্তু এই দিনের প্রধান আকর্ষণ হবে প্লাম পুডিং এবং রোস্ট স্টাফ্‌ট্ টার্কি।

মিতব্যয়ীদের এ সব বিলাসিতায় না গেলেও চলবে। মিষ্টি শীতের রৌদ্র, দার্জিলিং-এর কমলালেবুর সুগন্ধে মদির করে নিউমার্কেটের ডাগামা অথবা নাহুম থেকে কেক নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। এদের খাবারও ফেলনা নয়। দামে অনেক সাশ্রয় হবে। প্লাম কেক ৪০ টাকা কেজি, পেস্ট্রি টাকায় একটি।

কেকের কাছে রসগোল্লা নিতান্ত অর্বাচীন

রথের দিন যেমন পাঁপরভাজা, বড়দিনে তেমনি কেক। না হলে নয়। শহরে হোক, কিংবা গ্রামে সরস্বতী পূজার অঞ্জলি দেবার পর গরম খিচুড়ি খাওয়া যেমন বিধি, বড়দিনে একটু কেক না খেলে দিনটা তেমনি উদ্‌যাপিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে, যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।"

বাঙালি দিগ্বিজয়ী না হোক, বাঙালির উৎসব আবিষ্কারের ক্ষমতা অতুলনীয়। একে তো বাঙালির বারো মাসে পার্বণের সংখ্যা তেরোর অনেক বেশি, তার ওপর আর সবার অনেক পার্বণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করেছি। শুনেছি এখন নাকি রিসার্চ চলেছে, কীভাবে জামাইষষ্ঠী এবং ভাইফোঁটার প্রতীকী মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করা যায়।

ক্রিসমাসকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি অনেকদিন, আমাদের ধর্মীয় অবস্থান যেখানেই হোক। ক্রিসমাসের মধ্যরাত্রে, যে মুহূর্তে ক্রিসমাসের শুরু, ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান গির্জায় সমবেত প্রার্থনা করেন। তাঁরা প্রার্থনার পর বড়দিনের কেক, অর্থাৎ ক্রিসমাস কেক আহার করেন, সঙ্গে সামান্য সুরাও থাকে। আমরাও বড়দিনে ক্রিসমাস কেক অথবা ক্রিসমাস পুডিং গ্রহণ করে দিনটাকে উৎসবের টীকা পরিয়ে দিই। যাঁরা পারেন এবং যাঁদের অভিরুচি আছে, তাঁরা সেদিন একটু অথবা অধিক মদিরারও আয়োজন করেন।

ইংরেজিতে একটা বাক্যবন্ধ আছে, 'কেক্‌স এন্ড এল' যে নামে সমারসেট মমের বিখ্যাত উপন্যাস। 'কেক্‌স এন্ড এল' মানে হল আনন্দ করা, সঘন ফুর্তিতে সময় কাটানো। আমাদের ইংরেজির জ্ঞান তেমন গভীর ছিল না। 'কেক্‌স এন্ড এল'-এর অর্থ আমরা একেবারেই জানতাম না, অথচ আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে কেকের সঙ্গে এল

অর্থাৎ বিয়ার এবং তার অভাবে অথবা বিকল্পে মদিরা যুক্ত হলে ফুর্তি প্রবল হয়। সুতরাং বড়দিনের কেকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মদিরা যোগ করে আমরা উৎসবের শুরু করি। সেদিন কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ ক্লাবগুলিতে বিশেষ ক্রিসমাস লাঞ্চের আয়োজন হয়। বিশেষ কেক অথবা পুডিং এবং মদিরা ছাড়া আর একটি পদের অনিবার্য উপস্থিতি সেদিন খাবার টেবিলে। সেটি হল রোস্ট টার্কি। ওই যে মুরগির ক্যারিকেচারের মতো বিকটদর্শন পক্ষী, যার নাম টার্কি, যাকে মানুষ সারা বছর অক্লেশে ভুলে থাকে, বড়দিনের ভোজনে ক্রিসমাস পুডিং-এর সঙ্গে শ্যামদেশীয় যমজের মতো সেই টার্কির অভিন্ন উপস্থিতি।

টার্কি আমার ভাল লাগে না। ভোজনকালে তার রূপটি কল্পনায় ভাসলে বরং শিউরে উঠি। এমন কিছু স্বাদিষ্ঠ মাংস নয়, তবে কেন অলঙ্ঘ্য আচারের অন্তর্গত বলতে পারব না। ক্রিসমাস পুডিং অথবা ক্রিসমাস কেক অন্য সময়ে কেন সচরাচর পরিবেশন হয় না, তাও জানি না। আমি ক্রিসমাস কেকের ভক্ত। বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনের উপচার বলেই নয়, রসনালোভন পদার্থ বলে। রসনালোভন তো হতেই হবে। কারণ অনেক দেবভোগ্য উপকরণ দিয়ে ক্রিসমাস কেক প্রস্তুত হয়। বহুবিধ মূল্যবান ফল থাকে ক্রিসমাস কেকে। কিন্তু বিশেষত্ব সেখানে নয়। বিশেষত্ব হল বিবিধ ওই ফলের খণ্ডগুলি কেকে মিশ্রিত হওয়ার আগে মোরব্বারূপে মদিরায় সিঞ্চিত হয়েছে।

উৎসবে, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যের উৎসবে কিঞ্চিৎ মদিরা থাকলে আনন্দ সহজে সংক্রামক হয়। সব সময়ে যে পরিমিত পরিমাণ হয়, তা নয়, কখনও সখনও মদিরার মাত্রা অধিকের দিকে চলে যায়, তবুও একটা দিন যদি একটু নির্বাধ আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় তো মন্দ কী?

কবে থেকে ক্রিসমাস কেকের প্রচলন হয়েছে, আমার জানা নেই। এখন দেখছি তার প্রভাবের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বঙ্গদেশের শহর থেকে শহরতলি, ছোট শহর, বড় গ্রাম—সর্বত্র কেক পাওয়া যাবে, অন্তত বড়দিনের ঋতুতে। সব জায়গাতে কেকের স্বাদ এক রকম নয়। কলকাতা থেকে যত দূরে যাব, কেকের স্বাদ বদলাতে থাকবে। কলকাতার কেক আর গ্রামের কেক সগোত্র বস্তু বলে চেনা কঠিন। তা হোক। বড়দিনে তবু কেক চাই—সর্বত্র।

লারুস গাস্ত্রোনোমিক, পাকশাস্ত্রের ফরাসি বিশ্বকোষে দেখলাম কেক কি এক রকমের হয়? লারুস বলছে যদি প্রবীণ কেকগুলিকে ধরা যায় তা হলেই অন্তত দেড়শো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কেক হয়। এরপর তাদের শাখাপ্রশাখা এবং বংশধরদের ধরলে সম্ভবত পাঁচশো হবে। তবে এই হিসেবে কেকের সৎবোন পেস্ট্রিকেও ধরা হয়েছে। লারুস পড়ে আর একটু জ্ঞান বাড়ল। আটশো বছর আগের প্রাচীন গ্রন্থেও নাকি কেকের উল্লেখ আছে। আমাদের একশো বছরের রসগোল্লা তার কাছে অর্বাচীন ছোকরা।

ক্রিসমাস কখনও পালন হতে পারে কেক বাদ দিয়ে?
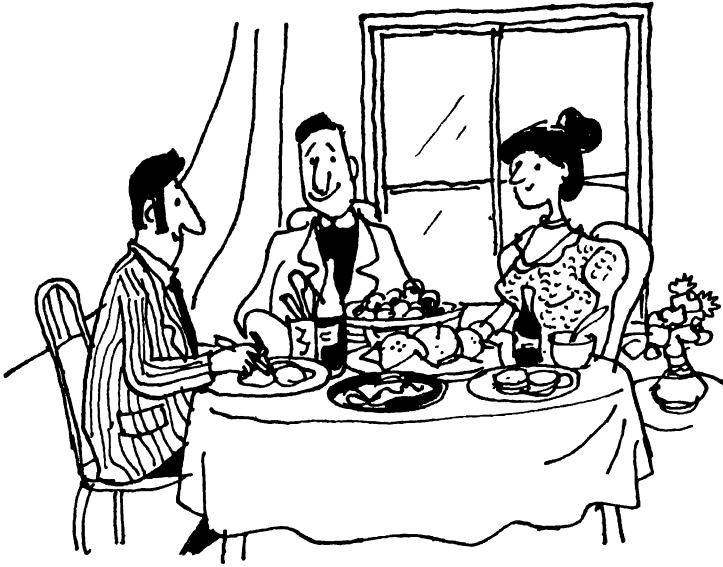
ইংরেজ প্রাতরাশ সমৃদ্ধ করেছে স্কটরা

নিজের দেশের আহার্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। দেশের আহার্যই তো আমাদের রুচি, স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সেই জন্যই বিদেশ গেলে সব বাঙালি বাংলা আহারের সন্ধান করে। মনে করুন হরিদ্বারের বউদির হোটেল, বা মুম্বইয়ের বেঙ্গল লজ। নিজের খাবারের জন্যই তো সেখানে যাওয়া।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে নিজের খাবার তো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খেয়ে যাব। দু দিনের দশ দিনের সফরে বাইরে এসে নাই বা খেলাম সে খাবার। অন্তত স্বাদ নিয়ে দেখা উচিত, কেমন খাবার সে দেশ বা সে অঞ্চলের মানুষ খায়, এবং খেয়ে তৃপ্তি পায়।

তাই আমি দেশ ছাড়লে যেখানে গিয়েছি সেখানের জনপ্রিয় খাবার পরীক্ষা করি। সব সময় যে স্বাদ মনোমত হয়, তা নয়। অনেক সময় কষ্টেরও হয়।

যেমন হল এবারে। ইতালিতে। আমি ইতালীয় ভাষার বিন্দুবিসর্গ জানি না। যে সব ছোট ভোজনশালায় আহারের সন্ধান যাই, সেখানে বিদেশি কেউ বড় একটা আসে না, দেশের লোকেরাই সেই জাতীয় ভোজনশালার নিত্য অতিথি।

প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম। এক বড় পাত্রভরা লেটুসপাতা দিয়ে গেল। আর রেখে গেল দুটি শিশি, একটি ভিনিগারের বুঝতে পেরেছিলাম। অন্যটি অলিভ তেলের, পরে জেনেছি। শিশি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, পরিচারিকা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, লেটুসপাতার সঙ্গে তেল এবং ভিনিগার মিশিয়ে নিজের সালাদ তৈরি করে নিতে হবে। নার কী পরিমাণ ভিনিগারে কত পরিমাণ অলিভ তেল লাগবে, সে তো আপনার রুচি অনুযায়ী। রান্নাঘরে তেল ও ভিনিগার মিশিয়ে আনলে ব্যক্তিত্বহীন মানুষের মত ফিকে

মনে হবে।

এবারে যে পদটি এল, তার সঙ্গে ইদানীং সব বাঙালির পরিচয় হয়েছে। ম্যাগি নুডল জাতীয় পদটি। সামান্য সংখ্যক বাঙালির চিনা খাবারের মারফত নুডলের সঙ্গে আগেও পরিচয় ছিল।

নুডল জাতীয় সেই পদার্থ এঢ় মস্ত এক বাটিতে। তার কেন্দ্রে আমাদের কিমাকারির মতো কোনও ব্যঞ্জনের এক চামচ। তৎক্ষণাৎ চামচ সহযোগে সেই ব্যঞ্জনটুকু খেয়ে নেওয়ার পর, শুধুই নুডল থাকল। যেটুকু ব্যঞ্জন খেয়েছিলাম, ভাল লেগেছিল। টমাটোর আধিক্য ছিল যদিও।

ইতালিয়ানরা নুডলকে বলে পাস্তা। পাস্তা মদয়া দিয়ে তৈরি হয়। তার চেহারাও নানাবিধ। শুধু যে খড়ের পিচ্ছিল নলের মতো হবে, এমন কথা নেই। দু-একটা ব্যঞ্জনে পাস্তার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাংস দিয়ে রাভিয়োলি তৈরি হয়। সঙ্গে সস মেশাতে পারেন। সাধারণ ভিনিগার, অলিভ তেল হতে পারে, অথবা অন্য কোনও ক্ষুধাবর্ধক সুগন্ধ সস। একদা তুলসীপাতার সস দিয়ে পাস্তা খেয়েছি।

আমাদের ভাত রুটি, সাহেবদের পাউরুটি-র বিকল্প ইতালিয়ানদের পাস্তা। দু'বেলাই চাই। প্রথম বছর পাস্তা খেতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছিলাম। ম্যাগি নুডল যেমন দশ বারো ইঞ্চি লম্বা হয়, এ তেমন নয়, অতি দীর্ঘ শেষহীন নুডল, মুখে পুরে শেষ পর্যন্ত টানতে বেশ সময় লাগে। ক্ষণে ক্ষণে পিছলে যায়।

ইতালিয়ানরা এই রূপের খাদ্যকে বলে স্প্যাগেটি। আর, যে ভোজ্যের নুডলগুলি নলের ভিতরে ফাঁপা তাকে বলে ম্যাকারনি।

চিনা নুডলও প্রধানত ময়দা থেকে হয়। তবে চিনারা চালের অতি সরু নুডলও তৈরি করেন। তাকে বলে মী ফুন। অনেক বেশি স্বাদিষ্ট। কলকাতাতেও বহু চিনা ভোজনশালায় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতো পাস্তারও বহু নাম। তার মধ্যে একটির নাম ভার্মিচেলি। ভার্মিচেলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম রচনা। নুজলের দড়িগুলি সূক্ষ্মতক হলে বুঝি ভার্মিচেলি বলা হয়। সর্বপ্রকার পাস্তা ময়দার তৈরি। কোথাও পড়েছি স্প্যাগেটিতে ময়দার সঙ্গে ডিমও মেশানো হয়। তাতে স্বাদগন্ধের কোনও রূপান্তর আমি বুঝতে পারিনি।

তিন দিন পাস্তা, রাভিয়েলি এবং ম্যাকারনি খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ছিলাম। এবারে স্থির হল ইতালীয়দের বিশ্ববিখ্যাত ভোজ্য পিৎজা খাওয়া হবে।

কলকাতাতেও এখন পিৎজার অনুপ্রবেশ হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বরাত পেলে মোটর সাইকেলে করে বাড়িতে পিৎজা পৌঁছে দেয়। পিৎজা যেন আমাদের শক্ত পরটার ওপর কমদামি চিজের আস্তরণ। তার ওপর বারণ না করলে টমাটো সসের প্লাবন। কিন্তু সিঙাড়া যেমন শুধু আলুর হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, কপি, চিনাবাদাম বা কড়াইশুঁটি-যুক্তও হতে পারে, তেমনি পিৎজার অনুপান হতে পারে হ্যাম, সসেজ, বেকন, মাশরুম ইত্যাদি। অনুপান সহযোগে পিৎজার কথঞ্চিৎ স্বাদ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনুপানের পরিমাণ এতই সামান্য থাকে যে পিৎজার মস্ত কিছু প্রমোশন হয় না।

পরের তিন দিন পিৎজা গ্রহণ করে এবার খাদ্য তালিকার অন্য দিকে মন দেওয়ার তাগিদ এসেছিল। প্রথমেই নজরে এল গ্রিলড ল্যাম উইথ পটেটো। চেনা পদ, না-ই হল ইত্যাদি কুলীন বংশজাত। কিয়ৎকাল পরেই গ্রিলড ল্যাম উপস্থিত। কয়েক খণ্ড মেষমাংস, আঁচে ঝলসে নেওয়া হয়েছে। মনে হল অতি সচ্চরিত্র পদ, কোনও জারকের রসায়নে সিক্ত নয়। সচ্চরিত্র বপিত্র মানুষ যেমন ফিকে মনে হয়, এখানের পদটি বুঝি তার চেয়েও ফিকে। উচ্চশ্রেণীর মেষমাংস, কিন্তু তাকেও কিছুক্ষণ আগুনের ছোঁওয়া দিতে হয়, এই পদটি মনে হল নামমাত্র অগ্নিস্পর্শ করেই আমার ভোজনপাত্রে আবির্ভাব হয়েছে। যদিও সাধারণ ছুরি নয়, স্টেক নাইফ ছিল, তবুও গ্রিলড ল্যামকে শায়েস্তা করতে পারছিলাম না। চিকেন নিলে এমন দুর্দৈব হত না, দামেও কম হত।

ভোজনশালাটি ভাল। সব টেবিলে রসগ্রাহী মানুষ। স্বয়ং মালিক টেবিলে টেবিলে ঘুরে মদিরার মর্যাদা ব্যাখ্যা করছেন। সম্ভ্রান্ত পরিচারককে অনেক ইতস্তত করে কাছে ডাকলাম। ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে মনে হল, বোঝাতে পেরেছি, মাস্টার্ড পাওয়া যাবে, কি অথবা তাবাস্কো সস।

মনে মনে জানি মাস্টার্ড বা তাবাস্কো হলে ফিকে গ্রিলড মাটনে একটু প্রাণ আনা যেতেও পারে।

পরিচারক আমার অনুরোধ অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বিচার বিবেচনা করল, তার চোখের একটা ভুরু উঁচু করে স্পষ্ট ইংরেজিতে বললে, আমাদের শেফ যে পদ সৃষ্টি করে তাতে ইংরেজদের মতো ঝালমশলা মিশিয়ে নিতে হয় না অতিথিকে।

শেষ বাক্য উচ্চারণ করে পরিচারক অন্তর্হিত হল। আমি ইতালীয় রান্নার তারিফ করবার জন্য গ্রিলড মাটনের ব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হলাম।

প্রশ্ন হতে পারে ইতালিতে তা হলে কী ভোজন হত প্রত্যহ। লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করতে হয়, আমেরিকা হ্যামবার্গার ছাড়া গতি ছিল না। শুধু ম্যাকডোনাল্ডই নয়, আমার মতো গোলা অতিথিদের জন্য প্রায় সব ভোজনশালাতেই হ্যামবার্গার পাওয়া যায়। আর ছিল অগতির গতি হুনা রোস্টো, অর্থাৎ রোস্ট চিকেন। সর্বত্র পাওয়া যায়, সর্বত্র এক স্‌বাদ। ভাল বলতে পারলে খুশি হতাম।

ভোজন মানুষের স্বভাবের অঙ্গ। তাই নিয়ে গর্ববোধ স্বাভাবিক। ইতালীয় পরিচারক যেমন আমাকে একটি বাক্যে ধ্বস্ত করেছিল, এক জার্মান বন্ধুও মিষ্টি করে একই কথা বলেছিলেন।

অনেক দিন আগের ঘটনা, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। প্রথম গিয়েছি লন্ডন। কত আর গ্রিলড বা রোস্ট চিকেন খাব। চিকেনের বা ল্যামের স্টু-ও পাওয়া যায়, সে অনেকটা মাংসযুক্ত আমাদের ফ্যানের মতো। ক'দিন পরে জার্মানি পৌঁছে স্বাদবদল হল। প্রথমত এরা বহু প্রকার সুপ খায়। তার কয়েকটিই বিশেষ এবং কয়েকটির স্বাদও মনোমতো। একটি সুপ আমার খুব মনে ধরেছিল। গ্লুয়ডেল সুপ। ছোট আকারের ক'টি টেনিস বল সুপের তারল্যে ভাসছে। টেনিস বলগুলি আলুর তৈরি। জার্মানরা আলু অত্যন্ত পছন্দ করে। আলুকে কুরে নিয়ে নানা জটিল পদ্ধতিতে টেনিস বলের রূপ দিয়ে সুপ তৈরি হয়। আর আনন্দ দিয়েছিল সসেজ। কত রকম রমণীয় সসেজই না পাওয়া যায়

জার্মানিতে।

আমি উল্লিসত হয়ে বন্ধুকে বললাম, আ, এতদিন পরে ভোজনের সুখ পাচ্ছি। কী কষ্টেই না ছিলাম ইংল্যান্ডে।

আমার বন্ধু দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, সে কী?

বললাম, ওরা যে আসলে রাঁধতেই জানে না। বন্ধু আরও অবাক হলেন। বললেন, বলেন কি? ইংরেজরা সবাই তো রন্ধনবিদ টেবিলে দেখেননি, সব সময়ে নুন-মরিচের শিশি হাজির। সবাই সেই মশলা মিশিয়ে আপন আপন পদে স্বাদ যুক্ত করছেন। ওঁরা সবাই তো রাঁধুনি।

বন্ধুর কপট যুক্তি শুনে আমি খুব হেসেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল, ইংরেজদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে। আর কিছু না হোক, ওদের ব্রেকফাস্ট, অর্থাৎ প্রাতরাশ তো অতুলনীয়। প্রথমে ফলের রস কিংবা শেষে ফল। মাঝে দুগ্ধ সহযোগে কর্নফ্লেক্স কিংবা ওটমিল। তারপর স্মোকড স্যামন মাছ। পাউরুটি-মাখন সহযোগে এবারে ডিম। যে রূপে চান, বয়েলড, হাফবয়েলড, ফ্রায়েড, পোচ অথবা ওমলেট। আহারে একটু কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজের স্পর্শ পেলে কী অপরূপই না হয়ে উঠত। তারপর চা। এই প্রাতরাশের নিন্দা করা কৃতঘ্নের কাজ হবে। তাও তো বলতে ভুলে গিয়েছি, ডিম শুধু একা আসবে না, সঙ্গে বেকন থাকবেই। পরে দেখেছি, কোনও কোনও স্থানে বেকনের বিকল্পে সসেজও পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতার পর দুপুরে বয়েলড চিকেনেও আফত্তি করা অনুচ্চিত।

একমাত্র স্কটল্যান্ডের মানুষেরা এই প্রাতরাশকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা ডিমের পদের সঙ্গে বেকনের সঙ্গে সসেজও পরিবেশন করেন। পরিবর্তে নয়।

অথচ আশ্চর্য দেখুন, এখন সবাই সারা ইউরোপে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টেই সন্তুষ্ট। কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট শুধু পাউরুটি এবং কফি অথবা চা। যেখানে একটি ভারি ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয় সেখানে ডিম ইত্যাদির সঙ্গে ফলও থাকে। কিন্তু কদাচ মাছ।

আক্ষেপের কথা, পৃথিবী এখন ইংলিশ ব্রেকফাস্টের কথা ভুলে গিয়েছে। ভাল ব্রেকফাস্ট যাঁরা পরিবেশন করেন, অবশ্য মাছ ছাড়া, তাঁরা এই প্রাতরাশের নাম দিয়েছেন আমেরিকান ব্রেকফাস্ট। হায় ইংরেজ। পৃথিবীর তাবৎ ভাল জিনিসগুলিই এখন আমেরিকানদের নামে চলেছে। এমনই তাদের দাপট।

প্রথমেই বলেছি, খাদ্যাখাদ্যের পছন্দ ব্যক্তির এবং জাতির নিজস্ব। আফ্রিকার মাসাইরা তো গৃহপালিত পশুর রক্তক্ষরণ করে, সেই রক্ত পান করে থাকে। ব্যঞ্জনেও মেশায়। এবং অবশ্যই আহা, আহা বলে তারিফও করে। চিনারা প্রাতে ফেনভাত খান। শুনেছি, তাঁরাও যথোচিত আনন্দ পান।

বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের ভয়ে এখন ধর্মের নাম নিতে বয় করে। তবু সন্তর্পণে বলে রাখি, যার ধর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। ভোজ্য ও রুচির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

কাকোরি কবাব

অনেকের মতো আমারও ধারণা, মৎস্য-মাংসাদিতে তেল-ঘি, পিঁয়াজ-রসুন প্রবল হলেই মোঘলাই ধারা হয়। এ ছাড়া দু-একটি একদা স্বল্পপরিচিত পদ, হয়তো বা অপরিচিত বলেই, আমরা অনিবার্যভাবে মোঘলাই মনে করেছি। যেমন কবাব, কোর্মা, বিরিয়ানি ইত্যাদি। কবাবের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় যদিও বহুদিনের। কারণ আড়াইশো বছর আগের লেখা ভারতচন্দ্রের কবিতায় দেখছি: অন্য মাংসে সীক ভাজা কবাব করিয়া। অর্থাৎ, শুধু কবাব নয়, একেবারে শিক-কবাব। তবে, নিশ্চয় করে বলা কঠিন বাঙালির সঙ্গে শিক-কবাবের পরিচয় শুধু কাব্যের কল্পনায়, না পদটির সঙ্গে রসনার সংযোগের বাস্তবে।

সে যাই হোক, এখন, গত চল্লিশ বছর, কলকাতায় নিজাম রেস্টুর‍্যান্ট প্রতিষ্ঠা হবার পর, কবাব আর আমাদের অপরিচিত নেই। যদিও সেই কবাব এখন পরটায় আশ্লিষ্ট হয়ে রোল নাম ধরে পাড়ায় পাড়ায় আমাদের রসনা অভিষিক্ত করার অপেক্ষায়। বাচ্যার্থে, কবাব শিকে চড়লেই শিক-কবাব। কিন্তু যাকে সত্যি শিক-কবাব বলা যায়, তার দুটি রূপের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম রূপের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ১৯৪৭ সালে মোতিমহল রেস্টুর‍্যান্টে, দিল্লিতে। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত যেমন সহজেই প্রণয়ের শিকার হয়, আমারও তেমনই হয়েছিল। পুদিনার চাটনি সহযোগে আতপ্ত শিক-কবাব, মনে হল বুঝি আমার জন্ম জন্মান্তরের ভালবাসার বস্তু।

পরে, অনেক পরে জেনেছিলাম, ওই যে সাবেকি শিক-কবাব যা মোতিমহল প্রস্তুত করে, সে রন্ধনশিল্পে উচ্চশ্রেণীর নয়। ভাল করে কিমা তৈরি করে, সামান্য মশলায় জরিয়ে খোলা আগুনে শিকে চড়িয়ে সেঁকা এবং পরিবেশনের পূর্বে তাওয়াতে ভাজা এই

শিক-কবাব ঈষৎ শক্ত হয়—একটু বা রবারের মতো। ঝাল মশলা উপযুক্ত হলে, স্বাদে নিশ্চয় আকর্ষক হয়। কিন্তু তখনও তো দিল্লির জুমা মসজিদের কাছে মসিটার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। শুধু মসিটা নয়, সেখানেই লব্ধখ্যাতি শিল্পী করিমের রেস্টুর্যান্ট। ওই রাস্তাটাই মহাভোজের নিমন্ত্রণ যেন। ওখানেই জওহার এবং ফ্লোরা। এঁদের কথা এক লাইনে লেখবার নয়। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র আলোচনা দাবি করতে পারেন। করেন না, তার কারণ এঁরা কৃতবিদ্য শিল্পী—সাধারণের নিন্দা-প্রশংসা, আলোচনা-সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এঁদের অসম্মান করব না। পরে এঁদের কথা বিশদ বলা যাবে।

আজ যার বিষয়ে লিখছি, সেটি ঠিক ভোজনশালা নয়, ভোজ্যের দোকান। পঞ্জাবিতে বলে ঢাবা। এ ঢাবাটি অবশ্য পঞ্চপাণ্ডবের জন্য। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। বসার দু-চারটি চেয়ার আছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীরা তাড়না না করলে বসেও খাওয়া যায়। স্থানটি অভিজাত। দিল্লির সর্দার প্যাটেল রোড ও কৌটিল্য মার্গের প্রায় সংযোগস্থলে, কৌটিল্যমার্গের ওপর দক্ষিণ দিকে। দোকানটির নাম অল কৌসর। কৌসর উর্দু বা ফার্সি শব্দ। কৌসর স্বর্গের নদীর নাম। ভারী উপযুক্ত নাম হয়েছে। সন্দেহ হয় দেবদেবীরা হয়তো ওই জাতীয় খাবার পছন্দ করেন, যে খাবার অল কৌসরে পাওয়া যায়। ছোট একটি সিমেন্টের ঘর—রাস্তা থেকে সামান্য পিছিয়ে খোলা জায়গার ওপর। নবীন তো, তাই অত সহবতের দায় নেই—নিয়ন আলো জ্বলে, সাইনবোর্ডও আছে। চিনতে কষ্ট হবে না। রান্নাবান্না সব বাইরে হচ্ছে, ওপরে আকাশের চন্দ্রাতপ। শীতকাল হলে বড় মজা হয়। বড় চুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে আহার করা যায়, সর্বশরীরে উষ্ণতার আরামও পাওয়া যায়। অধিকন্তু, শিল্পীর নৈপুণ্য চোখেও দেখা যায়।

এঁরা বেশি পদ তৈরি করেন না। যা-ও করেন, সব আপনার আস্বাদ করবার দরকার নেই। এক তীর্থেই যদি মোক্ষলাভ হয়, অন্য তীর্থে যাবার প্রয়োজন কী? এঁদের বিখ্যাত এবং প্রধান পদ কাকোরি কবাব। রূপে শিক-কবাবের সহধর্মী, স্বাদে শুধু ভিন্ন নয়, অন্য জগতের। রসনা স্পর্শ করলেই বুঝতে পারবেন, এতদিন শিক-কবাব নামের কোনও বস্তুতে আমরা আসক্ত ছিলাম কী করে? যখন সেই একই শহরে এমন শিক-কবাব রয়েছে?

কাকোরি নামটা আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে। সেই বিখ্যাত ষড়যন্ত্রের মামলা যার সঙ্গে কাকোরির নাম জড়িত—কাকোরি কন্সপিরেসি। সম্ভবত কাকোরি গ্রামের কোনও শিল্পী এই পদটির উদ্ভাবন করেছিলেন। নিশ্চয় এমনই তাঁর বিনয় ছিল যে কোনও প্রচার চাননি। ফলে কাকোরির অতি নিকটে লক্ষ্ণৌ শহরে একটি মাত্রই দোকান আমার জানা আছে, যেখানে এই কবাবের ঐতিহ্য এখনও জাজ্বল্যমান। লক্ষ্ণৌ-এর সেই গুণীর নাম বড়ে মিঞা বা শখাওত। তাঁর, কী-বলব, তপস্যার স্থান, না স্টুডিয়ো—জিমখানা ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে—একটা গ্যারেজ জাতীয় ঘরে। এ ছাড়া, আগেই উল্লেখ করেছি, এই ঘরানার প্রতিষ্ঠিত শিল্পী—করিম এবং মসিটা দিল্লিতে তাঁদের আসর পেতেছেন।

গুণীজনের নাম করা হচ্ছে যখন, আর একজন অনামা গুণীর উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। এই গুণীর নাম অবশ্যই ছিল, কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ মানুষের মন, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তাঁর স্থায়ী আবাস কোথায় তাও আমার জানা নেই। তাঁর সঙ্গে

আমার পরিচয় হয়েছিল মিরাটে—নৌচণ্ডীর মেলায়। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মিরাট শহরে মাসাবধিকাল এক মেলা বসে। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মেলাটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। এবং বিশেষ করে রাত নটা দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত মেলা জমজমাট হয়। আপনি রাত তিনটের সময় সেলুনে চুল কেটে, আমাদের ওই কবাবওলার দোকানে বিখ্যাত কবাব খেয়ে, চারটের সময় শাড়ি জামা সওদা করে, চা-পানান্তে ভোরে বাড়ি ফিরতে পারেন। চাই কী তার আগে একবার নাগরদোলাতেও বসতে পারেন। দোকান খুঁজতে আপনার অসুবিধা হবে না। অনেক কাপ, মেডেল সাজানো আছে—তাঁদের কৃতির জন্য নানা স্থান থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। এতদিনে মেডেলের সংখ্যা আরও বেড়েই থাকবে।

অল কৌসরের বয়স বেশি নয়। তিন চার বছর মাত্র। ইতিমধ্যেই গুণী সমাজে তার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়েছে। কাকোরি কবাবের বিশেষত্ব হল, তার স্পর্শ মাখনের মতো নরম। আপনাকে এক প্লেটে সাড়ে ছ'টাকায় দু খণ্ড কবাব দেবে। হাতে তুলতে গেলেই ভেঙে যাবে, এত পলকা। কী করে শিক থেকে আস্ত উদ্ধার করেছে ভেবে পাবেন না। ভাববার প্রয়োজনও নেই। স্পর্শ ছাড়াও এই কবাবের স্বাদ আপনাকে মুহূর্তে মোহিত করবে। আর এর সৌরভ মাদকতাময় মনে হবে—পরিচিত নানা সৌরভের সঙ্গে যে চুল্লির ওপর সামান্য সময়মাত্র সেঁকা হয়েছিল ওই কবাব, তার আবছা ঈষৎ ধোঁয়ার গন্ধ আপনাকে আচ্ছন্ন করবে। লাবণ্যময়ী, সুগঠিতা যুবতীর কণ্ঠস্বর সুললিত না হয়ে ঈষৎ ধরা ধরা, ইংরেজিতে যাকে বলে হাস্কি, হলে যেমন অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা হয়, সেই ধোঁয়ার গন্ধে আপনার অনুরূপ অনুভূতি হবে। ধোঁয়ার গন্ধের এই মাদকতা নতুন কিছু নয়, গুণীরা জানেন। আলমোড়ার বাজারে যে বালমেঠাই পাওয়া যায়, তার স্বাদের অভিনবত্ব খোওয়া ক্ষীরের ঈষৎ ধরা গন্ধ। কখনও গেলে অবশ্যই পরখ করে দেখবেন।

রুমালি রুটি পাবেন—৭৫ পয়সা। কিন্তু এক প্লেট কবাবে হবে না। আরও এক প্লেট নিতে হবে। টিক্কা কবাব পাওয়া যায়, সাত টাকা। একটু বেশি ঝাল। স্বাদ ভাল, অভিনব নয়। এঁদের শাহি বিরিয়ানি মন্দ নয়—১০ টাকা। দু জনের পক্ষে যথেষ্ট। শামি কবাব চার খণ্ড, ১০ টাকায় এক প্লেট, অর্ডার না করাই ভাল। অতি সাধারণ। আসলে আর কিছুই এখন আপনার রসনার প্রাণ স্পর্শ করবে না। চিত্ত তো, আগেই পলাতক হয়েছে।

রেজালা রেজিস্টার্ড

মোগলাই খানা ঠিক কাকে বলে আমার জানা নেই। বেশি মশলা এবং যথেষ্ট তেল-ঘি দিয়ে রান্না হলেই আমরা মোগলাই খাবার বলে থাকি। মনে হয় পিঁয়াজ এবং রসুন পর্যাপ্ত হলে মোগলাই খানা জাতে ওঠে। জাফরানও ঠিক মোগলাই কি না বলতে পারব না। কাশ্মীরে পণ্ডিতদের খানাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জাফরান থাকে, কিন্তু পিঁয়াজ-রসুন একেবারেই বর্জিত।

কলকাতায় আমরা যাকে মোগলাই খানা বলি, তার বিশেষ ভাষ্যকার হল রয়্যাল। চিৎপুরের সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপর গা-ছম্‌ছম্‌ আধা অন্ধকারে, অজানা মানুষের ভিড়ে রয়্যাল কোথায় আত্মগোপন করে আছে, অনেকে জানেই না। আসলে, সুখাদ্যের শিল্পীরা বড়ই প্রচার-বিমুখ। এঁদের গুণপনা আদি কাব্যের মতো মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, নাকি রসনা থেকে রসনায়? এঁদের অনেকে ভাল করে সাইনবোর্ড টাঙানোও নিম্নরুচির কাজ মনে করেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া? সে তো অক্ষমের আশ্রয়, অযোগ্যের প্রচার।

আশ্চর্য নয়, মোগলাই খানার আর একজন প্রবক্তাকেও অনেক রসিক জানেন না। এত বড় শহরে শুধু শ্রুতির আশ্রয় কি চলে? যদিও এঁরা, এই সাবির হোটেল, এই শহরে আছেন গত ৩৪ বছর। বড় রেস্তোরাঁয় দেখবেন, কত ছলাকলা, কত অলঙ্কার, কত রূপগুণের ফিরিস্তি। আর সত্যিকার শিল্পী, তাঁরা একটি বা দুটি পদেই তাঁদের রচনার কীর্তি ঘোষণা করে নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত। কে এল, কে সেই পরম বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হল জানবার জন্য তাঁদের সামান্যই আগ্রহ।

সাবির চাঁদনির অন্দরমহলে অখ্যাত এক রাস্তার ওপর, ধর্মতলা বা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ—দুদিক থেকেই পৌঁছনো যায়।

সাবির অবশ্য এখন একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে—সাবির হোটেল। অতি প্রশস্ত স্থান। দোতলা একটি বাড়ি। দুই তলাতেই ভোজনশালা। প্রায় ২২৫ জন বসবার চেয়ার টেবিল আছে। উত্তরপ্রদেশের সাবিরসাহেব ১৯৪৭ সালে এই রেস্তোরাঁর প্রতিষ্ঠা করেন। দ্য ভিঞ্চি শুনেছি হাজার কয়েক ছবি এবং নক্‌শা এঁকেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি ক্ষুদ্রাকার মোনালিসা ছবিটির জন্য। সাবিরেরও প্রায় তেমনি। ভোজ্য-তালিকা যদিও নাতিদীর্ঘ, কিন্তু প্রসিদ্ধির বেলায় একটি পদেই কিস্তিমাত করেছেন, কলকাতার রসিকসমাজকে মাতিয়ে রেখেছেন। পদটির নাম মটন রেজালা। নামকরণও নাকি সাবিরসাহেব নিজেই করেছিলেন। ভোজ্য-তালিকাতে দেখবেন রেজালার পাশে লেখা আছে 'রেজিস্টার্ড'। কার কাছে রেজিস্ট্রি করা কী বাবদে, আমাদের জানা নেই। জানবার প্রয়োজনও নেই। মনে রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়ে চিত্তে যার নিত্য আনাগোনা তার অন্যের কাছে রেজিস্ট্রি করা অবান্তর। তা ছাড়া রেজিস্ট্রি করে নামটা নিজস্ব করিয়ে সাবধানতার কাজও একেবারে অপ্রয়োজনীয় ছিল। সাবিরসাহেব থাকলে মনে করিয়ে দেওয়া যেত দ্য ভিঞ্চি কি তাঁর রং-তুলি তালাচাবি দিয়ে রাখতেন—যদি আর কেউ মোনালিসা এঁকে ফেলে?

সাবির দরজা খোলে ভোর পাঁচটায়, বন্ধ হয় মধ্যরাত্রে। তার মানে এই নয় যখন খুশি পৌঁছলেই আপনি রেজালার সুখস্বাদ পাবেন। যদি মধ্যাহ্নভোজনে যান, একটার মধ্যে পৌঁছনো বাঞ্ছনীয় এবং রাত আটটার পর গেলে রেজালা পাওয়া যাবে না। আরও যে ক'টি পদ এখানে পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু সব সময় পাবেন। যেমন চিকেন চাঁপ বা মটন চাঁপ—যথাক্রমে ৫.৫০ টাকা এবং ৩. ৫০ টাকা। কিন্তু চাঁপ যদি অভিলাষ করে থাকেন তবে ওস্তাদের কাছে চলুন—রয়্যালে। এই পদ দুটি বিশেষ করে শেষোক্ত যাদের বিশেষত্ব। সাবিরে চিকেন বিরিয়ানি চলনসই, ৫.৫০ টাকা। যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, শামি কবাব বা টিকিয়া কবাব পেতে পারেন, এক টাকা প্লেট, কিন্তু দাম যত আকর্ষক, স্বাদ নয়।

রেজালা দামে সামান্য—৩.৫০ টাকা কিন্তু স্বাদে অসামান্য এই পদটি প্রথম প্রকাশেই কলকাতার রসিকজনের মন ভুলিয়েছে। আমি অনেককে জানি যাঁরা সাবিরের আজীবন, অর্থাৎ ৩৪ বছর, সময়ে সময়ে রেজালার স্বাদ গ্রহণ করেন। কাউকে বলতে শুনিনি, নাঃ তেমনটি আর হয় না। আগে যা রেজালা ছিল... ইত্যাদি। একটি পুরু মাংসের টুকরো, চর্বির লেস লাগানো। স্বর্গীয় অফ-হোয়াইট রঙের হালকা ঝোলে ভাসছে—তার নাম রেজালা Regd. কী মশলা দিয়ে তার অপূর্ব স্বাদ এবং অনাঘ্রাত সুগন্ধের সৃষ্টি হয়, জানবার কথা আপনার একবারও মনে হবে না। বহুদূর থেকে ভেসে আসা জাফরানের সৌরভ পাবেন। মাংস তো আমরা কত রূপেই আহার করি, এখানে মনে হবে সেই মাংসের স্বাদও যেন একটা নতুন আয়তন পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের একটা লাইন মনে পড়ছে, সুখাদ্য বর্ণনায় একস্থানে তিনি লিখেছেন, মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক। আপনার অবশ্য সেই পরম মুহূর্তে এসব কিছুই মনে হবে না, কারণ আপনি তখন সুখসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন।

রেজালা অনেকে বিরিয়ানি সহযোগে পছন্দ করেন। আমার নিজের পক্ষপাত,

তন্দুরি রুটি। সাবিরের তন্দুরি রুটি একটু স্বতন্ত্র। অন্যত্র যা পাওয়া যায়—নান এবং তন্দুরি রুটি, সেই দুয়ের মাঝামাঝি। অর্থাৎ নানের মতো ফুলোফুলো, অথচ অত কোমলাঙ্গী নয়, গঠনে পরিচিত তন্দুরি রুটির ধারঘেঁষা। কেমন যেন সংকর জাতীয়। সেই কারণেই বোধকরি অধিক স্বাদ। শুনেছি ইংরেজ অপেক্ষা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীরা বেশি সুন্দরী হয়। তন্দুরি রুটির দাম নগণ্য, ৩০ পয়সা। যদি পরটা পছন্দ করেন, তাও পাবেন, এক টাকা।

অনেকে রেজালার স্বাদ রসনায় রেখে বাড়ি ফিরতে চান, তাঁরা মিষ্টান্নের দিকে নজর দেন না। বিপরীতপন্থীরা শাহি টুকরা, ১.৫০ টাকা বা ফিরনির আদেশ করেন, ১.২৫ টাকা। রেজালার সুখস্বাদ তাঁদের স্মৃতিতে থাকে। স্মৃতির মতো সুখের আর কী আছে।
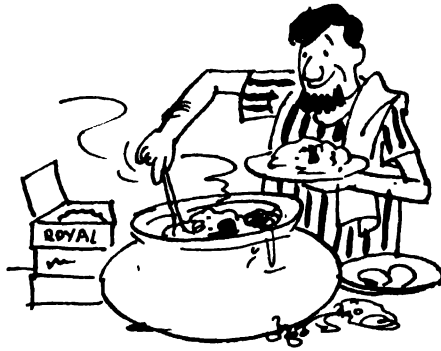
আপকি খাতির

বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লির সাম্রাজ্যের অধিকার পান হুমায়ুন। তাঁর সঙ্গে শের শা-র লড়াই লেগেই ছিল। শেষে ১৫৪০ সালে শের শা-র কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে, সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করে হুমায়ুনকে ভারত ছাড়তে হয়। দীর্ঘ ষোলো বছর পরে হুমায়ুন আবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারত-অভিযানে ফিরে আসেন। শের শা-কে পরাজিত করে সিংহাসনে বসেছিলেন ১৫৫৫ সালে। কিন্তু সিংহাসন তাঁর সইল না। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫৫৬ সালে হুমায়ুনের মৃত্যু হল। যুদ্ধে নয়, গুপ্তঘাতকের হাতে নয়, হুমায়ুন মারা গেলেন তাঁর পাঠাগারের ছাদ অথবা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, অপঘাতে। হুমায়ুন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। নিজের পাঠাগারে যাতায়াত ছিল, তাও স্পষ্ট। উল্লেখ আছে, হুমায়ুনের আফিমে অত্যধিক আসক্তি ছিল। হয়তো আফিমের ঘোরেই ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারী আকবরের বয়স তখন তেরো।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর, তাঁর বেগম দিল্লির উপকণ্ঠে হুমায়ুনের কবরের ওপর বিশাল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। হুমায়ুনস টুম্ব নামে খ্যাত সেই সৌধ মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন আজও অটুট। প্রকাণ্ড উদ্যানের মাঝখানে হুমায়ুনস টুম্ব। চারদিকে জ্যামিতিক নকশায় ফুলের কেয়ারিগুলি সাজানো। শীতকালে প্রতিদিনই স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের ভিড় থাকে। পাশেই যমুনা। সন্ধ্যায় অঞ্চলটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন মনে পড়বে এইখানেই সিপাহি যুদ্ধের সময়ে ১৮৫৭ সালে মেজর হাডসন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা এবং তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দি করেছিলেন। হুমায়ুনস টুম্ব যুগাবসানের প্রতীক।

সন্ধ্যায় বেশি লোকজন এদিকে আসে না। টুম্বে প্রবেশ সন্ধ্যার পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়।

বড় বড় গাছ হুমায়ুনস টুম্বের সামনের স্বল্পালোকিত স্থানটিকে আরও অন্ধকার করে রাখে।

বছর তিনেক আগে দিল্লি গিয়ে খবর পেলাম, হুমায়ুনস টুম্বের কাছে একটি নতুন খাদ্যশালা বসেছে। যিনি খবর দিলেন, ঠিকানাটা পুরো বোঝাতে পারলেন না। অথচ আমাদের কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, এই রকম প্রাণহরা কবাব ত্রিভুবনে হয় না। নাম বললেন, কাকোরি কবাব।

কাকোরি কবাবের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। বারো-চোদ্দ বছর আগে পঞ্চশীল মার্গ ও সর্দার প্যাটেল মার্গের সংযোগস্থলে একটি কবাবের ধাবা স্থাপন করেছিলেন আমার বন্ধু ইউনিস দেলভি। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তহরণ করেছিলেন রসিকদের। ধাবার নাম দিয়েছিলেন অল কৌসর। আমার বিশ্বাস অল কৌসর-ই সর্বপ্রথম দিল্লির সঙ্গে কাকোরি কবাবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

এবারে দিল্লিতে খবর পেয়েই আমরা নতুন খাদ্যশালাটির দিকে ধাবিত হলাম। নিশ্চিত ঠিকানা জানি না, তবুও। খোঁজখবর করার বা অপেক্ষা করবার ধৈর্য ছিল না। স্থির বিশ্বাস ছিল, অঞ্চলটার হদিস যখন পেয়েছি, নিশ্চয় অভীষ্টে পৌঁছে যাব।

আগেই বলেছি, সন্ধ্যার পর হুমায়ুনস টুম্বের বাইরের অঞ্চলটা ছায়া-ছায়া। লোকজনও নেই। দু-একজন পথচলতি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতেই কিন্তু হদিস পাওয়া গেল। তাঁরা ওই ধাবার নামের সঙ্গেও পরিচিত। বন্ধুটি বলেছিলেন ধাবার নাম: জনাব, আপকি খাতির। উর্দু ইডিয়াম অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়ায়—হজুর, আপনারই জন্য। ধাবার এমন মনোহর নাম আগে শুনিনি। সামান্য যেতেই অন্ধকারের মধ্যে একটা ছোট, আলোকিত ঘর দেখা গেল। মাথার ওপর সাইনবোর্ডে আলোকিত নাম: আপকি খাতির। বসে খাবার কোনও আয়োজন নেই। সামনে, দুপাশে খোলা জায়গা পড়ে আছে—সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহার করতে হবে। অথবা, গাড়িতে বসে, যেখানে পরিচারকেরা আপনার খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবে। মোঘলাই খানার ধাবা। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এদের ছাপানো খাদ্যতালিকা রয়েছে।

হুমায়ুনস টুম্ব নিজামুদ্দিনের নিকট। নিজামুদ্দিন ওয়েস্ট-এ আর-একটি কেতাদুরস্ত মোঘলাই খানার ভোজনশালা আছে, তার নাম করিম। তাদের খাদ্যতালিকা দীর্ঘ। আপকি খাতির-এ বারো-চোদ্দটি পদ পাওয়া যায়। তালিকার প্রথম পদটি ছাড়িয়ে দৃষ্টি আর এগুতে চায় না। কাকোরি কবাব। সুদুর্লভ এই বস্তুটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং আমার বন্ধু এই পদটিরই সুপারিশ করেছিলেন। সুতরাং অন্য কোনও দিকে নজর দেওয়া অনাবশ্যক এবং বাহুল্য মাত্র। দুখণ্ড কাকোরি কবাবের এক প্লেট ৩৫ টাকা ছিল তখন। তাই আদেশ করা গেল। আমরা গাড়িতে বসে থাকলাম।

অনতিকাল পরেই পরিচারক দুটি কাচের প্লেটে দুটি করে কাকোরি কবাব নিয়ে এল। সদ্য অগ্নিসংযোগ ছিন্ন হয়েছে, সন্তর্পণে স্পর্শ করতে হবে, স্থৈর্য রাখা যাচ্ছে না। সেই পরিচারকই একটি দুঃসংবাদ দিল, পুরনো অল কৌসর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুখের মুহূর্তে এমন হৃদয়বিদারক সংবাদ খুব কষ্ট দিয়েছিল। দিল্লিতে প্রকৃত কাকোরি কবাবের প্রবক্তা আর মাত্র একজনই থাকল, মহার্ঘ মৌর্য হোটেলের বিশেষ ভোজনশালা, বুখারা।

কাকোরি কবাবের উৎপত্তি সমরকন্দের বুখারা শহরে নয় বলেই আমার ধারণা। বিপরীত অভিযানে কেউ ভারত থেকে এই কবাব বুখারা নিয়ে গিয়েছিলেন কি না এবং কবে, বলতে পারব না। আমার জ্ঞান অনুসারে কাকোরি কবাবের উৎপত্তি, উদ্ভাবন বা আবির্ভাব লক্ষ্ণৌয়ের অদূরে কাকোরি গ্রামে। বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের গোপন কোনও সিন্দুকে এই কবাবের প্রকরণ সুপ্ত ছিল। শুনেছি নবাব নবাবজাদা এবং একালের রইসেরা কবাবের ইচ্ছা হলে কাকোরি থেকে বিশেষজ্ঞ আনাতেন। বছর ত্রিশ আগে লক্ষ্ণৌ জিমখানা ক্লাবের পিছনের গেটের সামনে বড়ে মিঞা তাঁর ধাবায় এই অপূর্ব ভোজ্য একদা পরিবেশন করেছিলেন, সে স্মৃতি, সে স্বাদ অবিনশ্বর। বড়ে মিঞা এখন গত হয়েছেন, তাঁর উত্তরপুরুষেরা ক্লার্ক অবধ হোটেলের পাশে নতুন রেস্টুর‍্যান্ট খুলেছেন, তাও পনেরো বছর হল। আমি সেখানে গিয়ে তৃপ্তি পাইনি।

আপকি খাতিরের দ্বারপ্রান্তে কবাবে জিহ্বা স্পর্শ করেই বুঝতে পারলাম, আসল রত্ন উপস্থিত হয়েছে আমাদের প্লেটে। কিছু কুচো পিঁয়াজ, সরু-করে-কাটা, সামান্য অম্ল একটা চাটনি, দুখণ্ড কাকোরি এবং একটি রুমালি রোটি (তিন টাকা) কী স্বর্গসুখ রচনা করেছিল, বোঝাতে পারব না! পরিচারক দ্বিতীয়বার যখন প্লেট নিয়ে এসেছিল, বলেছিল, অল কৌসরের বাবুর্চিই এখন এখানে এসেছে।

কাকোরি রূপ রস গন্ধ ছাড়া স্পর্শেও বিশিষ্ট। সূক্ষ্ম কিমার মাংসপিণ্ড বারো-চোদ্দ ঘণ্টা কোনও গোপন রসায়নে কোমল করে, বিবিধ অনুষঙ্গ সংযোজনের পর শিকে চড়িয়ে আগুনে সেঁকবার কাজটাও দেখার মতো। এই ভোজ্যটি তপ্ত না থাকলে গ্রহণ করা পাপ হবে। শিকে কবাবরূপে অবস্থানের পর মাত্র এক বা দুমিনিট খোলা আগুনের ওপর ধরা হয়। সব থেকে আশ্চর্য প্রক্রিয়া শিক থেকে এক-একটি কবাবকে অক্ষত অভগ্ন অবস্থায় শিকমুক্ত করা। পাচকেরা এই কাজটি এমন দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। হাতে একটু জল লাগিয়ে অবলীলায় অতিতপ্ত কবাবকে শিক থেকে খুলে প্লেটে পরিবেশন করেন।

প্রচলিত, পরিচিত শিক কবাব আর কাকোরি কবাব দুই ভিন্ন জগতের। একবার যথার্থ কাকোরির স্বাদ পেলে অন্য কবাবে মন উঠবে না।

বুফে ভোজন

গ্রীষ্মের এক দুপুরে তাঁরই দেওয়া শীতল জলের গেলাসে চুমুক দিতে যাচ্ছি, মিশনের স্বামীজি ব্যাকুল হয়ে নিরস্ত করলেন। বললেন, দাঁড়িয়ে জল খায় না বাবা। বসে খেতে হয়। ভিক্ষুকেরা দাঁড়িয়ে খায়।

স্বামীজির নাম জানি না, তাঁর সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হয়নি। হয়তো হবেও না, কিন্তু যে-কোনও নিমন্ত্রণে গেলে তাঁর কথা আমার অব্যর্থ মনে পড়ে : দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকেরা খায়।

সাহেবদের বুফে ডিনারের মতো নিমন্ত্রণ বাড়িতে দাঁড়িয়ে ভোজন করা এখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, বসে খাওয়া অপেক্ষা দাঁড়িয়ে খাওয়া অনেকের অধিক পছন্দ। নিমন্ত্রণের বাড়িতে বুফে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চিন্ত হই। টেবিলের পাতা ওঠবার আগেই দৌড়ে গিয়ে চেয়ারে বসবার প্রতিযোগিতা করতে হয় না। ইচ্ছামতো সময়ে ইচ্ছামতো খাবার নিয়ে নিরিবিলি এক কোনাতে দাঁড়িয়ে ভোজন সম্পন্ন হয়। ঠেলাঠেলি যে একেবারে হয় না তা নয়। ওটুকু সহ্য করা যায়। ভয় হয় কারও প্লেট আমার পিঠে লেগে গিয়ে আলিঙ্গনের চিহ্ন রেখে যাবে। অন্য অসুবিধাও অনেক। কোঁচানো লম্বা কোঁচা সামলে, এক হাতে প্লেট ধরে অন্য হাতে ছুরি-চামচ চালানো সহজ কর্ম নয়। নিরিবিলি দাঁড়াতে পারলে এদিক-ওদিক চেয়ে অবাধ্য মুরগির ঠ্যাঙকে হাত দিয়ে শাসন করতে পারি। প্রায়ই হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। কাগজে হাত মুছে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কাগজে যদি হাতের তেল-হলুদ সাফ করা যেত, তা হলে সাবানের আবিষ্কার হত না। বসে খেলে এই অসুবিধা থাকত না। কিন্তু সেখানেও হাত ধোওয়ার জন্য অপরিচ্ছন্ন বাটিতে কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ জলে হাত

ধোওয়া তৃপ্তির হয় না।

টেবিল-চেয়ারে বসে নিমন্ত্রণের ভোজন এবং দাঁড়িয়ে ভোজন—এসবই গত শতাব্দীর শেষার্ধের দান। তার আগে পঙতিভোজনই নিয়ম ছিল। মাটিতে কুশাসনে অথবা লম্বালম্বি পাট-করা শতরঞ্জিতে বসে কলাপাতায় কিংবা গোল করে সেলাই-করা শালপাতার ওপর ভোজ্য পরিবেশন হত। কাচ, চিনামাটির চল হয়নি। ব্যঞ্জন ও জল পরিবেশন হত মাটির বাটি এবং গেলাসে। হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা থাকত।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধটা আমাদের জীবনে একটা ছোট বিপ্লবের প্রতীক—তার আগের আর পরের অংশে মিল নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়াটার শেড (watershed)।

কুড়ি-ত্রিশ দশকের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ছোট একটা কম্বলের আসন পেতে ঠাকুমা বসেছেন। সামনে একটা মাঝারি মাপের বঁটি, পাশের ঝুড়িতে সদ্য বাজার থেকে আনা শাকসবজি। ঠাকুমার বঁটির সামনে এক গামলা জল। পাশে বসেছেন আমার মা। তাঁর সামনেও বঁটি এবং এক গামলা জল। কাকিমা আরেক পাশে। তিনি একটা থালার ওপর কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলি রাখছেন। পালং শাকের বান্ডিল থেকে শুকনো ও শীর্ণ পাতাগুলি আলাদা করে ফেলে দিচ্ছেন। তাঁর জিম্মায় এমনি সব প্রাথমির স্তরের কাজ। তিনি বাড়ির ছোট বউ, এখনও বড় কাজ পাননি।

মা এঁচোড় কাটতে শুরু করেছেন। কাটতে গিয়ে হাতে এঁচোড়ের চটচটে আঠা লেগে যাচ্ছে। একটা বিশিষ্ট পৌনঃপুনিক ভঙ্গিতে বঁটির পেছনে হাত মুছে আঠা সরাচ্ছেন হাত থেকে। আমি আর আমার ছোট বোন উৎসুক অধৈর্য বসে আছি, কখন মা ঝাঁটাকাঠির মাথায় কাপড়-জড়ানো মশালে বঁটির আঠা লাগিয়ে দেবেন। সেই আঠা মাখানো লাঠি দুপুরে রোদে শুকিয়ে রাত্রে আমরা মশাল জ্বালাব। ঠিক কতক্ষণ সে-মশাল জ্বলবে, বলতে পারি না, আমাদের মনে হত অনেকক্ষণ জ্বলে মশাল চারপাশ আলো করে রাখত।

থোড় যেমন দরকার, ফালি অথবা চাকা করে; 'মোচার ছোট্ট নৌকাটি' এবং 'লম্বা দেশলাই কাঠি' ফেলে দিয়ে মোচার খণ্ডগুলি কাকিমা মার কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। শশা কাটতেও একটা প্রথাগত পদ্ধতি ছিল। আনাজ কাটার সে-আয়োজন বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে কমতে শুরু করে, এখন, এই শতাব্দীতে প্রায় অদৃশ্য। বঁটি ব্যবহার শহরে প্রায় বিস্মরণে।

বাঙালির দৈনন্দিন ভোজনের আদিপর্বের এমন আরও অনেক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। এক শতাব্দীতে পরিবর্তন তো হওয়ার কথাই। দরকার নেই বঁটির, শিলনোড়া তো অবলুপ্ত প্রাণীর পর্যায়ে। নিস্তব্ধ দুপুরে আর 'শিলকাটাই' ডাক শুনতে পাই না। কিন্তু সবজি কাটার নিয়মকানুনগুলি তাদের সঙ্গে বর্জিত হলে আক্ষেপের অন্ত থাকে না। আনাজের চেহারা ও মাপের সঙ্গে যে ব্যঞ্জনের স্বাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, এটা আমার ধারণা, একমাত্র চিনারা এবং ভারতবর্ষের বাঙালিরাই জানত। ঝোল ঝাল চচ্চড়ি, ভাজা—এই সব রান্নাতেই আলু এবং অন্যান্য সবজির বিশেষ আকার নির্দিষ্ট। আলুর দমের আলু এবং ঝোলের আলু এক মাপের হয় না, রন্ধনে অতি-অপটু আজকের

যুবতীও জানে। সে জানে না যে তরকারি কাটা একদা প্রায় শিল্পের পর্যায়ে গণ্য হত। ভাজার জন্য সরু করে কাটা আলু যাকে মারাঠি পার্শিরা সল্লি বলে, সেটা সবার হাতে খুলত না। সব এক মাপের করে কাটার মধ্যেও মুনশিয়ানা ছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে কেটারার বা কনট্রাক্টরের নাম কেউ শোনেনি। বিয়ে শাদি অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রান্না করতে ডাক পড়ত উড়িয়া বা বাঙালি পাচকের। মস্ত কয়লার উনুন জ্বালিয়ে তারা সব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করত গৃহস্বামীর আদেশমতো। তাদের রান্না যে আমার কাছে বেশি আদরের ছিল, তার কতটা গুণের কারণে, আর কতটা পুরাতনের প্রতি মোহের দরুন, হলফ করে বলতে পারব না।

বাড়িতে কাজের আগের দিন ভিয়েন বসে যেত, বোঁদে-লেডিকিনি প্রস্তুত হত সেখানে, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ঘিরে থাকত, প্রবীণ কেউ, যাঁকে বিশেষজ্ঞ মনে করা হত, সর্বক্ষণ পাহারায় থাকতেন সেখানে।

আরও কিছুকাল পিছিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের কিছু বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। তিনি লিখেছেন, বাড়িতে কোনও যজ্ঞি হলে গিন্নিরা নিজেরা রাঁধতেন। যজ্ঞি শব্দটির সঙ্গেও এখন আমাদের অপরিচয়ের ব্যবধান। বাড়িতে কোনও উৎসব উপলক্ষে রান্নাবান্নার আয়োজনকে সেকালে যজ্ঞি বলা হত। সেই যজ্ঞিতে সব গিন্নিরাই যে সব রান্না করতেন তা নয়। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, যিনি যে-বিষয়ে পারদর্শিনী, তিনি সেই বিষয়ে রাঁধতেন এবং তাঁদের হাতের রান্না খেয়ে সকলে বিশেষ সুখ্যাতি করতেন। তখনও লুচির প্রচলন কম ছিল। অব্রাহ্মণের বাড়ির নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের জন্য অবশ্য লুচির ব্যবস্থা করতেই হত, কারণ ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতেন না।

বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে যিনি যে-পদটি ভাল রান্না করতে পারতেন, তাঁর ওপর ভার পড়ত সেই পদটি প্রস্তুত করার। তাঁদের রন্ধনে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে নিমন্ত্রিতেরা সহজেই বুঝতে পারতেন পদটি কে প্রস্তুত করেছেন।

আসলে যেটা পরিষ্কার হল তা হচ্ছে, বাড়ির মেয়েদের হাতে বাংলা রান্না তুঙ্গে উঠেছিল। এত দিন হয়ে গেল, সেই ধারাটা প্রায় বজায় আছে। তিনশো বছরের পুরনো শহরে এখনও উত্তম বাংলা রান্নার স্বাদ নেওয়ার জন্য বিশেষ কারও বাড়িতেই যেতে হয়। কোনও ভাল বাংলা খাবারের দোকান এ শহরে আজও পাওয়া গেল না। সুরুচি-র কথা বলবেন অনেকে, সেখানে যথার্থ বাংলা খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু যে রন্ধনের স্বাদের অভিজ্ঞতা আপনার মনে দাগ কাটবে, চিরকাল মনে থাকবে, তেমন নয়। সদ্য কিউপির নাম হয়েছে, মদিরা উঠে গিয়েছে কবেই, কিন্তু কিউপির আবেদন যত গর্জায়, তত বর্ষায় না।

পুরনো কালে কাঠের উনুনে মাটির হাঁড়িতে রান্না হত, তাতেও স্বাদের একটা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আসত। পঞ্জাবিদের বিখ্যাত সর্ষের শাক অথবা কালিদাল রান্নার জন্য শহরে বসে অভিজাতরা আজও কাঠের উনুনে, মাটির হাঁড়িতে রান্না-করা ঠাকুমার রান্নার স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে থাকেন।

এখন নড়বড়ে টেবিলে চিনামাটির থালায়, কাচের গেলাসে যে খাবার পরিবেশন হয় তার সঙ্গে যুদ্ধপূর্বের খাবারের মিল নেই। সর্বক্ষণ আমার মনে পড়ে, শাকভাজা অবশ্যই

ছোলা দিয়ে, পটলভাজা, বেগুনভাজা—লম্বা ফালি করে কাটা এবং কুমড়োর ছক্কা অদৃশ্য। ছেঁচড়ার কথা কেউ বলেও না।

অতুল সুর মশাই লিখেছেন যে, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ির নিমন্ত্রণে মাছ এক প্রকারের হত—মাছের কালিয়া। অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়ির নিমন্ত্রণের ফর্দে পোলাও ও মাংস যুক্ত হত। মিষ্টান্নের সংখ্যাও বাড়ত। আরও বলেছেন, ভোজনের সময় পরিবেশনকারীরা দফায় দফায় আসত সব রকম ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে। তার মানে, আগেকার দিনের বিয়েবাড়িতে যে যত খেতে চাইত, সে তা পেত।

ড. সুর ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, এখনকার কেটারারদের মতো অতি দ্রুত পরিবেশনে একটা ব্যঞ্জন যেমন একাধিকবার পাওয়া যায় না, তখন তেমন ছিল না। নিমন্ত্রিতদের তৃপ্তিবিধানই নিমন্ত্রণকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

বুফে ভোজনের স্বপক্ষে এখন তা হলে বলতেই হয়, এখানে ইচ্ছামতো ভূরিভোজন সম্ভব। নিমন্ত্রণকর্তার আপনাকে আদর করে ভোজন করানোর প্রশ্নই উঠছে না। তিনি উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, আপনি নিরিবিলি নিশ্চিন্ত মনে ভোজন সম্পন্ন করতে পারেন।

বাঙালির খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের সামান্য কিছু আভাস দেওয়া হল। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, যদিও এখনও আমরা মাছ-ভাত আশ্রিত, ভাত আর মাছের ঝোলে আমাদের পরিতৃপ্তি, বাড়তি মাছের ঝাল হলে তো কথাই নেই।

কার জন্য আক্ষেপ করব

আমার বাল্যকালে চা-পান বারণ ছিল ছোটদের। অবশ্য সব বাড়িতে যে চায়ের রেওয়াজ ছিল তা নয়। যে পরিবারে চায়ের প্রচলন হয়েছে তখন, তাঁরা নিজেদের আধুনিক, অগ্রসর মনে করতেন। আমাদের বাড়িতে চায়ের চল ছিল না। কিন্তু কর্তারা "আমরা চা খাই না" বাক্যটি এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন যে তার অন্তর্নিহিত উল্টো চালিয়াতি, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইনভার্টেড স্নবারি' বুঝতে কারও অসুবিধা হত না।

আমরা চাতকপক্ষীর মতো ধূমায়িত স্বর্ণাভ চায়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছি লোভার্ত চোখে। কিন্তু মদ্যপানের সমতুল্য গর্হিত কার্যে লিপ্ত হবার সাহস হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চায়ের প্রশস্তি করেছিলেন একটি কবিতায় ত্রিশের দশকে : কাথলিতল-জল টগবগ উচ্ছল। চা-স্পৃহ-চঞ্চল চাতকদল চল। চল চল হৈ। ইংরেজ কবি এডমন্ড ওয়েরার চায়ের স্তব লিখেছিলেন তিনশো বছর আগে, ১৬৬২ সালে পৃথিবীর সাহিত্যে চায়ের উল্লেখ নাকি হাজার বছর আগে থেকেই চলেছে। যে পানীয় উজ্জীবিত করে, কিন্তু মত্ত করে না।

তবুও প্রথম চা স্পর্শ করেছিলাম কৈশোরে। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চা-পানের বিরুদ্ধে মস্ত আন্দোলন শুরু করেছেন। সে আন্দোলন অবশ্য খুব গভীর বা ব্যাপক হয়নি। কর্তারা তখন চা ধরেছেন, দেখতাম চা-পানের সময় বিদ্রূপের হাসি মিশিয়ে ওই আন্দোলনের আলোচনা হত। খুব যে বড় তর্ক হত তাও নয়। স্টর্ম ইন এ টীকাপ, কথাটা ইংরাজিতে কোথা থেকে এসেছে জানি না। ইংরেজরাই বৈকালিক চায়ের আসরের প্রবর্তন করে। অপরাহ্ণে চা, সূর্যাস্তের পর হুইস্কি।

ডাচেস অফ বেডফোর্ড প্রবর্তন করেছিলেন বৈকালিক চা। সেই অভ্যাসকে অলঙ্করণ করে ইংরেজরা একটা চায়ের আসর করেন, যার নাম ক্রিম টী। এই আসরে চা-পান হয় প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে। সুদৃশ্য টেবিলে মূল্যবান চা-এর বাসন সাজিয়ে সবাই অপরাহ্ণ উদ্‌যাপন করেন। চা ব্যতীত আর কী থাকবে টেবিলে তাও বিধিবদ্ধ, নড়চড় হবার জো নেই: স্কোন (পাউরুটি আর কেকের মাঝামাঝি) মাখন, স্ট্রবেরি জ্যাম আর ডেভনশায়ার ক্রিম।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দেয় জাপানিরা। তাদের 'চা নো ইয়ু', ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি টী সেরিমনি, আমাদের পূজাপার্বণের মতো নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা। চা-পান অনুষ্ঠানের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সেই সব নিয়মকানুনের সামান্য অন্যথা হবার উপায় নেই। চায়ের কাছে আপনাকে পৌঁছতে হবে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। চা-পান অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট ঘরটির দরজা তাই ছোট, যাতে আপনাকে মাথানত করে প্রবেশ করতে হয়। আনুগত্য প্রকাশের পর আপনি কোন মুদ্রায় বসবেন, কে কী ভাবে কেমন পাত্রে চা ঢালবে সবই কয়েক শতাব্দী ধরে পালিত নিয়মে বাঁধা আছে। জাপানি চা খেতে আপনার ভাল লাগবে না, কিন্তু অনুষ্ঠানটি তার বর্ণ ও মাধুর্যে আপনাকে মোহিত করবে।

চায়ের বিশিষ্ট স্থান আমেরিকায়। অথবা, বলা ঠিক হবে, চায়ের বিশিষ্ট স্থান আমেরিকার ইতিহাসে। বিলেতি প্রতিষ্ঠান জন কোম্পানি আমেরিকায় চা রপ্তানি করত। তাদের একাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইংরেজরা টী অ্যাক্ট বা একটা চা-আইন পাস করে। প্রতিবাদে বস্টন শহরে একদল আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে তিন জাহাজ চা-এর পেটি ভেঙে জলে ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনা ইতিহাসে বস্টন টীপার্টি নামে চিহ্নিত হয়েছে। ইংরেজদের শাসন-মুক্ত করবার জন্য আমেরিকার বিপ্লব এই ঘটনার ফলে অনেক ত্বরান্বিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা তাই বস্টনের টীপার্টিকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে গণ্য করেন।

আমাদের দেশে চায়ের তেমন কোনও যুগান্তকারী ভূমিকা নেই। 'চা-পান, না বিষপান' আন্দোলন কবেই মুছে গিয়েছে। শুনেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই ওই 'ঘৃণিত' অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলেন না। এখন চা ছাড়া আমাদের সকাল যেন শুরু হতেই চায় না।

দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হবার পর হঠাৎ কলকাতায় অনেক 'চায়খানা'-র পত্তন হয়েছিল। প্রধানত চা-পানের স্থান, কিন্তু সেগুলিতে রেস্টুর‍্যান্টও থাকত অনেক ক্ষেত্রে। চৌরাস্তার মোড়ে সেই দোকানগুলির নাম ছিল : 'সাঙ্গুভ্যালি রেস্টুর‍্যান্ট'। কেউ কেউ লিখতেন সেঙ্গুভেলি। এই দোকানগুলির বিশেষত্ব ছিল এদের চা।

সুগন্ধময় এবং সুস্বাদ। লন্ডনের লায়ন্স কর্নার হাউসের মতো এই সব সাঙ্গুভ্যালির অকস্মাৎ কোথা থেকে উদয় হল জানি না। সাঙ্গু নামক ভ্যালিটি বা উপত্যকাটি কোথায় আদৌ আছে তাও জানি না। সব থেকে আশ্চর্যের কথা সাঙ্গুভ্যালিরা যেমন নিঃশব্দে কলকাতা দখল করেছিল, বছর দশেকের মধ্যে তারা আবার তেমনি নিঃশব্দেই কলকাতা ছেড়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, তাও জানি না। জীবনে কত সুখই তো এমনি নিঃশব্দে বিদায় নেয়। কার জন্য আক্ষেপ করব?

বাঙালির স্বাদবদল

যে সহস্রাব্দের সূচনায় এই রচনা, তার সঙ্গে বাঙালি জীবনের কোনও প্রকৃত সম্পর্ক নেই। আমাদের তো সবে ১৪০৬ বঙ্গাব্দ চলছে, নতুন সহস্রাব্দের এখনও প্রায় ছশো বছর দেরি আছে। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির আবির্ভাব না হলে, জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারের নতুন সহস্রাব্দ নিয়ে এত মাতামাতিও হত না। তবে, আমরা বাঙালিরা 'ধর্মেও আছি, জিরাফেও ....।'

সে কারণেই বাংলা খাবারের কী বিবর্তন হল এই বিদায়ী সহস্রাব্দে তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। হাজার বছর আগে বাঙালির কোন ভোজ্যে রুচি ছিল, সাধারণ মানুষের সাধারণ খাদ্য কী ছিল তার কোনও লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুকুমার সেন এবং নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীনকালে সাধারণ বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের খবর পাওয়া যায় প্রাকৃত পৈঙ্গলে। সেই বিবরণের রচনাকাল চতুর্দশ শতকের শেষদিকে। অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস মাত্র ছ'শো বছরের পুরনো। তার আগে খাদ্য সম্বন্ধে বাঙালির রুচি ও অভ্যাসের কোনও হদিস পাওয়া যায় না। সেই সময়ে বাঙালির রুচি অতি সরল ছিল। প্রাকৃত ভাষার শ্লোকটি আজও বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের গোড়ার কথা।

ওগ্গর ভত্তা রম্ভও পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সঞ্জুত্তা মোহিলি মচ্ছা নালিচগচ্ছা দিমুই কন্তা খায় পুনবন্তা।

কলাপাতায় গব্য-ঘৃত সহকারে গরম সফেন ভাত দুগ্ধসংযুক্ত, মৌরলামাছ নালিতা শাক কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান খাচ্ছে।

এই শ্লোকটির আগে দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি শ্রীহর্ষের মৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহ-

ভোজের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে তো বিশেষ উৎসবের নিমন্ত্রণ। সেখানে কিঞ্চিৎ ঘটাপটা হবেই। এবং হয়তো কবিও খানিকটা বাড়িয়ে লিখেছেন।

আমরা বাঙালিরা সচরাচর ঈষৎ দম্ভের সঙ্গে বলে থাকি, বাঙালির মতো খাদ্য বিশারদ এবং ভোজনরসিক আর কেউ নেই। আর যাই হোক, ফেনাভাত আর মৌরলা মাছ নিয়ে গর্ব করা যায় না। তার মানে বাংলা রন্ধন শিল্পের উন্নতি আরও পরে হয়েছে। মোটামুটি বলা যায় পাক রাজেশ্বরে যে সব ব্যঞ্জনের প্রস্তুত প্রণালী আছে, তাই নিয়ে যথেষ্ট গর্ব করা অন্যায় নয়। পাক রাজেশ্বরের রচনা কাল সম্ভবত পঞ্চাদশ শতাব্দীতে। বইটি দুষ্প্রাপ্য। আমি চোখে দেখিনি, কোন পুস্তকশালায় এই বই-এর কপি আছে, তাও জানি না। তবে বিবিধ বিদ্বজ্জনের রচনায় পাক রাজেশ্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়েছি।

রন্ধনকলা নয়, তৎকালীন বাঙালির ভোজনের বিবিধ পদের বর্ণনা পাই কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের রচনায়। সেখানে খুল্লনা অতিথি আপ্যায়ণের জন্য কোন কোন পদ রচনা করেছিলেন তার বিবরণ আছে। সব ক'টি পদই যে বাঙালির ভোজনপাত্রে মাঝে মাঝে উপস্থিত হত, তা হয়তো নয়। কবির কল্পনা তো রেসের ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগতি।

মুকুন্দরামের কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। মুকুন্দরামের দেড়শো বছর পরে এলেন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি যে সব পদের উল্লেখ করেছেন মজুমদার পত্নীর রন্ধনের তালিকায়, সে সব সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল, কিন্তু তিনি সবসুদ্ধ তেইশটি নিরামিষ ব্যঞ্জন এবং ত্রিশের অধিক মাছের পদের উল্লেখ করেছেন। সেই সব পদের অল্প ক'টি আজও আমাদের ভোজনপত্রে উপস্থিত হয়। কবির কল্পনার একটু উদাহরণ দিই।

মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাকা৷৷
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়৷৷

এই পদগুলি আমাদের আজও পরিচিত।

এর পরে ভোজ্যদ্রব্যের বর্ণনা আর কোথাও পড়ি না। বাঙালির কী ভোজ্য ছিল তখন, তাও আমাদের অজানা। কিন্তু বাঙালির খাদ্য-দিগন্তের পরিধি যে বিস্তৃত ছিল, তার প্রমাণ পাই কয়েকটি রন্ধনশিল্প অর্থাৎ পাকপ্রণালীর ওপর লেখা বই থেকে।

হয়তো আগেও কোনও এমন বই প্রকাশিত হয়েছিল। আমার প্রথম পরিচয় প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর বইয়ের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, নানা শিল্পে তাঁর অনুরাগ। পরিশীলিত মনের মানুষ ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী। তাঁর বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দে। পরপর আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশ পায়। এ তো রান্নার বই নয়, রান্নার অভিধান বা কোষগ্রন্থ। কী নেই সেখানে। প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখছেন প্রত্যেকটি পদ তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করে, সমঝদার মানুষদের খাইয়ে, তবে পদগুলির পাকপ্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রজ্ঞাসুন্দরীর নিরামিষ রান্নার বইটিতে ৬৫৮ পদের পাকপ্রণালী লেখা আছে।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই প্রকাশের সাত বছর আগে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের তিন খণ্ড পাকপ্রণালী বেরিয়ে গিয়েছে। নতুন সংস্করণে সে বই আজও পাওয়া যায়। বিপ্রদাস আমিষ নিরামিষ মিলিয়ে প্রায় ৬০০ পদের প্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। তার

অধিকাংশের সঙ্গে আমরা শুধু নামেই পরিচিত। অনেকেরই নাম কোনওদিন শুনিনি। রসনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এমন ব্যঞ্জনের সংখ্যা অল্প।

গত একশো বছরের প্রথম পদ বাদ দিয়ে বাকি ৬০/৭০ বছরের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে আমার সমসাময়িক অনেকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে।

আমরা কথায় বলি মাছে-ভাতে বাঙালি। এই শতাব্দীতে তার সেই গর্বিত পরিচয় অক্ষুণ্ণ। এখনও বাঙালির প্রথম প্রেম মাছ। সহজ ও জটিল দুই প্রক্রিয়াতে বাঙালির প্রিয় মাছের পদগুলি রান্না হয়। সে মাছের তালিকা বৃহৎ। বস্তুত পুরনো দিনের তুলনায় আজ বাঙালি অনেকরকম মাছ খেতে শিখেছে। সব মাছ যে খেতে পাই, তাও নয়। অনেক মাছ এই শতাব্দীতে আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। চিংড়ি মাছ জাপানি ও আমেরিকানদের দৌরাত্ম্যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। শুধু দৈনন্দিন ভোজনের থালায় নয়, বিয়ে বৌভাত অন্নপ্রাশনের উৎসবের আমন্ত্রণেও আর চিংড়ি মাছ দেখা যায় না। বাংলা রচনায় স্বাদের বৈচিত্র্য, নানা মশলা সহযোগে তার বিবিধ সুগন্ধ, আমাদের দৈনন্দিন ভোজনের ক্ষুদ্র তালিকা আজও বাঙালিকে আমোদিত করে। কিন্তু দিনকাল ভাল নয়, সব ভাল জিনিস মহার্ঘ, তাই বাঙলির ভোজনধারা দিনে দিনে বদলাচ্ছে।

ইলিশ মাছের কথা বলি। মাছটি ক্রমশ দুষ্প্রাপ্যে-র পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, বাংলাদেশের মাছ আমদানি খবরের কাগজের বাইরে যায় না। এই বাংলার ইলিশ মাছ নাকি আর সমুদ্র থেকে নদীতে আসতে চায় না। দামও এত চড়া যে, আমাদের ভোজনপাত্রে তার উপস্থিতি বিশেষ দিন বলে চিহ্নিত হয়ে থাকছে। নীহাররঞ্জন লিখেছেন, বাঙালির খাদ্যপ্রীতি আজকের নয়। প্রাচীনকালেও বাঙালির মাছের প্রতি পক্ষপাত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যেও ইলিশ মাছের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত বলি, 'পাকপ্রণালী'তে মাছের পঁয়তাল্লিশটি ব্যঞ্জনের মধ্যে ইলিশের চারটিমাত্র পদ আছে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে ফিশফ্রাই উদ্ভাবন করে বাঙালি ভেটকি মাছের ফ্রাই খেতে শিখেছে। শতাব্দী পূর্বে পাকপ্রণালীতে ভেটকি মাছের ফ্রাই রন্ধনপ্রকরণ আছে। এখন ফ্রাই তো নিমন্ত্রণ বাড়ির ভোজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যদি না ফিশ মুনিয়ের, তন্দুরি ফিশ ইত্যাদি বিজাতীয় ব্যঞ্জন পরিবেশন না হয়।

বাঙালির মাংসপ্রীতির সঙ্গে আমার বাল্যকালেই পরিচয় হয়েছিল। অনেক সংসারে মাংস-রন্ধন বারণ ছিল। মধ্যবিত্তের বাড়িতে ক্রমশ সপ্তাহে একদিন মাংস রান্না শুরু হল আমার শৈশবে। মুরগি গত যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বাঙালির হেঁসেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মুরগির ডিমও স্বাগত ছিল না। দ্বিতীয় যুদ্ধান্ত পর্যন্ত আমাদের হাঁসের ডিমের মামলেটেই তুষ্টিবিধান করতে হত।

গত অর্ধশতাব্দীতে বাঙালির ভোজনধারায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মুরগি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, ছাগমাংসের থেকে তার দাম কম। সন্দেহ হয় আহারে বৈচিত্র্য ক্রমশ কমে আসছে। যতদিন গৃহবধূরা গৃহকর্মে লিপ্ত ছিলেন, অফিস-আদালতে ট্রাম-বাসে তাঁদের গতি অবাধ হয়নি, ততদিন বাঙালি সংসারে রান্নার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, অনাসক্তি ও অমনোযোগে তা যে কমে আসবে তাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু একটা প্রায় বৈপ্লবিক

পরিবর্তন আমাদের আশ্চর্যান্বিত করেছে।

আমরা চিরকাল ভাতের ভক্ত। আটার রুটি সম্ভবত এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে সন্তর্পণে গৃহস্থালীতে প্রবেশ করেছিল। এখনও বাঙালিরা দুবেলা রুটি খায় না, কিন্তু বহু গৃহস্থালিতে একবেলা রুটির চল হয়েছে। শুরু হয়েছিল, রেশন চালু হবার সময়ে, শুধু চালে কুলাত না তখন। কিন্তু চাল সহজলভ্য হবার পরও বাঙালির সদ্যোলব্ধ রুটির প্রতি রুচি ক্ষয় হয়নি। কুড়ি বছর আগেও এই ধারাই চলেছিল। বিপণনের এক আশ্চর্য কৌশলে উপস্থিত হয় ম্যাগি নুড্‌ল। সমাজতাত্ত্বিকেরা নিশ্চয় একদিন লিখবেন, এই একটি উপকরণ অতি সহজেই বাঙালির মন কেড়ে নিয়েছিল। বৈকালিক আহারেও আটা-ময়দা পথিপার্শ্বে বিবর্জিত হল, এখন সর্বত্র নুড্‌ল। দুপুরে, অপরাহ্নে, রাত্রে। বাঙালি তার জটিল সূক্ষ্ম বিচিত্র রন্ধনধারার বাইরে উপকরণটিকে পেয়ে সাগ্রহে গৃহে স্থান দিয়েছে।

শুধু গৃহে নয়। বাইরে বেরলেই মোড়ে মোড়ে নুড্‌ল ও রোলের স্টল আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমাদের রুচি বদলেছে, বদলাচ্ছে।

কলকাতার কলেজে পড়তে এসে প্রথম চিনা রেস্টুর‍্যান্টের নাম শুনলাম। তার আগে পিঠে প্রকাণ্ড বস্তায় বাঁধা চিনা সিল্ক নিয়ে আমাদের মফস্বল শহরে এক চিনা ফেরিওয়ালাকে দেখা যেত বছরে দু-চারদিন। কলকাতায় দেখি চিনেরা দাঁতের চিকিৎসা করে, আর তাদের অসংখ্য জুতোর দোকানে জুতো কিনতে গেলে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, যিনি লোকলজ্জার মাথা খেয়ে অনায়াসে প্রার্থিত দামের সিকিভাগ প্রস্তাব করতে পারতেন। জুতো জোড়া শেষ পর্যন্ত অর্ধেক বা তারও কম দামে সওদা হত।

বন্ধুর কাছে শুনলাম নিকটের চাং ওয়া নামের ভোজনশালায় এক বিখ্যাত পরমসুস্বাদু পদ পাওয়া যায় তার নাম চাউ চাউ। অনেকদিন ধরেই বাসনা ওই পরম লোভনীয় পদটি পরখ করবার। কিন্তু আমাদের বয়স কম, উচ্চশ্রেণীর ভোজনশালায় আহারে অভ্যস্ত নই। যেতে সাহস হয় না। তবুও একদিন প্রবেশ পথের স্প্রিং লাগানো হাফ-দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়েছিলাম। চেয়ারে বসবার পর জিজ্ঞাসু পরিচারককে দু পাত্র চাউ চাউ আদেশ করলাম। পরিচারক ভোজনতালিকা এনে দিতে দেখেছিলাম চাউ চাউ নামে কোনও পদ নেই। চাউমিয়েন আছে। সাহস করে তারই দু পাত্র অর্ডার করা গেল।

পরিচারক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, চাউমিয়েন দু পাত্র? সে তো অনেক হবে। এক পাত্র চাউমিয়েন যথেষ্ট হবে দু জনের জন্য। আর কী নেবেন?

আর কী নিয়েছিলাম মনে নেই। মনে আছে দুই প্লেটে যে চাউমিয়েন নামক পদার্থটি এসে পৌঁছল সেই অবাধ্য পিচ্ছিল খাদ্যবস্তুটিকে কাঁটা ছুরির শাসনে আনা কত কঠিন হয়েছিল। তারপর বহুদিন চিনা ভোজনশালায় যাইনি। চাউ চাউ বা চাউমিয়েন স্বাদেও লোভনীয় ছিল না।

নিকটেই আর একটি চিনা ভোজনশালার নাম শুনেছিলাম। সে নাকি আরও অভিজাত, নানকিং। সেখানে যাবার দুঃসাহস হয়নি। রহস্যময় চায়না টাউনের মধ্যে অবস্থিত ওই ভোজনশালায় পরে শুনেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কখনও যেতেন। চিনা

ভোজ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে সময় লেগেছিল। এখন দেখছি সেই চিনা সহজভোজ্যটি কত সহজে বাঙালি ভোজ্য তালিকায় স্থায়ী সুরক্ষিত আসন গ্রহণ করেছে। চিনা ভোজনশালার সঙ্গে ক্রমশ সদ্ভাব হতে লাগল। পিপিং এবং ক্যাথেতে যাতায়াত হত। বাঙালিরা মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে সেখানে যেতেন। ষাটের দশকে যখন তা'ফা সুন প্রতিষ্ঠিত হল পুরনো চায়না টাউনে, তখন নতুন স্বাদের চিনা ভোজ্য বাঙালি রসনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। চিনাদের কলকাতার আগমনের প্রায় তিনশো বছর হল। প্রথম দুশো বছর তারা বাঙালি রসনাকে আপ্লুত করেনি। এখন তো পাড়ায় পাড়ায় চিনা ভোজনশালা। নতুন একটা রন্ধনধারাই তৈরি হয়ে গিয়েছে, তাদের অত্যাশ্চর্য ভারতীয় চিনা খাবার। চিনা ভোজন শাস্ত্রের ভাঁড়ারে বহু রন্ধনধারা আছে। ভারতীয় চিনা ভোজ্য সেখানে নতুন সংযোজন। প্রসঙ্গত বলতে পারি, চিনা ভোজ্য কলকাতাতেই প্রথম জন-প্রশস্তি পায়। এখন তারা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তৃত।

উত্তর ভারতীয় মূল্যবান ভোজনশালাগুলিতে মুষ্টিমেয় বাঙালি দেখা যায়। কিন্তু ট্যাংরার চিনা রেস্টুর‍্যান্টে বাঙালিরাই প্রধান।

তন্দুরি পাকধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পঞ্চাশের দশকে। বস্তুত আজকের ভারতবর্ষে তন্দুরি ধারা পৌঁছেছিল ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তান হওয়ার পর যখন সীমান্ত প্রদেশ পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি থকে উৎপাটিত হিন্দুরা দিল্লি এসে পৌঁছলেন।

কাঠ এবং কয়লার উনান পরিত্যক্ত হওয়ায় পরম স্বাদিষ্ঠ, বিশেষত শীতকালে, বেগুনপোড়ার চল প্রায় উঠে গিয়েছে। পাঞ্জাবি বেগুনভর্তা এখন বাঙালি রসনাকে সান্ত্বনা দেয়। চিকেন ভর্তা যদিও অন্য প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাও এখন বাঙালির প্রিয়।

এই পৃথিবীতে সব রীতি, অভ্যাস বদলায়। সব দেশে সর্বকালে তাই হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও স্বাদ, সুবাস, স্পর্শ আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ আর খুঁজে পাবে না মনে হলে কষ্টই হয়।

পশ্চিমবঙ্গের একটি পরম মনমোহন পদ ছিল। ঝিঙে পোস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেটিও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় পোস্ত ছাড়া দিনগত ভোজন কল্পনা করা যেত না। অজ্ঞাত কোনও কারণে পোস্তর দাম আকাশের দিকে হাত বাড়ানোয় পোস্ত সাধারণ মানুষের ভোজনপাত্র থেকে বিদায় নিয়েছে। বড় হোটেলে বাংলা খাবারের সঙ্গে কদাচ আলুপোস্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা পোস্তর জন্য কেমন করে আলু কাটতে হয় জানেন না। এখন আলুপোস্ত খেলে হলে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বারে বাঙালিদের জন্য হোটেলে যেতে হয়। তাঁরা সাইনবোর্ডে লিখে রাখেন আলুপোস্ত।

পোস্তর সঙ্গে একটি আবশ্যিক অনুপান ছিল, বিউলির ডাল। তবু ভাল, বাঙালিরা এখনও পাঁচরকম ডাল খেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে এত বিভিন্ন ডাল খাওয়ার রেওয়াজ নেই। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মাত্র একটি ডালই চলে, অড়হর ডাল। ভেবে কিনারা পাই না কেমন করে ওই বিশাল জনসমূহ গত চার-পাঁচ হাজার বছর একমাত্র ওই ডালটিই রন্ধনশালায় রেখেছেন। অন্য কোনও ডালের সঙ্গে তাঁদের আদৌ পরিচয় নেই।

উত্তর ভারতেও যে খুব ডালের প্রচলন আছে, তা নয়। এখন পঞ্জাবি কালিদাল, আস্ত বিউলির ডালে প্রস্তুত পদটি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। আর অড়হর ডাল, কদাচ মুগ ডাল এবং ছোলার ডাল। শুধু বিভিন্ন ডাল নয়, ভাল রান্নার প্রণালীতে অভ্যস্ত বাঙালিদের রুচি শেষ পর্যন্ত কালিদালে নেমে আসবে, এমন আশঙ্কা হয়। ডাল সাঁতলানোর বৈচিত্র্যে স্বাদ গন্ধ কত মনমোহক হতে পারে, মনে হচ্ছে বাঙালি সেটা ভুলে যাচ্ছে।

সেই সময়, যখন বাঙালিরা বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের বিশাল ভূখণ্ডকে মাদ্রাজ বলত, এবং আজকের চার ভিন্ন ভাষাভাষী সবাইকে মাদ্রাজি বলে জানত, সেই সময় আমি কাশীতে পড়তে গিয়েছিলাম। চল্লিশের দশকের শুরুতে। যুদ্ধ লেগে গিয়েছে, তার আঁচ তখনও ভারতবর্ষে পৌঁছয়নি। সেখানেই আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল দোসার সঙ্গে, যাকে কোনও অজ্ঞাতকারণে বাঙালিরা ধোসা নামে সম্বোধন করেন।

কলকাতায় তখন একটি খাদ্যশালা সম্ভবত সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ওপর, যার নাম কোমলাবিলাস। সেটি প্রবাসী স্বভোজ্যে বঞ্চিত মাদ্রাজিদের জন্য। সেখানে দোসা, ইডলি প্রভৃতি অপরিচিত পদ পরিবেশন করা হত। কোনও বাঙালি তখনও সেখানে গিয়েছেন বলে শুনিনি। আমি যাইনি, আগ্রহও হয়নি আমার। দু-এক বছরের মধ্যেই হেস্টিংস স্ট্রিটে এটর্নি পাড়ায় আর একটি দক্ষিণী দোসা ইডলির দোকান হয়েছিল। বোধহয় আজও আছে।

কাশীতে দক্ষিণীভোজ্য আমার ভালই লেগেছিল, আমাদের সরুচাকলি গুড়-সহযোগে অপেক্ষা দোসা, তার বিশিষ্ট চাটনির সঙ্গে অনেক বেশি লোভনীয় ছিল। দোসার দিগ্বিজয়ের ঘোড়া দিগ্বিদিকে ছুটেছে। ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ, আমেরিকাতেও পৌঁছেছে। আমাদের সরুচাকলি নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছে।

সরুচাকলির জন্য শোক নেই, তবু বাঙালি ঐতিহ্যের দুর্গ বাগবাজার ও বিডন স্ট্রিটের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে কুড়ি বছর আগে প্রথম দেখে বিষণ্ণ হয়েছি দুজন হাফ লুঙ্গি-পরা দক্ষিণী মানুষ ফুটপাথের স্টলে পরিত্রাহি দোসা ভেজে চলেছে। তাদের ঘিরে একদল ছাত্র-ছাত্রী ব্যাকুল হয়ে দোসা পরিবেশনের অপেক্ষা করছে। বাঙালি উত্তর ভারতীয় মেশানো খদ্দের সব। সঙ্গে নারকেলের চাটনি আর ছোট বাটি করে সম্বার। এখন শুনেছি আরও উত্তরে সনাতন বাঙালি রীতিনীতির দুর্ভেদ্য দুর্গ বাগবাজারের মুখেও অনুরূপ ফুটপাথের স্টলেরও দোসা-ইডলির খুব চাহিদা। বাগবাজার বলেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কাছেই বিখ্যাত নবীন এবং কে সি দাসের মিষ্টান্নের দোকান। একটু এগিয়ে নতুন বাজারের সন্দেশ। আর বাগবাজার স্ট্রিটের ওপর একাধিক তেলে ভাজার দোকান।

একদা বাগবাজারের তেলেভাজা কলকাতা জুড়ে বিখ্যাত ছিল। সকাল-বিকেল দোকানগুলির সামনে ভিড় জমে থাকত। কড়া থেকে তোলা গরম তেলেভাজার জন্য। পূর্ব প্রান্তের তেলে-ভাজার দোকানটির সাইনবোর্ড ছিল মনে রাখবার 'বেঙ্গল-ফেমাস অয়েল ফ্রায়েড শপ'। দোকানটি আজও আছে। এই শহরের মতোই হতমান। দু-একজন খদ্দের কড়া থেকে তোলা তপ্ত আলুর চপের জন্য অপেক্ষা করছে। একপ্রকারের চপের

নামও মনে রাখবার মতো। লড়াই-এর চপ। কোন লড়াই-এর সঙ্গে ওই চপের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। এখন দোকানের সাইনবোর্ডও দোকানের মতো বিবর্ণ। পড়া যায় না। পাশের তেলেভাজার দোকানে জয়নগরের (?) মোয়া তৈরি হচ্ছে। বাঙালি আদি এবং পরম বিশিষ্ট তেলেভাজা এখন অনাদরে বিরল প্রজাতির মধ্যে চলে যাচ্ছে। মুড়ি তেলেভাজা এখনও কলকাতার বাইরে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও দোসা-ইডলির আগ্রাসন থেমে নেই। মুড়ির একটা বিখ্যাত দোকান পুরনো ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে। ভিড় থাকত সর্বদা, বিশেষ মশলা সহযোগে চানাচুরযুক্ত সেই মুড়ি ত্রিশের দশক থেকে ভোজনবিলাসীদের মন মাতিয়ে রেখেছিল। বছর দশেক হল সেই ক্ষুদ্র দোকানটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তার মানে কি এই মুড়ি তেলেভাজা আমাদের জীবনে অন্তর্ধানের পথে। আমাদের পরমভাগ্য মির্জাপুর স্ট্রিট ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে কালিকা এখনও তার পসার জমিয়ে রেখেছে। তেলেভাজা আলুর চপ, ভেজিটেবল চপ, ডিমের ও মাছের চপ কেনবার জন্য সব সময়েই বিশেষত সন্ধ্যার মুখে বেশ খদ্দেরের ভিড় থাকে। এরা যে কত সফল তেলেভাজার দোকান, তার প্রমাণ একটি বেগুনির দাম সাড়ে তিন টাকা। বেশ বড় মাপের বেগুনি অবশ্যই। সমজদার মানুষ না থাকলে এত চড়া দামে সেগুলি বেচা সম্ভব হত না। জানি না আর কতদিন তারা মানুষের রুচিকে বাঁচিয়ে রাখবে।

আরও একটি বাঙালির বিশিষ্ট বিরল খাবারের জন্য আমি স্মৃতিভারে বিষণ্ণ হই। লুচি। ময়দার লুচি। ঘিয়ে ভাজা, তপ্ত—এই পদার্থটি একেবারেই বাঙালিদের নিজস্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যায় না। এমন পরিশীলিত ভোজ্য। প্রকরণ অতি সহজ, সার্থক সৃষ্টি অতি কঠিন। ময়দার উপযুক্ত ময়ান চাই, বেশি নয়, কম হলে চলবে না। সঠিক মাপের জল মিশিয়ে ভাল করে মাখা চাই। দক্ষতার সঙ্গে বেলতে হবে, উপযুক্ত তাপের ঘৃতে ঠিকমতো ভাজা চাই। তবেই না সার্থক লুচি। বাড়িতে লুচির রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। ভাল ঘি পাওয়া যায় না, পেলেও দাম দেবার সাধ্য নেই, দালদার লুচি কোলেস্টেরল ইত্যাদির দাপটে অনেক বাড়ি থেকেই বিদায় নিয়েছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও কর্তারা দাঁড়িয়ে থেকে 'এখানে গরম লুচি দাও' হাঁক পেড়ে আপ্যায়ন করতেন। এখন নেমন্তন্ন বাড়ি থেকেও লুচি বিদায় নিয়েছে। সে কর্তারাও নেই। কেটারারদের গরম লুচি পরিবেশন করতে কষ্ট হয়। তার চেয়ে কচুরি ভাল, ডালের অথবা বিশেষ ঋতুতে কড়াইশুঁটির। পুর ঠিকমতো দেওয়া হয় না। বেশি পুরু দিলেও একপাশে জমে থাকে। গরম পরিবেশনের দিকে আর কেউ মন দেয় না। কোথায় ময়দার আতপ্ত খুদে খুদে দৃষ্টিনন্দন লুচি, আর কোথায় থ্যাবড়া কচুরি, তাও কড়া থেকে তোলা নয়।

কচুরি যদি খেতেই হয় তা হলে কোনও উত্তর ভারতীয়েরও নিমন্ত্রণে যেতে হয়। এঁরা এখনও কচুরির চরিত্র বজায় রেখেছেন।

আমাদের পাত থেকে শুধুই যে লুচি বিদায় নিয়েছে, তা নয়, তার সঙ্গে বিদায় নিয়েছে, একদা অচ্ছেদ্য অনুষ্ঠান, শাকভাজা ও বেগুনভাজা। এ নিয়ে কার কাছে বিলাপ করব। আজকালের ছেলেমেয়েদের এই স্বর্গীয় সমাবেশের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না।

শুরুতে একবার পরটা রোলের কথা বলছি। এই বস্তুটি আসলে নতুন নয়। অন্তত সত্তর বছর আগে, হয়তো তারও আগে নিজামের কাঠি কবাব বিখ্যাত ছিল। এই বছর পঁচিশের মধ্যে যে চিকেন ও মটন পরটা রোল সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, সে তো আদতে পরটা ও কাঠি কবাব। পঞ্চাশ বছর অল্পসংখ্যক সমঝদারের কাছে মর্যাদা পাওয়া সেই কাঠি কবাব ও পরটা। আজ সবাই আনন্দের সঙ্গে ভোজন করছেন, নিকৃষ্ট হয়ে নাম বদলে হয়েছে পরটা রোল।

অনাদি কেবিনের মোগলাই পরটা আদি যুগে যাঁরা ভোজন করেছেন, তাঁদের কাছে এগরোল নস্যি বরাবর। কিন্তু যাকে বলি পাবলিক টেস্ট, তার বদল হয়ে এখন এগরোল জনচিত্ত মোহিত করছে, হোক না কেন পুরাতনীদের কাছে নিকৃষ্ট।

মিষ্টান্নেও আমাদের রুচি বদল হয়েছে। সন্দেশের স্থান নিয়েছে প্রাকৃতজনের মিষ্টান্ন গরম জিলিপি. এ কি কম বেদনার কথা?

দুঃখের তালিকা আর বাড়াব না। শুধু জলের কথা না বলে থাকতে পারছি না। আগে কাজের বাড়ির জলে বিশেষ সুগন্ধি যুক্ত হত। চন্দন অথবা কেওড়া। সেই সুগন্ধিগুলি আর বুঝি পাওয়া যায় না। মিনারেল ওয়াটার নামে ডিসডিল্ড ওয়াটারই আমাদের খুশি করে। কেওড়ার কথা মনেই পড়ে না। কাজের বাড়িতে ওই জল পান করবার জন্য ব্যাকুল হতাম আমরা এমন দিনও ছিল। তখনও আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, কেওড়ার জলের দৈনন্দিন পরিবেশন হত না কেন বাড়িতে। জলে সামান্য কর্পূর দিলে কত আদরের হত, তাও কর্পূরের মতো প্রায় উবে গিয়েছে।

চায়না টাউনে ভোর

শীতকালে ভোর পাঁচটায়, সূর্যোদয়ের অনেক আগে, নরনারী যখন উষ্ণ সুখ-শয্যায়, যখন সবে প্রথম ট্রাম চলেছে, নিদ্রাজড়িত চোখে কেউ চায়ের দোকানের উনুনে আগুন দিয়েছে, তখন কলকাতার এক বিশেষ খাবারের বাজারে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। পথের দু ধারে সার সার টেবিল পড়ে, উনুনে বা স্টোভে আগুন গনগন করে ওঠে। পুরোদস্তুর রান্নাবান্না শুরু হয়ে যায়। একটু পরেই খদ্দেরের ভিড় হবে। সারা পথটা একটা মুক্তাঙ্গন ভোজনশালার রূপ নেবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সাতটা থেকেও কোনও কোনও স্টলে খাবার শেষ হয়ে যায়। আটটায় ভোজন পর্ব প্রায় শেষ। তখন দু ধারে তরি-তরকারির বাজার বসে।

শীতের উষ্ণ শয্যা ত্যাগ করতে যদি একান্তই আলস্য হয়, অন্য ঋতুতেও যেতে পারেন। কিন্তু জ্বলন্ত চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে তপ্ত আহার্যের মজা অন্য জগতের।

জায়গাটা মধ্য কলকাতায়। নিউ সি আই টি রোডে পোদ্দার কোর্টের পুব দিকে। চওড়া নতুন রাস্তা সি আই টি রোড থেকে বেরিয়ে সামনে পুরনো রাস্তা ছাতাওয়ালা গলিতে পড়ে। অঞ্চলটা সাবেকি চায়না টাউনের অংশ। ছোট বড় নানা রাস্তা বেরিয়ে অনেক বদলে গেছে। কিন্তু পোশাক বদলালে কি চরিত্র বদলায়? কলকাতায় চিনাদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে শুনি। কিন্তু এই মুক্ত আকাশের নীচে পথের ওপর সাময়িক ভোজনশালা শুনেছি একই রকম আছে। বড় শহরের এই রূপটি আমাকে মুগ্ধ করে। কত বিভিন্ন দেশ থেকে বিচিত্র ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আচার, অভ্যাসের মানুষ এসে জমা হয়। তারা খানিকটা শহরের আদি বাসিন্দাদের প্রভাবিত করে—কোথাও কোথাও দুই স্রোত এক হয়ে একেবারে নতুন রূপ নেয়।

তাই এই প্রত্যূষের চিনাপাড়ায় দোকানদারের সবাই চিনা হয়েও বাংলা বলছে, আমার মতো দু-দশজন বাঙালি চিনা ভাষা না জেনেও বিচিত্র রসের আস্বাদনের জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছে। সিঙাড়া কচুরিরও দু-একটা দোকান তোলা উনুন নিয়ে বসে গেছে। দোকানি বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের। এক আধজন চিনা নিজেদের ভোজন ছেড়ে ভারতীয় প্রাতরাশের স্বাদ নিচ্ছে।

চিনা রান্নার বহু রীতির মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র আছে। তাজা খাবার পরিবেশন করা হবে, সদ্য কড়া থেকে নামানো, গরম। ভাল রেস্টুর‍্যান্টে আপনার অর্ডার পাবার পর রান্না শুরু করাই বিধি। এই শীতের সকালেও এখানে তাই সমস্ত খাবার আপনার সামনে প্রস্তুত হচ্ছে। চিনা রন্ধন প্রকরণে ভাপে রান্নার বিশেষ স্থান আছে। এখানে কোথাও ভাপে রান্না হচ্ছে, কোথাও সিদ্ধ, কোথাও ভাজা।

যে ভোজ্যগুলি এখানে পাওয়া যাবে, তার অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকাই সম্ভব। কারণ এখানে তো দুপুরে বা সন্ধ্যার প্রধান ভোজন হচ্ছে না। যা হবে তাকে বাংলাতে বলি জলখাবার, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে প্রাতরাশ। কিছু চেনা জিনিসও পাবেন, যেমন রোস্ট পোর্ক, চিনা সসেজ অথবা চিনা শাক-সবজি। এগুলি অবশ্য ওখানে ভোজনের জন্য নয়। বাড়িতে নিয়ে এসে রান্না করার উপকরণ। আশ্চর্য, চিনাদের প্রধান সবজি চিনা বাঁধা কফি নজরে পড়ল না।

অনেকে এখানের খাবারও বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। চিনারা অবশ্য ওখানেই আহার সারছেন। যদি কিছুক্ষণের জন্যও অর্জুন হতে পারেন, ওখানেই খেয়ে দেখবেন। আর কিছু না হোক, একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রথমেই পাবেন ইছাকই। অল্প ময়ান দেওয়া ময়দায় তৈরি সরু সরু নিমকি ধরনের, ওপরে-নীচে জোড়া। মুচমুচে, গরম। টাকায় আটটা। এ ছাড়া ইছাকই গড়ার কারিগরিটাও ভারী আকর্ষক। সরু সরু ময়দায় ফালি ওপরে নীচে জুড়ে দিয়ে কড়ায় ছাড়বার মুহূর্তে কেমন টেনে লম্বা করে দেয়।

একটা দুটো সিউমাই খাওয়া সমীচীন হবে। এটা আপনার পরিচিত আহার্যের রকমফের। ওয়ানটনে যেমন ময়দার খোল মাংসের গোলককে চারদিকে আলিঙ্গন করে রাখে, এখানে সেই আলিঙ্গন শিথিল করে আস্তরণের রূপ নিয়েছে। ইংরেজিতে বলে ওপেন ওয়ানটন— খোলা ওয়ানটন অবশ্যই ভাপানো। আপনার সামনে ৬০ পয়সার একটি। মাংসের পাবেন, কী মাংস নাই বা জানতে চাইলেন। শূকরের মাংস হওয়াই সম্ভব। যদি মনোমতো না হয়, চিংড়ি মাছের সিউমাই নিতে পারেন। একই দাম।

পরিচিত ফ্রায়েড বা স্টিমড ওয়ানটনও প্রস্তুত হচ্ছে কয়েকটি স্টলে। বরং দু-চারটে ওয়ানটন প্যাটিস পরখ করুন। আমাদের ছোট সিঙাড়ার আকারের। টাকায় আটটা। একটু ছাসুপাও নিশ্চয় খাবেন। পোর্ক বা চিংড়ির—যা আপনার পক্ষপাত। দাম মনে পড়ছে না। এতই সামান্য যে মনে দাগ পড়েনি, পকেটেও আঁচড় কাটবে না।

মিষ্টান্নের দাম বেশি। অপেক্ষাকৃত। ধরুন, চিনতায়। অ্যারারুটের মিষ্টি লুচি, ওপরে তিল ছিটানো। মিকাউপান ভাল না লাগতেও পারে, তবে এর সসের বিশেষ

বৈচিত্র্যের জন্য একবার আস্বাদন করলে ভাল হয়। ভাল লাগতে পারে। চিনা খদ্দেররা আগ্রহ করে খাচ্ছে, দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও। চিনতায় এবং মিকাউপান, উভয়ের দামই এক টাকা খণ্ড। মিকাউপান আসলে চালের পুডিং, আর তার সস তৈরি হয় গুড় এবং রসুন দিয়ে।

আহারের শেষ পদ সুপ। ওয়ানটন, মিটবল, ফিশ, কোনটা চাই? ফুটন্ত গাঢ় নয়, পরিষ্কার কাচের বাটিতে, ভাল লাগবে, বিশেষ করে শীতের সকালে।

সব অভিজ্ঞতাতেই একটা সুখের অংশ আছে—যেমন সব ভেষজেই থাকে নিরাময়ের ক্ষমতা। ঔষধের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় উপযুক্ত প্রয়োগে। তেমনি সহনীয় মাত্রায় হলে চায়না টাউনের জলখাবারে আনন্দ পাবেন।
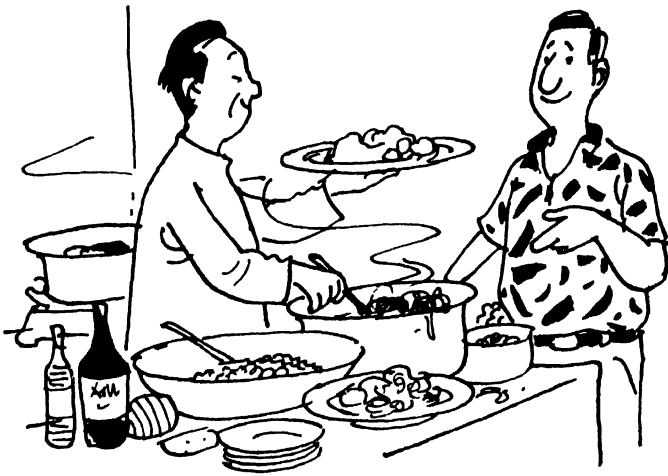
চায়না টাউন

ভারতবর্ষের একদা প্রথম শহর কলকাতার অবক্ষয় আমাদের কষ্ট দেয়। এই মলিন, বিমর্ষ নগরীর মান অনেক দিন গিয়েছে, কিন্তু ভাগ্যের কথা, তার জাত যায়নি। কলকাতার চরিত্রে এখনও বড় শহরের লক্ষণ স্পষ্ট। আধুনিক বড় শহরের চরিত্র নির্ণয় হয়, আমার মতে, তার নাট্যশালা ও ভোজনশালার সংখ্যায় এবং পসারে। নিউইয়র্ক আর লন্ডনের পরে আর কোনও শহরে প্রতি সন্ধ্যায় এতগুলি নাটক দেখবার সুযোগ আছে বলে আমার জানা নেই। আর কলকাতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য তার রেস্টুর‍্যান্টের বৈচিত্র্য এবং সুনামে। স্বীকার করি, কলকাতার ভোজনশালার সংখ্যা হয়তো অনেক ছোট শহর ব্যাঙ্গালোরের চেয়ে কম। উচ্চবর্ণের ও মহার্ঘ রেস্টুর‍্যান্টও কলকাতায় বেশি নেই। কিন্তু পুরনো এমন অনেকগুলি রেস্টুর‍্যান্ট আছে, যারা সাময়িক রুচির অস্থিরতা অতিক্রম করে দীর্ঘ দিন ভোজনবিলাসীর রসনা তৃপ্ত করে রেখেছে। নানা শ্রেণীর, নানা মূল্যের, নানা রুচির এত সফল এবং আনন্দবর্ধক ভোজনশালা ভারতবর্ষের আর কোনও শহরে নেই।

সেদিন পর্যন্ত চিনা খাবারের জন্য কলকাতার খ্যাতি ছিল। সানফ্রানসিস্কো কি টরন্টোর মতো কলকাতারও বিশেষত্ব ছিল তার চায়না টাউন। তখনও দিল্লির ম্যান্ডারিন রুম অথবা মুম্বইয়ের গোল্ডেন ড্রাগনের প্রতিষ্ঠা হয়নি। দিল্লির নূতনতম চিনা ভোজনশালা হাউস অফ মিং তো আরও পরের কথা। চায়না টাউনে রসিকজনের জন্য অনেক ছোট বড় অকৃত্রিম চিনা ভোজনশালা ছিল। তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য নানকিং রেস্টুর‍্যান্ট। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই রেস্টুর‍্যান্টের রসাস্বাদ করতেন। আমাদের দৌড় চায়না টাউনের রহস্যময় অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছত না। বড় রাস্তার ওপর চাং ওয়া পর্যন্ত আমাদের গতি ছিল।

কলকাতার চিনারা যেহেতু অধিকাংশ ক্যান্টন প্রদেশের মানুষ, এখানে রান্না তাই ছিল ক্যান্টনিজ। খাস চিন দেশে ক্যান্টনিজ রান্নার আভিজাত্য নেই। চিনা রান্নার মূল চার ধারার মধ্যে চিনারা ক্যান্টনিজকে নিকৃষ্ট গণ্য করেন। এ শহরে প্রথম শিউ-চুয়ান ধারার খাবার প্রবর্তন করে তা ফা সুন রেস্টুর‍্যান্ট। ততদিনে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দৌরাত্ম্যে চায়না টাউন তার অবগুণ্ঠন হারিয়েছে। তার বুকের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড রাস্তা চিৎপুর রোডকে সংযুক্ত করেছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সঙ্গে। সেই নতুন রাস্তার ওপর তা ফা সুন রেস্টুর‍্যান্ট, নানকিং-এর উলটোদিকে গলির ভিতর। বড় রাস্তা থেকে দেখা যায়। রাস্তা বড় বলে তার ওপর ময়লা-জঞ্জালও বেশি। সেই সব অবজ্ঞা করে রেস্টুর‍্যান্টে ঢুকতে হত। হঠাৎ ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধ লেগে যেতে ভারতের সর্বত্র চিনারা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। এমনকী যাঁরা অনর্গল বাংলা বলেন, কলকাতার চিনারা, তাঁরাও। চিনা খাবারের দোকানের নাম রাতারাতি বদলাতে লাগল। যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের চিনা খাবারে পক্ষপাত দেশদ্রোহিতা মনে হতে পারে। চাইনিজ ফুডের জায়গায় লেখা হল ওরিয়েন্টাল ফুড বা এশিয়ান ডিশেস। তা ফা সুনেরও নাম বদলাল। নতুন হল কুঙ্গা—টিবেটান রেস্টুর‍্যান্ট।

তিব্বতি খাবারের মধ্যে কুঙ্গাতে মাত্র দুটি পদ পাওয়া যায়—মোমো ও শাবালে। যাঁরা মাংসের পুর ময়দার খোলে পুরে ভাপানো পদার্থটি পছন্দ করবেন না, তাঁদের জন্য মোমো নয়। তাঁরা খাবেন শাবালে—এটা ভাজা। নামের নূতনত্বের মতো স্বাদের তেমন বিশিষ্টতা নেই। তবে চিকেন মোমোর দাম কম নয়। ছ খণ্ডের দাম বারো টাকা।

কুঙ্গার বিশেষত্ব এদের সুপ—দোকানের নাম বদলেও যার স্বাদ কমেনি। আর, সুপের মধ্যে বিশেষ হল সাওয়ার অ্যান্ড এক্রিড সুপ। এই সুপটি শিউ-চুয়ান রীতির। এদেশে পৌঁছানো মাত্র রসিকের হৃদয় জয় করেছে। এখন সারা ভারতে নানা নামে পরিবেশিত হয়—হট অ্যান্ট পেপার, সাওয়ার অ্যান্ড হট ইত্যাদি। সুপ তো নয়, একটি পূর্ণ আহার্য। সয়াবিনের দই তোফু, মুরগির টুকরো, মাশরুম (ব্যাঙের ছাতা বললে কেমন যেন শোনায়, ছত্রাক বললে বোঝা যায় না), চিংড়ি মাছ, মুরগির মেটে, সবজি ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থে পূর্ণ সুস্বাদু সুপ। হট অর্থে ঝাল, একটু টকের স্পর্শ এবং প্রচ্ছন্ন গোলমরিচের তীব্রতা। দাম সামান্য, পাঁচ টাকা।

চিনা খাবারের অসুবিধা, একা খেলে মজা হয় না। এক বা দুই পদের বেশি খাওয়া যায় না। দু'জন, তিনজন বা চারজন হলে অনেকগুলি পদ অর্ডার দিয়ে ভাগ করে খাওয়া যায়। দু পাত্র সুপ তিনজনের জন্য পর্যাপ্ত। অন্যান্য পদেরও পরিমাণ যথেষ্ট। যদি মাছ পছন্দ করেন, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার অথবা রোস্ট মৎস্য খেতে ভুলবেন না। একটি আস্ত ভেটকি মাছ। কী উপায়ে রান্না জানি না। জানার দরকারও হবে না, আপনি সুখ-স্বাদে মগ্ন হবেন, দাম ৩৫ টাকা। চারজনের নীচে হলে খাবার বেশি হবে।

এদের পোর্ক-উইথ স্প্রিং ওনিয়ন একটি অসাধারণ সৃষ্টি—সাত টাকা। চিংড়ি মাছের পদও লোভনীয়—সাত টাকার আশেপাশে দাম। হ্যাম অ্যান্ড এগ ফ্রায়েড রাইস আর একটি সুস্বাদু পদ। ভাত এবং নুডলের পদগুলির দাম পাঁচ টাকার মতো। মুরগি এবং পোর্কের খাবার ছ টাকা। নিরামিষে আসক্তি না থাকলেও ফ্রায়েড বিনস্প্রাউট খেলে

আনন্দ পাবেন। মশলা না দিয়ে কল-ওঠা ডালকে এমন উচ্চস্তরে তোলা যায় বিশ্বাস করা কঠিন।

ভোজনশালাটি বড়। অনেকগুলি টেবলে ৭০/৭২ জনের আসন। সঙ্গে পানশালাও আছে। উচ্চহাস ও উচ্চকণ্ঠ অতিথি পরিহার করতে চাইলে সন্ধে সন্ধে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। খুব একটা ভিড় হয় না। খাবার আসে দ্রুত। অপেক্ষার সময় সামান্য। রবিবার ছাড়া অন্য দিন দুপুরে বেশ অতিথি সমাগম হয়। ভোজনকক্ষ আধুনিক রীতিতে স্বপ্নলোক। মাথাপিছু ১২/১৪ টাকায় পূর্ণ পরিপাটি ভোজন হবে।

যাবার পথটা ভাল নয়, নোংরা এবং ভাঙাচোরা। বড় রাস্তা থেকে একটুই হাঁটতে হবে। বেশি হলেই বা কী। সুখাদ্যের জন্য শুনেছি পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে।

দখিন হাওয়া

বাংলা সরুচাকলি কখনও রসিক-সমাজের কাছে কল্কে পেল না, অথচ তার বৈমাত্র ভাই দক্ষিণ দেশের দোসার সমাদর সর্বত্র। এই শহরের এখানে ওখানে, ছোট শহরেও দোসা-ইডলির দোকান এখন নিসর্গের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। দোসার উপকরণে ডালের অংশ বেশি বলে হয়তো দক্ষিণী এই পদটি আমাদের অধিকতর স্বাদু মনে হয়। সব থেকে বড় কারণ যদিও দোসার অনুষঙ্গ, চাটনি এবং সম্বার। কবিরাজি ঔষধের যেমন, অনুপানের জন্য যার কার্যকারিতা।

কলকাতায় দক্ষিণী ভোজ্যের অনুপ্রবেশ মধ্য-তিরিশে। রাসবিহারী এভিনিউ-এর ওপর, লেক মার্কেটের কাছে দক্ষিণ-ভারতীয় হোটেল ও ভোজনশালা কোমলা বিলাস প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় অনেক পরে, ধীরে ধীরে। সামনে দিয়ে যেতে আসতে কফির তীব্র মধুর গন্ধ কোমলা বিলাসের উপস্থিতি ঘোষণা করত। বছর দুই হল অবশ্য কোমলা বিলাসের ভোজনশালাটি অবলুপ্ত। এখন স্থানটি শুধু আবাসিকদের জন্য। ১৯৩৭-এ কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হলে ইণ্ডিয়ান কফি হাউসের উদ্বোধনের পর দক্ষিণী পানীয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, প্রণয় হল। শোনা যায় কলকাতার প্রথম দক্ষিণী ভোজনশানা নাকি ইন্দ্রমহল, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে, ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে নাম ছিল মহালক্ষ্মী ভবন। মালিকানাও বদলেছে। এখন যিনি এই ভোজনশালার মালিক, তিনি উডিপী ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যের ভোজনশালার ভারত-অভিযানে তাঁদের কীর্তি অবিসংবাদী। এঁদের কথা বারান্তরে বলা যাবে।

প্রারম্ভিক কুণ্ঠিত অনুপ্রবেশ এখন অবরোধের রূপ নিয়েছে। সেদিন দেখেছি, বাঙালি ঐতিহ্যের লৌহ-দুর্গ উত্তর কলকাতায় বিডন স্ট্রিট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের

সংযোগস্থলে ফুটপাথের ওপর হাফ-লুঙ্গি-পরা দুজন হুমদো পুরুষ পরিত্রাহি দোসা ভাজছে। তাদের ঘিরে সারাদিন স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং পথচারী অন্যান্য ক্রেতার ভিড়। আপাতত পাতাল রেলের দৌরাত্মে তারা সাময়িক নিরুদ্দেশ।

দোসাভোজনের প্রধান এবং অবিচ্ছেদ্য উপকরণ চাটনি। নারকেল-কোরা ডালের ফোড়ন, ভাজা শুষ্ক লঙ্কার গন্ধ মিলিয়ে এই চাটনি দোসাকে রসের অন্য লোকে পৌঁছে দেয়। আর সম্বার। তেঁতুলের অম্ল, হিং, সম্বারের বিশেষ মশলা, ধানি ছোট পিঁয়াজের ঝাঁজ, অড়হর ডালের বন্য গন্ধ—এদের সংশ্লেষে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার নাম সম্বার। গত দু-এক বছর সম্বার তার স্বাদে, গন্ধে ভারতের চারটি দক্ষিণ রাজ্যকে এমনই মজিয়ে রেখেছে যে সে অঞ্চলে অন্য কোনও ডাল রন্ধনের পদ্ধতির রেওয়াজ নেই।

মাঝেরহাট পোল থেকে নেমে নিউ আলিপুরে বড় রাস্তা ধরে পূর্বদিকে একটু এগুলেই ডানদিকে সুপার স্ন্যাক বার। বছর পাঁচেকের দোকান। কিন্তু খাবারের সুস্বাদের জন্য গুণীজনের কাছে এদের প্রতিষ্ঠা প্রবল। বসে খাবার দোকান নয়, টেবিল-চেয়ার নেই। দাঁড়িয়ে এদের ভোজ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। বাড়িতে নিয়ে আরামে ভোজন করতে পারেন, কিন্তু তখন স্বাদের অংশমাত্র পাওয়া যাবে। উঁচু টেবিল আছে। সামনেই আহার্য প্রস্তুত হচ্ছে। সোজা তাওয়া থেকে আপনার প্লেটে আসবে। ঝকঝকে স্টিলের প্লেট, চামচ। মশলা দোসা আমার প্রিয় নয়—অন্তর্গত আলু-পিঁয়াজের ঘণ্ট আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে না। সাদা দোসা অবশ্যই মনোহারী। যদি মুচমুচে আপনার পছন্দ হয়, তা হলে খেতে হবে পেপার দোসা। না হলে সাদা দোসা, সরুচাকলির ধরনের, খুব কড়া না করে ভাজা। চাটনি এদের বিশেষত্ব। চাটনির উপকরণের কথা আগেই বলেছি। রং, তুলি পেলেই যেমন সবাই ছবি আঁকতে পারে না, উপকরণের আয়োজন থাকলেই এমন চাটনি রচনা হয় না। এদের চাটনিতে কুশলী শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া স্পষ্ট। বাদ্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গতে যেমন বাদন সার্থক হয়, তেমনি এই চাটনির সহযোগে দোসার গুণ রসনার মধ্যে দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে।

কিন্তু এই দোকানের প্রকৃত কৃতি, এদের ইডলি। শিমুল তুলোর রং, পরিপুষ্ট ইডলি, তুলোর মতোই হালকা। এতই কোমল যে ভাবতে হয় আকারের পরিধিতে বাঁধা আছে কেমন করে। উত্তপ্ত, ধূমায়িত ইডলি, তপ্ত সম্বারের সঙ্গে, একটু চাটনির টাক্না—মনোরম অভিজ্ঞতা হবে। আর উল্লেখযোগ্য, এই দোকানের বড়া। স্বর্ণবর্ণ, মুচমুচে এবং নরম।

উপমাতে আমার আগ্রহ নেই। সুজি, আমার বিশ্বাস, মিষ্ট স্বাদের ভোজ্যের উপকরণ। নোনতা সুজি খুব ভাল হলেও, কদাচ খাওয়া যেতে পারে। এখানে উত্তপম্‌ও পাওয়া যায়। ইডলি আর দোসার সংকর এই পদার্থটি, যদিও পিঁয়াজ ও লঙ্কায় সুরভিত, আপনাকে নতুন কোনও অভিজ্ঞতা দেবে না।

গৃহিণী বললেন, হো চি মিন সরণির জ্যোতি-বিহারও দক্ষিণ-ভারতীয় খাবারের জন্য প্রশস্ত। সেখানেও খাবার উত্তম সন্দেহ নেই। তবে—। স্ত্রী বাধা দিলেন, তা ছাড়া এয়ার কণ্ডিশন্‌ড ঘর। ভোজ্যের স্বাদের সঙ্গে ভোজনশালার তাপমাত্রার সম্বন্ধ সামান্য-মাত্র, এ কথা তুলে তর্ক করে লাভ নেই। মেয়েদের সঙ্গে তর্কের নিষ্পত্তি কবে হয়েছে। তবে,

জ্যোতি-বিহারে ভোজ্যের দাম সুপার স্ন্যাক বার অপেক্ষা কম।

আর এক জায়গায় দাম কম এবং কলকাতার দক্ষিণ ভারতীয়েরা সেখানের আহার পছন্দ করেন। কোমলা বিলাসের খুব কাছে প্রেমবিলাস।

সুপার স্ন্যাক বার যেমন একদিকে ইডলি-দোসার খ্যাতি বজায় রেখেছে, অন্য দিকে দক্ষিণী ভোজ্যের দাম কম বলে যে রটনা, সেটা নস্যাৎ করে দিয়েছে। দোসা ৩.৫০ টাকা। মশলা দোসা ৬.২৫। একজোড়া ইডলি ২.৫০। কফিরও দাম বেশি, ৩ টাকা। নিজের গাড়িতে বসেও খেতে পারেন। পরিবেশন বাবদ শতকরা ১৫ টাকা বেশি লাগবে।

হয়তো সেই কারণেই এখানে অতিথিদের মধ্যে বাঙালি মুষ্টিমেয়। উত্তর ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য। যদিও, শুনেছি, দোকানের মালিক বাঙালি।

কলকাতার কবাব

লক্ষ্ণৌ-এর বড়ে মিঞার কবাবের কথা পড়ে যাঁদের রসনা সজল হয়েছে, অথচ ট্যাঁক খালি, লক্ষ্ণৌ যাবার পাথেয় নাস্তি, তাঁদের জন্য সুখবর আছে। সেই লক্ষ্ণৌ-এর কবাব নয়, এক শিল্পীর সৃষ্টি অন্য আর একজন শিল্পী কদাচ নকল করেন। করা যায়ও না। তাছাড়া কলকাতার যে গুণীদের কথা বলব তাঁদের ঘরানাই আলাদা। দুয়ার হতে অদূরে, বাড়ি থেকে শুধু দুই পা ফেলিয়া যে এমন উপাদেয় আহার্য পাওয়া যায় সব সময় মানুষের মনে থাকে না। সে আকুল হয়ে পর্বতমালা দেখতে যায়, দেখতে যায় সিন্ধু।

ভোজনশালা দুটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড এবং পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, পার্ক স্ট্রিটের পূর্ব অংশে। উত্তরে লক্ষ্ণৌ হোটেল, দক্ষিণে সিরাজ (সাইনবোর্ডে কোনও অপ্রকাশিত কারণে লেখা: সিরাজ-গোল্ডেন রেস্টুর্যান্ট)। আমি প্রথম লক্ষ্ণৌ নাম দেখেই মজেছিলাম। গিয়ে দেখলাম, ইনি নামে লক্ষ্ণৌ হোটেল হলেও, হোটেল নন এবং ভোজ্যের ঘরানাতেও লক্ষ্ণৌ থেকে অনেক দূরে। যাই হোক, তাতে আমি বিচলিত হইনি। দেখলাম সামনেই মাঝারি আকারের হলে পঞ্চাশ ষাটজন অতিথি অনর্গল ভোজন করছেন। বেশ ভিড় এবং সেই ভিড়ের মধ্যে একরাশ পরিচারক সহজ ও দ্রুত সঞ্চরণ করছে। ঢুকেই খাজাঞ্চির কাউন্টার। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একজন তাঁকে টাকা লেনদেনে সাহায্য করছেন। তিনিই আমার অর্ডার নিলেন, নইলে বোলতার মতো ক্ষিপ্রগতি কোনও পরিচারককে ধরে আমার আদেশ জানাব, এমন সামর্থ্য আমার ছিল না। আসলে সময়টা উপযুক্ত ছিল না। বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত খুব অতিথি সমাগম হয়। অথচ দেরি করে যাওয়া সমীচীন হবে না,

কারণ ততক্ষণে লক্ষ্ণৌ হোটেলের বিশেষত্ব টিকিয়া কবাব বা শামি কবাব শেষ হয়ে যাবে।

বসে ভোজনের অভিপ্রায় ছিল না। ভিড় এবং নাতি-পরিচ্ছন্ন টেবিল এবং মেঝে দেখে অনুভব করলাম বিবেচনার কাজ করেছি। এঁদের রচনা বাড়িতে নিয়ে এসে আস্বাদন করাই বাঞ্ছনীয়। আমি সেদিন এনেছিলাম, টিকিয়া কবাব এবং মটন চাঁপ। সঙ্গে রুটি। এঁদের রুটি নানের ধরনের, আকারে যদিও ছোট, ফোলা-ফোলা। দামও কম, ২৫ পয়সা।

বিপরীত ফুটপাথে বিরাজ করছে সিরাজ। সেখানেও অনুরূপ লোকসমাগম এবং কর্মচাঞ্চল্য। দুই ভোজনশালার রন্ধনধারা এক। ভোজ্যের মূল্যও সমান। যুক্তিযুক্ত কারণ দিয়ে বোঝাতে পারব না, কিন্তু ওরই মধ্যে আমার সিরাজের বিরিয়ানির প্রতি পক্ষপাত আছে। বিরিয়ানি বলতে মটন বিরিয়ানি। চিকেন বিরিয়ানি আমার প্রাণের জিনিস নয়। আগেও বলেছি, মুরগি বিরিয়ানিকে কোনও নতুন স্তরে পৌঁছে দেয় না, যেমন করে ছাগমাংস। বিরিয়ানিতে মুরগি, ঠিক যেন গৃহী সন্ন্যাসীর মতো। বাড়িতে আছেন ওই পর্যন্তই, নির্লিপ্ত, কারও সুখ-দুঃখের সঙ্গে যোগ নেই।

সিরাজের বিরিয়ানি এক পাত্রের দাম ৫ টাকা। এক প্লেট দীর্ঘ বাসমতী চালের ভাত সুগন্ধ জাফরানে সুরভিত হয়ে এক অতি কোমল মাংসখণ্ডকে পরিবেষ্টিত করে আছে। যাঁরা ভাত কম খান, শুনেছি তাঁদের সুবিধার্থে ডবল বিরিয়ানির আদেশ করলে সমপরিমাণ ভাতে নিমজ্জিত দু খণ্ড মাংস পাওয়া যেত। দাম ৬ টাকা। মিতাহারী হলে দু জনের পক্ষে পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত এই কারণে যে আপনি অবশ্যই এক পাত্র কবাব রোটি খাবেন।

আগেই বলেছি এই ভোজনশালা দুটির কবাব অন্য ধরনের। প্রচলিত শামি কবাবের মতো এঁদের কবাবের মাংস অত পিষ্ট নয়—কিছু মোটা দানার। ঝাল একটু বেশি। সব মিলিয়ে উপাদেয় স্বাদ। কিছু কুচি পিঁয়াজ পাবেন। রুটি সহযোগে উভয়ের সদ্ব্যবহার করবেন। কবাবের দাম প্রতি খণ্ড ১ টাকা। প্রয়োজন হলে দুটি রুটি নিতে পারেন। শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, রসনা পরিতৃপ্ত হবে।

মনে হয় প্রথম দিনে আর সামর্থ্যে কুলোবে না, পরে আর একদিন এঁদের আর একটি পদের স্বাদ নেবেন। মটন চাঁপ। ৩.২৫ টাকা। এই পদটি আপনার সামনেই প্রস্তুত হচ্ছে দেখতে পাবেন। বস্তুত, রাস্তা থেকেও দেখা যায়। দোকানের সম্মুখভাগেই স্বল্প আঁচের চুল্লির ওপর বিশাল পরাতের আকারের বাসনে চাপ সাজিয়ে পাচকের সহকারী বসে থাকেন। সমস্তক্ষণ, পরাত শূন্য না হওয়া পর্যন্ত মাংসখণ্ডগুলি হালকা আঁচে পাক হতে থাকে। হয়তো সেই কারণেই চাঁপ এত কোমল এবং তার মজ্জায় মজ্জায় সুস্বাদ অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমি রুটি এবং প্রভূত পিঁয়াজকুচি সহযোগে চাঁপ পছন্দ করি। আপনি বিরিয়ানির সঙ্গেও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। উভয়ভাবেই ভাল লাগবে। তবে যদি আপনি রয়্যালের অনুরাগী হন, রয়্যালের মটন চাঁপের স্বাদে যদি আপনার রসনা বা স্মৃতি আপ্লুত থাকে, সিরাজ বা লক্ষ্ণৌ-এর চাঁপ আপনার একটু ফিকে লাগবে। সব সময়ে তো রয়্যালে পৌঁছনো

যায় না, মাঝে মাঝে একটি পরিবর্তনেরও অন্য আনন্দ আছে।

মিষ্টান্ন ইচ্ছা করলে ফিরনি নিতে পারেন। ১.২৫ টাকা। কিন্তু আবার সেই স্মৃতির যন্ত্রণা। আপনার সঙ্গে কি মৌলানা আজাদ রোডের দক্ষিণভাগে হোটেল অ্যান্ড পিওর মিল্ক এম্পোরিয়ামের ফিরনির পরিচয় ঘটেছে? তাহলে সিরাজ এবং লক্ষ্ণৌ-এর ফিরনি আপনার মনে ধরবে না। দুধ আর চালগুঁড়ির মিশ্রণে এমন অপরূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় পিওর মিল্ক এম্পোরিয়ামের ফিরনির আস্বাদ না পেলে অনুভব হবে না। সেখানেই তো শিল্পীর স্পর্শ, যা উপকরণের উপর নির্ভর নয়। সিরাজ এবং লক্ষ্ণৌ-এর চাঁপ, কবাব বা বিরিয়ানিতে সেই জাত শিল্পীর ছোঁয়া পাবেন।
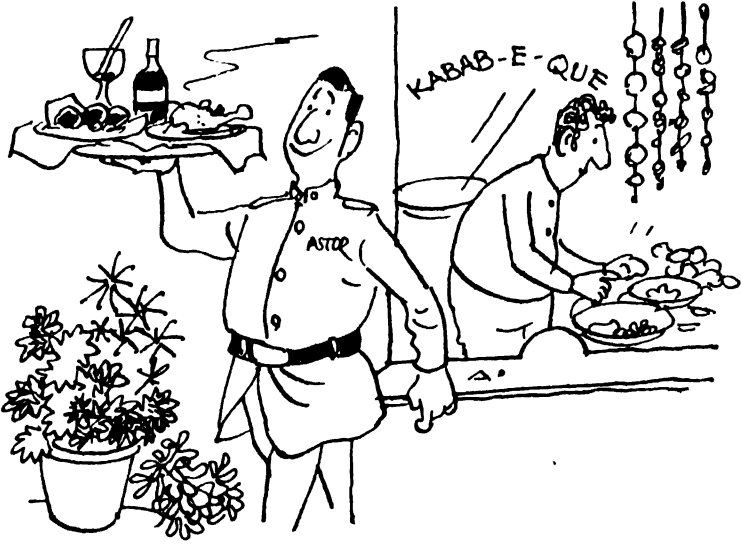
সাহেবপাড়ায় কবাব

শেক্সপীয়ার সরণির ওপর অ্যাস্টর হোটেলের সামনে খোলা মাঠে কবাব-এ-কিউ। অ্যাস্টর হোটেলের পেডিগ্রি উঁচু দরের নয়। কিন্তু কবাব-এ-কিউ প্রথম শ্রেণীর ভোজনশালা। মাঠের একধারে তন্দুরে রন্ধনের ব্যবস্থা। তার সামনের প্রশস্ত কাচের ভেতর দিয়ে কী রান্না-বান্না হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। হোটেল-বাড়ির নীচের তলায় একটি রেস্টুর‍্যাণ্ট আছে, সরাই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সেখানেও কবাব-এ-কিউয়ের কবাবজাতীয় বা তন্দুরে প্রস্তুত খাদ্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু খোলা আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে বসার অন্য মজা আছে। কবাব-এ-কিউতে চিনা এবং কন্টিনেন্টাল খাবারও পাওয়া যাবে, সরাই থেকে প্রস্তুত হয়ে আসে। কিন্তু চাঁদের আলোয় যখন বসেছেন, মোমের বাতি জ্বলছে এক কিনারে, সাঁঝের তারাও হয়তো জ্বলছে আকাশ পারে, তখন বান্ধবীর সঙ্গের মতো উপযুক্ত হবে তন্দুরি খাবার বা কবাব। ছুরি কাঁটার ষড়যন্ত্রে যাবার দরকার নেই। উভয় হস্তই প্রয়োগ করতে পারেন। মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। লোডশেডিংয়ের আগে মাঠে যে আলো ছিল তাও খুব প্রখর নয়, বরং একটু ছায়া-ছায়া, —সেই জন্যই বোধ হয় ভোজনটা আরও ভাল লাগে, মায়াবী আলোয় যেমন বহু দিনের বিবাহিত স্ত্রীও প্রণয়িনীর মতো বিভ্রম জাগান।

মাঠটা খুব ছোট নয়। তবে বেশি টেবিল-চেয়ার পাতা হয় না। সেটা যারা খেতে বসেছেন, তাদের আনন্দের কারণ হয়, আর অন্যেরা পূর্বাহ্নে টেবিল সংরক্ষিত না করলে স্থান পান না। যদি টেলিফোন লাগাতে পারেন, ফোন করে তবেই যাবেন। রিজার্ভ না করে আমার ফিরে আসারও অভিজ্ঞতা আছে।

যদিও আহার্য আপনার প্রায় সামনে প্রস্তুত হচ্ছে, পরিবেশন খুব দ্রুত নয়। একটু সময়

হাতে নিয়ে যাবেন। খোলা মাঠের ভোজনের মেজাজটা ঢিলেঢালা হওয়া চাই, নইলে সম্যক রস পাবেন না। গ্রীষ্মের রুদ্ররাগের উপযুক্ত জবাব একপাত্র হিমশীতল ফ্রেশ লাইম অ্যান্ড সোডা। অর্থাৎ পাতিলেবুর রসে স্নিগ্ধ সোডা। আড়াই টাকা। আপনার অন্য অভিরুচি হলে বিয়ারও চলতে পারে। তার দাম কিন্তু পনেরো টাকা। এবারে আহার্য আদেশ করা যেতে পারে। মেষ এবং কুক্কুট মাংস মিশিয়ে আদেশ করাই সমীচীন হবে। মুরগির টাংরি কাবাব এখানে উত্তম প্রস্তুত হয়। রসযুক্ত এবং আবছা একটু ধোঁয়ার গন্ধ। একপাত্রে দুটি খণ্ড থাকে। চোদ্দ টাকা। মেষমাংসে এঁদের কাকোরি কবাব আমার মনোমতো। কিন্তু এই কাকোরি কবাব আমাদের পরিচিত দিল্লির অল কৌসরের বিখ্যাত শিক-কবাব নয়। এখানে কাকোরি কবাব কিমা করা মাংসের নয়। মাংস খণ্ডগুলি মধ্যমাকার। উপযুক্ত জারকে জারিত হয়ে শূলপক্ক! ওপরে একটা হালকা ডিমের আস্তরণ ছিল, এখন স্বাদে তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে। লঙ্কা একটু প্রখর। কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে লঙ্কার গন্ধ স্বাদের একটা অপূর্ব কলতান সৃষ্টি করে। সঙ্গে একটু কাঁচা পিঁয়াজ যোগ করবেন। তিন কিংবা চার খণ্ড মাংস। ন টাকা। এমন অনেক সংগীতসভায় গিয়ে থাকবেন, সেতার কি সরোদের অপূর্ব বাদনে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তবলা তেমন দক্ষ নয় বলে সুখের শিখর স্পর্শ করবার আগেই ফিরে ফিরে আসছেন, এখানে অভিজ্ঞতা একটু সেই ধরনের হবে। কারণ এঁরা রুটি তৈরি করতে জানেন না। রুমালি রুটি হলেই ভাল হত, কিন্তু কবাব-এ-কিউতে রুমালি রুটি হয় না। অভাবে, তন্দুরি রুটি হলেও বেশ জমত। কিন্তু এঁরা তন্দুরি রুটিতে একেবারেই শিক্ষানবিশ। আমার মনে হয় নান-এর ময়দায় রুটি প্রস্তুত হয়েছিল। খেতে ভাল তো নয়ই, ঠাণ্ডা হতেই স্থিতিস্থাপকতায় রবারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। দাম কম নয়, এক টাকা। বরং নান অপেক্ষাকৃত ভাল।

অন্যান্য পদের মধ্যে আমার প্রিয় আর দুটির কথা বলি। প্রথমটি মুরগির। চিকেন অমৃতসরী। অমৃতসরে কয়েকবার গিয়েছি। সেই শহরে রান্নার কোনও প্রতিষ্ঠিত ঘরানা আছে বলে শুনিনি। অবশ্যই খাইনি। কিন্তু অমৃতসরী নাম দিয়ে এরা যে পদটি সৃষ্টি করেছেন, সেটি মনে রাখবার মতো। চার খণ্ড মুরগির মাংস, তন্দুরে প্রস্তুত, বিবিধ মশলায় সুরভিত। দাম বারো টাকা। অপর পদটি শিক-কবাব। এঁরা নাম দিয়েছেন মমতাজ শিক কবাব। কী কারণে, এই শিক-কবাব মমতাজের নামে সমৃদ্ধ আমার জানা নেই। অমৃতসরী, কাকোরির মতো এই নামটিই মনে হয় এঁদের উদ্ভাবন। পদটি অবশ্য পুরাতন। সেই এক ধারার। এই ধারায় যারা যোগসিদ্ধ শিল্পী তারা অলকৌসরে কাকোরি কবাব সৃষ্টি করেন। কবাব-এ-কিউতে শিক-কবাব অত উচ্চগ্রামের না হলেও, অন্যত্র যেমন পাওয়া যায়, তার থেকে অনেক ভাল। কিমা মসৃণভাবে থোড়া, আদা ও পিঁয়াজের স্পষ্ট উপস্থিতি, কাঠকয়লার উপর সেঁকা। এই কবাবে মেশানো জারকের বিশেষত্ব এই যে সেঁকবার পর মাংস শক্ত হয়ে যায় না। তখনও রসস্থ ও কোমল থাকে। তিন খণ্ড শিক-কবাবের দাম ন টাকা।

আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যদি একাধিক পদ আদেশ করে থাকেন, পরিচারককে সব পদ একসঙ্গে আনতে বারণ করবেন। আপনি যতক্ষণে প্রথম পদ শেষ করে দ্বিতীয় পদ পৌঁছেছেন, অন্য পাত্রগুলি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা কবাব মূক যুবতীর

মতো। খোলা মাঠে খাওয়ার পূর্ণ আনন্দ পেতে হলে একটি পদ শেষ হবার পর দ্বিতীয় পদটি আসবে। প্রথমটির রেশ মেলাবার পর একটু সময় দিলে আনন্দ পাবেন। যারা একেবারে শুষ্ক আহারে সুখী হন না, তাদের রসযুক্ত কোনও পদ সরাই থেকে আনাতে হবে। শুনেছি এদের রোগন গোস্ত প্রথম শ্রেণীর। আমি এক পাত্র ডালের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সেদিন ডাল বাড়ন্ত ছিল, না কি সরাই থেকে আনাবার হাঙ্গামায় যেতে চাইল না পরিচারক বুঝতে পারিনি। ডাল পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলেও রবারের মতো ওই রুটি ডালে চুবিয়ে শাসন করা যেত কি না সন্দেহ।

মিষ্টান্নের মধ্যে এখানে পাবেন কুলফি আর আইসক্রিম। কুলফির স্বাদ ভাল। কিন্তু যতই ভাল হোক, আমরা যারা একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কুলফির স্বাদ পেয়েছি, তার স্বাদকে স্পর্শ করে এমন কুলফি অন্য কোথায় পাবেন? যিনি একবার বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন, তার কাছে আর কোন দৃশ্যের দাম থাকে? আপনার যদি আইসক্রিম পছন্দ হয়, টুটিফ্রুটি নিতে পারেন। এক গেলাস স-ক্রিম, হিমেল, বিবিধ ফল মিশ্রিত, মধু সিঞ্চিত আইসক্রিম। দামও তেমনি, দশ টাকা।

বাড়ি ফেরার পথে যদি হাওয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে এক পশলা, তা হলে সুখের আর সীমা থাকবে না।
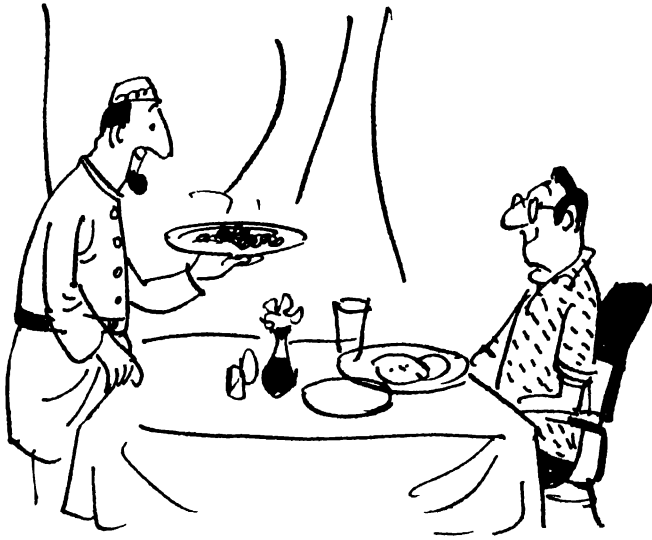
চিৎপুরের চাঁপ

এখন নাম হয়েছে রবীন্দ্র সরণি, তবু চিৎপুর নামেই সবাই জানে। চিৎপুরের প্রসিদ্ধিও তো কম নয়। কলকাতার প্রাচীনতম রাস্তা। উত্তরে চিত্তেশ্বরীর মন্দির, দক্ষিণে কালীঘাট। এক সময় এই রাস্তার নাম ছিল পিলগ্রিম পাথ—অর্থাৎ তীর্থযাত্রীর পথ, কালীঘাটের রাস্তা। পরে নাম হয় চিৎপুর রোড অর্থাৎ উত্তরে চিত্তেশ্বরীর মন্দির যাবার রাস্তা। রাস্তার নামই বদলেছে, গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে তার চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সরু রাস্তা, গিসগিসে ভিড়, ট্রাম, বাস, ঠেলাগাড়ি, রিকশা, ফেরিওয়ালার চিৎকার, মোটরের অধৈর্য হর্ন আর মিশ্র কলরবে এমন ঘণ্ট হয়ে থাকে, কলকাতাতেও তার জুড়ি মেলা ভার। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। প্রথমে ট্রাম চলল, ১৯২৬ সালে পুরনো ছোট নাখোদা মসজিদ ভেঙে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের মোড়ে, কলকাতার বৃহত্তম নাখোদা মসজিদ তৈরি হল। আর ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠা হল রয়্যাল ইন্ডিয়ান হোটেল।

রয়্যাল ইন্ডিয়ান হোটেল আসলে হোটেল নয়, রেস্টুর‍্যান্ট। চিৎপুর রোডের ওপর, পশ্চিম ফুটপাথে হ্যারিসন রোডের দক্ষিণে। একটু এগুলেই নাখোদা মসজিদ। এখন মস্ত সাইনবোর্ড লেগেছে। কিন্তু রয়্যাল হোটেলের খ্যাতি তার আগেই বিস্তৃত হয়েছে, সাইনবোর্ডের অপেক্ষা করেনি। দোতলা বাড়ি। নীচে এবং ওপরে প্রশস্ত বসবার জায়গা। নীচে চল্লিশজন, ওপরে পঁচাশি। আমাদের নীচে যাবার দরকার নেই, ওটা একেবারে আম দরবার। ওপরে মানেই উচ্চশ্রেণীর, অভিজাত। সেখানে দাম একটু বেশি। তা ছাড়া এক একটি পদের জন্য মাত্র দশ বা পঁচিশ পয়সা বেশি দিলে যদি পদোন্নতি হয়, কেন দ্বিধা করবেন? সিঁড়িটা রাস্তা থেকে সোজা উঠে গেছে এবং বেশ খাড়া। উঠতে একটু কষ্টই হয়। তা হোক, অত নাম শুনে এসেছেন, একটু কষ্ট করবেন না?

প্রতি যুগে, এখন প্রতি বছরে মানুষের রুচি বদলায়, রেওয়াজ বদলায়। রয়্যাল হোটেলের বৈশিষ্ট্য এই যে চিরন্তন রুচি পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যে ঋজু আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জনপ্রিয়তার হেরফের হয়নি। ভোজনশালা খোলে সকাল দশটায়, বন্ধ-হয় রাত এগারোটায়। দ্বিপ্রহরে না যাওয়াই সমীচীন। সন্ধ্যার পরই প্রশস্ত সময়। ভিড় কমে যায়। অবশ্য আলোও কমে। তাতে কী? অন্ধকার হলে কি রজনীগন্ধার সৌরভ পাওয়া যায় না?

দ্বিতলে কয়েকটা কেবিনও আছে। ইচ্ছে হলে একটু একান্তে বসতে পারবেন। কী অর্ডার দেবেন? অবশ্যই মটন চাঁপ। চিকেন চাঁপও পাবেন। আমার পক্ষপাত মটন চাঁপ। এই পদটি মটনের যেমন সুস্বাদু হয়, চিকেনের যেন তেমন হয় না। ব্যাকরণ শুদ্ধ এবং কণ্ঠ মিষ্ট বলেই কি সব গান সব গলায় খোলে? তেমনি। দাম তিন টাকা ষাট পয়সা। নীচে বসে খেলে এই পদটিই ৩.৫০ টাকায় পাওয়া যাবে। সঙ্গি কিছু তাজা পিঁয়াজ কুচনো আসবে। আর নেবেন রুমালি রুটি ২৫ পয়সা। রসনা স্পর্শ করলেই বুঝতে পারবেন, এতকাল ধরে, এত রুচি-বদলের হিড়িকেও কেমন মটন চাঁপ বিভিন্ন যুগের রসিকদের মাতিয়ে রেখেছে। বিশেষ কোন জারক রসে মাংসের এমন চরিত্র বদল হয় যে মাংস বলে চেনা গেলেও তার স্বাদে একটা অভিনবত্ব আসে। রন্ধন প্রকরণের কারণে কি না জানি না, পদটিতে হাড়ের কুচি থাকে। সুখস্বাদে নিমগ্ন হয়ে আনন্দের অন্য লোকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। হঠাৎ রসভঙ্গ হয়ে যেতে পারে। হাড়ের কুচিগুলো বাদ দিয়ে খাবেন। জাফরানের মৃদু সৌরভ দিবাস্বপ্নের সুখাভাস আনবে।

ইদানীং একটা ভোজ্য-তালিকাও ছাপা হয়েছে। অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে পসিন্দা কবাব নেবেন, তিন টাকা পঁচিশ পয়সা। ক্ষুধা অধিক হলে চিকেন কালিয়া আদেশ করতে পারেন। চার টাকা পঁচিশ পয়সায় সুরভিত ঝোলে এক খণ্ড মুরগি পাবেন। এই পদটিও বিশেষ। কিন্তু স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় মটন চাঁপের পিছনের সারিতে পড়ে।

অনেকে এঁদের বিরিয়ানি পছন্দ করেন। আমার কলকাতার কোথাও বিরিয়ানি মনে ধরে না। যা পাওয়া যায় তাকে মাংসের বা মুরগির পোলাও বলা যেতে পারে। বিরিয়ানি আর পোলাও-এর মধ্যে প্রভেদ ধনী আর অভিজাতের মধ্যে পার্থক্যের মতো। ধনী যখন অভিজাতও হয়, তখনই তাকে বলি ভাল বিরিয়ানি। কলকাতার মাংসের পোলাও অভিজাত—একটু বা হতমান বা হতশ্রী। মসলার প্রাচুর্য বা ঘৃতের আধিক্য বিরিয়ানিকে যে বৈশিষ্ট্য দেয়, কলকাতায় তার নিদর্শন বিশেষ কোথাও পাওয়া যায় না। মটন বিরিয়ানির দাম পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা।

পরিবেশন অতি দ্রুত। সব খাবার একসঙ্গে আদেশ করবার প্রয়োজন নেই। যেমন যেমন ইচ্ছা হবে একের পর এক তেমন অর্ডার করবেন। বেশি দেরি করে যাবেন না। সাধারণত আটটার আগেই বিশেষ পদগুলি শেষ হয়ে যায়। কলকাতায় আর যা-ই হোক, রসিকের অভাব নেই।

মিষ্টান্ন দিয়ে শেষ করাই ভাল। অবশ্যই ফিরনি খাবেন। মাটির খুরিতে জমানো, রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা করা। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা। সব মিলিয়ে পরম সুখের অভিজ্ঞতা হবে। পুনর্বার না যাওয়া পর্যন্ত ভুলতে পারবেন না।

চাচা কাহিনী

চাচার হোটেল নামেই হোটেল, আসলে স্থানটি ভোজনশালা। বৈকালিক। চারটে পাঁচটার আগে খোলে না। আটটা নাগাদ সবই প্রায় উঠে যায়, অর্থাৎ বাড়ন্ত হয়। তবু পরিমাণে বাড়িয়ে কেন প্রস্তুত করা হয় না, এ প্রশ্ন কৈশোরেও যেমন বিচলিত করত, এখনও তেমনি। অর্থাৎ এখনও পৌঁছতে দেরি হলে সব খাদ্য না পেতেও পারেন। তবে সব খাদ্য বলতে তালিকা দীর্ঘ কিছু নয়। দীর্ঘ যদি হতও, ফাউল কাটলেট ছাড়া অন্য কিছুর স্বাদ নেবার জন্য কেউ এখানে তখন যেত না। ভেবেছিলাম এখনও তাই।

হেদোর কাছে বিধান সরণির ওপর এই ভোজনশালাটির খ্যাতি বহু দিনের। পঞ্চাশ ষাট বছর হবে নিশ্চয়। আমরা যে যুগে চাচার হোটেল চিনতাম, তখন দিনকাল এত নির্মম ছিল না। কিন্তু চাচা বড় নিষ্ঠুর ছিলেন, বিশেষ করে সেই বালকটির প্রতি যার পক্ষে একটি কাটলেটের জন্য চার আনা সংগ্রহ করাই সহজ ছিল না। তখনও পঞ্চাশ টাকায় ভদ্রলোকের সংসার ভদ্রভাবে চলত। চার আনা তাই সামান্য ছিল না। একটি ফাউল কাটলেটের দাম তখন ছিল চার আনা। সেই দুর্লভ চার আনা যদি বা জুটল, তবুও কি ফাউল কাটলেটে রসনা-সংযোগ করা যেত? না, যেত না। কারণ ফাউল কাটলেট একটি পাওয়া যেত না, মানে চাচা বিক্রি করতেন না। একসঙ্গে তিনটি কাটলেটের কমে চাচাতে পাওয়া যেত না। বহুকাল একযোগে সেই পরম সুস্বাদু, সুঘ্রাণ তিনটি কাটলেট খাবার ইচ্ছা স্বপ্নে পোষণ করেছি। কিন্তু বারো আনা, অর্থাৎ পঁচাত্তর পয়সার অধিকারী হতে পারিনি। অতএব, আরও দু জন চার আনার অংশীদার সংগ্রহ করতে পারলে তবেই লক্ষ্মীলাভ হত। সে প্রায় সাধনার ব্যাপার ছিল। কোনও দিনই সিদ্ধিলাভ হল না।

অনেক পরে, যখন তিনটি কাটলেট একসঙ্গে আদেশ করবার অবস্থা হল, চাচাতে

গিয়েছিলাম। পুরনো ছবির সঙ্গে প্রায় মিলে গেল। সাইনবোর্ড আর দরজার নতুন রং সামান্য ছন্দপতন করেছিল। ভেতরে প্রবেশ করে আশ্বস্ত হলাম। দেওয়ালে একযুগ কলি পড়েনি। পাঁচটি শ্বেতপাথরের টেবিল, এখন সময়ের অত্যাচারে মলিন, এখানে, সেখানে ফাটল ধরেছে। পালিশের ওপর কালের আস্তরণ চড়ানো গোটা কুড়ি চেয়ার। প্রবেশপথের পাশেই খাজাঞ্চি বসে আছেন, সেই চেনা ক্যাশ বাক্সটি নিয়ে। পিরিচের ওপর কিছু মৌরি। মাথার ওপর চারটি মস্ত হাঁড়ির ডি সি পাখা হাওয়া অপেক্ষা শব্দ বেশি বিতরণ করছে। ঘরের শেষপ্রান্তে প্রায়ান্ধকার রান্নাঘরের খোলা দরজা। খাটো লুঙ্গিপরা একজন পরিচারক কাছে এসে দাঁড়াল। ভারী আশ্বস্ত বোধ করলাম। ছাদে নিয়ন আলো নতুন সংযোজন, ক্ষণিক ছন্দপতন ঘটিয়েছিল।

আমি তিনটি ফাউল আদেশ করে সাগ্রহ প্রতীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, পরিচারক জানতে চাইল তিনটি কাটলেটই বাড়ি নিয়ে যাব কি না। বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর অচিরেই পাওয়া গেল। এখন আর তিনটি কাটলেট একসঙ্গে কিনতে হয় না, তাদের একাকী পাওয়া যায়। সেদিনের বালকটির বহু বছর পোষণ করা অভিলাষ দমন করে, আমি একটি কাটলেট অর্ডার করলাম। ক্লাসে বরাবর ভাল পড়াশুনা করেছে, পরীক্ষার ফল প্রত্যাশিত, এমন বালকের পরীক্ষার ফল জানতে গিয়ে মনের যেমন অবস্থা হয়, আমারও তেমনি। ফল তো জানা, তবু জানবার জন্য একটু অধীরতা এবং প্রত্যয়। সেই ছেলে সফল তালিকায় নিজের নাম না দেখলে যেমন ধাক্কা খায়, আমারও তাই হল। সেই বৃত্তাকার পাতলা পাকাসোনার রঙের পরিচিত কাটলেট, পাশে সেই পিঁয়াজ কুচির সঙ্গে আলুসেদ্ধ মেশানো স্যালাড, কিন্তু এ তার কী স্বাদ? বলে বোঝাতে পারব না, কতখানি আশাভঙ্গ হয়েছিল।

এখন কাটলেটের দাম আড়াই টাকা। এঁদের ধারণা এঁরা মুরগির মাংসের বিকল্প আবিষ্কার করেছেন। বাজার চড়া, কাজেই বোধ করি সেই বিকল্প বেশি ব্যবহার করে এখনকার কাটলেট তৈরি হয়। সাধ্য কী তার আপনাকে স্বাদের সেই স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দেবে, যেখানে আসবার জন্য চার দশক আগে অনেক অধৈর্য প্রতীক্ষা করেছি। চাচার কাটলেটের বিশেষত্ব ছিল তার অনির্বচনীয় স্বাদ। থুড়ে নেওয়া কুক্কুট মাংসের ওপরে ডিমের আস্তরণে একটা মণিকাঞ্চনযোগ হত। এঁরা বিস্কুট গুঁড়ো একেবারেই ব্যবহার করতেন না। তাজা মাংস, ডিম, ঘৃত ও পিঁয়াজের স্বাদ, আর নিদ্রাভঙ্গের পর সুখস্বপ্নের রেশের মতো আদার ক্ষীণ সৌরভ কী মায়াবী জগৎ রচনা করত, আজকের স্বর্গ থেকে পতনে সেটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং বেদনাদায়ক। তখন অন্যত্র কোথাও স্যালাডে আলুসেদ্ধ থাকত না। রাই থাকত মুখরা সুন্দরীর মতো ঝাঁঝালো। আমার যখন সময় হল, তখন সবাই নিষ্প্রভ, নীরব।

শুনেছি, নদী এক তীর ভাঙে, অন্য তীর গড়ে। শুনেছি, কালো মেঘেরও রূপালি পাড় হয়। সেদিন চাচার শিক-কবাব আস্বাদ করে শোনা কথায় বিশ্বাস ফিরে এল। এঁরা যাকে শিক-কবাব বলেন, সেটা আসলে রোটি কবাবের সগোত্র। শিকে চড়িয়ে সেঁকা হয় বলেই সাহেব হয়ে যায় না। নামে কিবা আসে যায়। চাচার শিক-কবাব যে কোনও উত্তম রোটি কবাবের সমকক্ষ। ছোট ছোট ছাগমাংসের খণ্ড উপযুক্ত জারকরসে সিক্ত হয়ে সামান্য

অগ্নিসংযুক্ত হলে যে অপার স্বাদ পায়, তার তুলনা হয় না। ভাসা ভাসা ধোঁয়ার গন্ধ সেই স্বাদকে আরও রমণীয় করে তোলে। সঙ্গে তীব্র কুচি পিঁয়াজ চাই। রাই বড় হতাশ করল, সে তীক্ষ্ণতা কোথায়। রাই তীক্ষ্ণ হলে স্বাদের সপ্তমস্বর্গে প্রবেশ আরও সুগম হত। সাড়ে চার টাকা দাম। অবশ্যই আনন্দ পাবেন।

তারও পরে একদিন চাচায় গিয়ে শিক-কবাবও হতাশ করেছিল। রসস্থ, সুঘ্রাণ মাংস খণ্ডগুলিকে বোধহয় শুকনো তাওয়াতে চড়ানো হয়েছিল, তাই নীরস; এবং সুঘ্রাণের চিহ্ন ছিল না। অনুমান করি, এই ত্রুটি সাময়িক। হয়তো সেদিন পুরনো পাচক ছিল না, কিংবা কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। পুনর্বার গেলে নিশ্চয় পুরনো স্বাদ ফিরে পাব। এই তো সেদিনের ঘটনা। এর মধ্যে এত পরিবর্তন হবার কথা নয়। যাইনি। কতবার আর আশাভঙ্গের ঝুঁকি নেব? সহ্য হবে না।

আবার চাচা

মুম্বইয়ের প্যারাডাইস কাফের স্বর্গ থেকে বিদায় হওয়াতে বিষণ্ণ হয়েছিলাম। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তজ্জনিত বিষাদের কথা গতবারে নিবেদন করেছি। স্মৃতি জড়িয়ে-যাওয়া গুলি-সুতার মতো। একজায়গায় টান দিলে অন্য কোথাও টান পড়ে। তেমনি প্যারাডাইসের কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত এখানে ওখানে আশাভঙ্গের কাহিনী মনে আসছে। স্মৃতি বহু সময় ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু চাচার হোটেলের স্মৃতি তো ম্লান হবার নয়। বরং যেন আরও বর্ণবহুল হয়ে পীড়ার কারণ হয়েছে।

নামেই হোটেল, আসলে স্থানটি ভোজনশালা। বৈকালিক। চারটে পাঁচটার আগে খোলে না। আটটা নাগাদ সবই প্রায় উঠে যায়, অর্থাৎ বাড়ন্ত হয়। তবু পরিমাণে বাড়িয়ে কেন প্রস্তুত করা হয় না। এ প্রশ্ন কৈশোরেও যেমন বিচলিত করত, এখনও তেমনি। অর্থাৎ, এখনও পৌঁছতে দেরি হলে সব খাদ্য না পেতেও পারেন। তবে সব খাদ্য বলতে তালিকা দীর্ঘ কিছু নয়। দীর্ঘ যদি হতও, ফাউল কাটলেট ছাড়া অন্য কিছুর স্বাদ নেবার জন্য কেউ এখানে তখনও যেত না। ভেবেছিলাম এখনও তাই।

হেদোর কাছে বিধান সরণির ওপর এই ভোজনশালাটির খ্যাতি বহুদিনের। পঞ্চাশ ষাট বছর হবে নিশ্চয়। আমরা যে যুগে চাচার হোটেল চিনতাম, তখন দিনকাল এত নির্মম ছিল না। কিন্তু চাচা বড় নিষ্ঠুর ছিলেন, বিশেষ করে সেই বালকটির প্রতি যার পক্ষে একটি কাটলেটের জন্য চারআনা সংগ্রহ করাই সহজ ছিল না। তখনও পঞ্চাশ টাকায় ভদ্রলোকের সংসার ভদ্রভাবে চলত। চারআনা তাই সামান্য ছিল না। একটি ফাউল কাটলেটের দাম তখন স্থির চারআনা। সেই দুর্লভ চারআনা যদি বা জুটল, তবুও কি ফাউল কাটলেটে রসনা-সংযোগ করা যেত? না, যেত না। কারণ ফাউল কাটলেট একটি

পাওয়া যেত না, মানে চাচা বিক্রি করতেন না। একসঙ্গে তিনটি কাটলেটের কমে চাচাতে পাওয়া যেত না। বহুকাল একযোগে সেই পরম সুস্বাদু, সুঘ্রাণ তিনটি কাটলেট খাবার ইচ্ছা স্বপ্নে পোষণ করেছি। কিন্তু বারআনা, অর্থাৎ পঁচাত্তর পয়সার অধিকারী হতে পারিনি। অতএব, আরও দুজন চারআনার অংশীদার সংগ্রহ করতে পারলে তবেই লক্ষ্মীলাভ হত। সে প্রায় সাধনার ব্যাপার ছিল। কোনও দিনই সিদ্ধিলাভ হল না।

অনেক পরে, যখন তিনটি কাটলেট একসঙ্গে আদেশ করবার অবস্থা হল, চাচাতে গিয়েছিলাম। পুরনো ছবির সঙ্গে প্রায় মিলে গেল। সাইনবোর্ড আর দরজার নতুন রং সামান্য ছন্দপতন করেছিল। ভেতরে প্রবেশ করে আশ্বস্ত হলাম। দেওয়ালে একযুগ কলি পড়েনি। পাঁচটি শ্বেতপাথরের টেবিল, এখন সময়ের অত্যাচারে মলিন, এখানে সেখানে ফাটল ধরেছে। পালিশের ওপর কালের আস্তরণ চড়ান গোটা কুড়ি চেয়ার। প্রবেশপথের পাশেই খাজাঞ্চি বসে আছেন। সেই চেনা ক্যাশ বাক্সটি নিয়ে। পিরিচের ওপর কিছু মৌরি। মাথার ওপর চারটি মস্ত হাঁড়ির ডি সি পাখা হাওয়া অপেক্ষা শব্দ বেশি বিতরণ করছে। ঘরের শেষ প্রান্তে প্রায়ান্ধকার রান্নাঘরের খোলা দরজা। খাট লুঙ্গিপরা একজন পরিচারক কাছে এসে দাঁড়াল। ভারী আশ্বস্ত বোধ করলাম। ছাদে নিয়ন আলো নতুন সংযোজন, ক্ষণিক ছন্দপতন ঘটিয়েছিল।

আমি তিনটি ফাউল কাটলেট আদেশ করে সাগ্রহ প্রতীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, পরিচারক জানতে চাইল তিনটি কাটলেটই বাড়ি নিয়ে যাব কিনা। বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর অচিরেই পাওয়া গেল। এখন আর তিনটি কাটলেট একসঙ্গে কিনতে হয় না, তাদের একাকী পাওয়া যায়। সেদিনের বালকটির বহু বছর পোষণ করা অভিলাষ দমন করে, আমি একটি কাটলেট অর্ডার করলাম। ক্লাসে বরাবর ভাল পড়াশুনা করেছে, পরীক্ষার ফল প্রত্যাশিত, এমন বালকের পরীক্ষার ফল জানতে গিয়ে মনের যেমন অবস্থা হয়, আমারও তেমনি। ফল তো জানা, তবু জানবার জন্য একটু অধীরতা এবং প্রত্যয়। সেই ছেলে সফল তালিকায় নিজের নাম না দেখলে যেমন ধাক্কা খায়, আমারও তাই হল। সেই বৃত্তাকার পাতলা পাকাসোনার রঙের পরিচিত কাটলেট, পাশে সেই পিঁয়াজ স্যালাড, কিন্তু এ তার কী স্বাদ? বলে বোঝাতে পারব না, কতখানি আশাভঙ্গ হয়েছিল।

এখন কাটলেটের দাম আড়াই টাকা। এঁদের ধারণা এঁরা মুরগির মাংসের বিকল্প আবিষ্কার করেছেন। বাজার চড়া, কাজেই বোধকরি সেই বিকল্প বেশি ব্যবহার করে এখানকার কাটলেট তৈরি হয়। সাধ্য কী তার আপনাকে স্বাদের সেই স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দেবে, যেখানে আসবার জন্য চার দশক আগে অনেক অধৈর্য প্রতীক্ষা করেছি। চাচার কাটলেটের বিশেষত্ব ছিল তার অনির্বচনীয় স্বাদ। থুড়ে নেওয়া কুক্কুট মাংসের ওপরে ডিমের আস্তরণে একটি মণিকাঞ্চন যোগ হত। এঁরা বিস্কুট গুঁড়া একেবারেই ব্যবহার করতেন না। তাজা মাংস, ডিম, ঘৃত ও পিঁয়াজের স্বাদ, আর নিদ্রাভঙ্গের পর সুখস্বপ্নের রেশের মতো আদার ক্ষীণ সৌরভ কী মায়াবী জগৎ রচনা করত, আজকের স্বর্গ থেকে পতনে সেটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং বেদনাদায়ক। তখন অন্যত্র কোথাও সালাদে আলুসেদ্ধ থাকত না। রাই থাকত মুখরা সুন্দরীর মতো ঝাঁঝাল। আমার যখন

সময় হল, তখন সবাই নিষ্প্রভ, নীরব।

শুনেছি, নদী এক তীর ভাঙ্গে, অন্য তীরে গড়ে। শুনেছি, কাল মেঘেরও রূপালি পাড় হয়। সেদিন চাচার শিক-কবাব আস্বাদ করে শোনা কথায় বিশ্বাস ফিরে এল। এঁরা যাঁকে শিক-কবাব বলেন, সেটা আসলে রোটি কবাবের সগোত্র, শিকে চড়িয়ে সেঁকা হয় বলেই বোধহয় এঁরা শিক-কবাব নাম দিয়ে দিয়েছেন। পেন্টুল পরলেই সবাই সাহেব হয়ে যায় না। নামে কিবা আসে যায়? চাচার শিক-কবাব যে কোনও উত্তম রোটি কবাবের সমকক্ষ। ছোট ছোট ছাগমাংসের খন্ড উপযুক্ত জারকরসে সিক্ত হয়ে সামান্য অগ্নিসংযুক্ত হলে যে অপার স্বাদ পায়, তার তুলনা হয় না। ভাসা ভাসা ধোঁয়ার গন্ধ সেই স্বাদকে আরও রমণীয় করে তোলে। সঙ্গে তীব্র কুচি পিঁয়াজ চাই। রাই বড় হতাশ করল, সে তীক্ষ্ণতা কোথায়। রাই তীক্ষ্ণ হলে স্বাদের সপ্তমস্বর্গে প্রবেশ আরও সুগম হত। সাড়ে চার টাকা দাম। অবশ্যই আনন্দ পাবেন।

তারও পরে একদিন চাচায় গিয়ে শিক-কবাবও হতাশ করেছিল। রসস্থ, সুঘ্রাণ মাংস খণ্ডগুলিকে বোধহয়, শুকনো তাওয়াতে চড়ান হয়েছিল, তাই নীরস; এবং সুঘ্রাণের চিহ্ন ছিল না। অনুমান করি, এই ত্রুটি সাময়িক। হয়ত সেদিন পুরান পাচক ছিল না, কিংবা কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। পুনর্বার গেলে নিশ্চয় পুরান স্বাদ ফিরে পাব। এই তো সেদিনের ঘটনা। এরমধ্যে এত পরিবর্তন হবার কথা নয়। যাইনি। কতবার আর আশাভঙ্গের ঝুঁকি নেব? সহ্য হবে না।

রোল, রোল

রবীন্দ্রনাথ সেই যে বলেছিলেন, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া—' মহাকবির অন্যান্য সুভাষিতের মতো এই কথা ক'টিও পরম সত্য। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শেখ হাসান রাজা এই শহরে এসে নিজাম নামের ভোজনশালার পত্তন করেছিলেন, রসিকজন ছাড়া আর কেউ এতদিন তাঁর খবর রাখেননি। এখন হঠাৎ পাড়ায় পাড়ায় রোলের দোকান হয়ে গিয়ে অনেকে খেয়াল করেছেন, এই কলকাতাতেই রোলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে। মানুষের রুচি ভারী বিচিত্র। এতকাল ধরে যে বস্তুর স্বাদ শুধু রসিকসমাজে আবদ্ধ ছিল, এখন সহসা সাধারণ্যে তার প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু আদি কবির কাব্য আর আধুনিক কবিতা তো সমান ওজনের নয়। তাই যিনি যতই বলুন যে তাঁর পাড়ায় যে ছেলেটি রোলের স্টল করেছে সেখানের মতো সুস্বাদু পদার্থ সর্বত্র হয় না, রসিক মানুষ এখনও নিজামে আসক্ত।

নিজামে ভোজ্য-তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু ভক্তেরা একেশ্বরবাদী। তাঁরা কাঠিরোলের বাইরে আর কোথাও মাথা নত করতে রাজি নন। মানুষের স্মৃতি বৃদ্ধের যুবতী প্রণয়িনীর মতো, বড় ছলাকলা করে। তার ব্যবহারের কোনটা সত্যি আর কোনটা অভিনয়, প্রণয়ী বুঝতে পারে না। আমার স্মৃতিকে বিশ্বাস করলে বলতে হয় চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম নিজামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তখন কাঠি কবাব আলাদা বিক্রি হত। এখনও অবশ্য কাঠি কবাব আলাদা আদেশ করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন পরটায় আবৃত কাঠি কবাবের উদ্ভাবন হয়নি। সেদিন এক পত্রিকায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক আমার ধারণার সমর্থন করেছেন। বলেছেন, জনৈক শ্বেতাঙ্গ কীভাবে আলাদা আলাদা পরটা ও কবাবকে কব্জা করবেন বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো হাত লাগাতেও

চাননি। নিজাম তৎক্ষণাৎ বিপত্তারণ মধুসূদনের মতো পরটা কবাবে মুড়ে নিম্নাঙ্গে একটু কাগজ জড়িয়ে মুহূর্তে সমস্যার সমাধান করেন। যুগপৎ একটি নতুন পদের উদ্ভাবন হল—কাঠি-রোল। তার সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষণেই আমরা তার মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছি। সে জাল এখনও কেটে বেরুতে পারিনি। আশ্চর্য হচ্ছি, কাঠিরোলের মোহে পড়তে কলকাতাবাসীর এতকাল লাগল কেন! অবশ্য আশ্চর্য হওয়া অনুচিত। আইনস্টাইন-এর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ কি বিজ্ঞানজগৎ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন? এই তত্ত্বের তাৎপর্য সম্যক অনুভূত হতে অনেক সময় লেগেছিল। তেমনি আর কী।

শেখ হাসান রাজা পুণ্যধাম বারাণসীর বাসিন্দা ছিলেন। পুণ্যভূমিতে কবাবের কী ঐতিহ্য থাকতে পারে ভেবে আকুল হয়েছি। হয়তো রাজাসাহেব এডিসনের মতো একজন উদ্ভাবক। দুজনের লাইনটা আলাদা। এই তফাত। জিজ্ঞাসা করব, তার উপায় নেই। এখন তাঁর নাতি দোকান পরিচালনা করেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে প্রতিযোগী আসতে বেশ সময় লাগল। বিহার থেকে এক সজ্জন পাশেই তাঁর ভোজনশালা খুললেন মধ্যপঞ্চাশে। নাম বিহার। তিনিও যথেষ্ট প্রসার করেছেন। কিন্তু আমি এখনও নিজামের পক্ষে। আমাদের কালে একনিষ্ঠতার আদর ছিল।

নিজাম কোথায় অবস্থিত নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। মধ্য কলকাতায় চৌরঙ্গি, এসপ্ল্যানেডের সন্নিকট, সিনেমা পাড়ার কেন্দ্রে হওয়ার দরুন, সন্ধ্যার শো-এর আগে ও পরে যথেষ্ট ভিড় হয়। শেষ শোয়ের পরও অনেকে আসেন। দোকান খোলে বেলা এগারোটায়। বন্ধ হয় মধ্যরাত্রিতে। ভিতরে সুপরিসর বসবার জায়গা আছে। সাধারণ খদ্দেররা সেখানে যান। রসিকেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সওদা করেন। ফুটপাতের ওপরই ভোজনসুখে মগ্ন হন। ধনবানেরা গাড়িতে বসে কাঠিরোলের সুখস্বাদ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বাড়িতেও নিয়ে যান।

কাঠি-রোলের উপাদান পরটা ও কবাব। কবাব ছাগমাংসের হতে পারে, কুক্কুটের অথবা গোমাংসের। যা আপনার পছন্দ। মাংস প্রস্তুত করা হয় টিক্কা কবাবের মতো। মাংসের কয়েকটি খণ্ড (হায়, মনে হয় তার সংখ্যা ক্রমশ কম হচ্ছে) সদ্যপ্রস্তুত পরটায় আবৃত হবার আগে কিছু কাঁচা পিঁয়াজের কুচি মিশ্রিত হয়, স্বাদ গন্ধের রকমফের করা যায়, আপনার পক্ষপাত অনুরূপ, কাঁচালঙ্কার কুচি, ভিনিগার বা লেবুর রস মিশিয়ে। কাঠিরোলে মাংস ও পরটার স্বাদ আপন আপন মহিমায় বজায় থাকে, অথচ দুয়ে মিলে আর একটি তৃতীয় স্বাদের মাত্রা সংযোজন করে। অনেকটা সংকর ধাতুর মতো ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যালয়, যে পদার্থে উভয় উপাদানের স্বকীয় ধর্ম অনেকগুলি উপস্থিত থাকে, কিন্তু কিছু নতুন গুণও আরোপিত হয়।

বিহার আর নিজামের ভোজ্যের মূল্য সমান। চিকেন-এগ-রোল, যা একালে সর্বাধিক জনপ্রিয়, তার দাম উভয় স্থানেই তিন টাকা। পরটায় ডিমের আস্তরণও অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন। ডিম বাদ দিয়েও নেওয়া যেতে পারে, দাম দু-টাকা। মটনের হলে আরও কম, ১.৪০ টাকা। বিরিয়ানিও পাওয়া যায়, ৫.৫০ টাকা। চিকেন-কারী ৫ টাকা। কিন্তু তাদের কথা থাক। যামিনী রায়ের কাছে পটচিত্র ছাড়া অন্য ছবি কেউ কি কিনতে যেত যে, আপনি নিজামে অথবা বিহারে, কাঠি রোল ছাড়া অন্য কিছু চাইবেন।

এই বিস্তীর্ণ শহর ও তার অচল যানবাহন ব্যবস্থায় সকলের পক্ষে সন্ধ্যার মুখে নিজামে যাওয়া সম্ভব হয় না। তা ছাড়া পাড়ার দোকানেরও একটু পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার। সুবিধাও অনেক। দুয়ার হতে অদূরে। তবে আমার ওইসব স্টলে গেলে নিজামের জন্য মন কেমন করে ওঠে। সমান সমান না হোক, ধারে কাছে পৌঁছয় এমন দোকানও কিছু আছে। তার মধ্যে আমার পছন্দ বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের কাছে গড়িয়াহাট রোডের ওপর, ফ্রস্টি। অর্বাচীন দোকান, সেদিনের। কিন্তু যেমন, দু একজন কমবয়সি ছেলেমেয়ের বোধবুদ্ধি ভাল হয়, তেমনি। উত্তম রান্নাবান্না হয়। পরিচ্ছন্ন। সমস্ত রন্ধনপ্রণালী আপনার সামনে হবে। মাঝে মাঝে একটু ভিড়ও হয়। সুখাদ্যের এই এক যন্ত্রণা। গুণীজনেরা ঠিক খবর পেয়ে যান। সেহেতু অভিজাত পাড়ায়, দাম একটু বেশি। চিকেন-এগ-রোল ৩.২৫ টাকা। অন্য দু একটা পদও আস্বাদন করে দেখতে পারেন। ছাদে উঠে চিৎকার করে বলার মতো নাহোক, ভাল। যেমন টিক্কা-কবাব'। নামটা অবশ্য ভুল। শামি কবাবের ধরনের। বোধহয় ডালের ভেজাল সামান্য, অথবা অনুপস্থিত। একটু ঝালের দিকে। ১.২৫ টাকার এই কবাবটি আবার একটু সুস্বাদ ঝোলে সিক্ত। এঁদের শামি কবাবের দামও ১.২৫ টাকা ওটা না খেলেও চলবে। অন্য কিছু যদি ইচ্ছা করেন, মাছের কচুরি নিতে পারেন, এক টাকা। গুণীজনেরা বলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ওপর জে'স শপের মাছের কচুরি আরও স্বাদিষ্ঠ। আমার এখনও পরখ করার সুযোগ হয়নি। আশা করি একদিন আপনাদের কাছে উপস্থিত করব।

ফরাসি দেশে নতুন মদের কদর নেই। পুরনো না হলে জাতে ওঠে না। পাড়ায় পাড়ায় নতুন স্টলের রোলের পসরা নতুন কিছু নয়, আসলে পুরনো মদের মতো কিন্তু নতুন বোতলে। সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার নয়। কিন্তু গুণী শিল্পীর মহফিলে মাঝে মাঝে না গেলে রুচি বিভ্রম হবে।
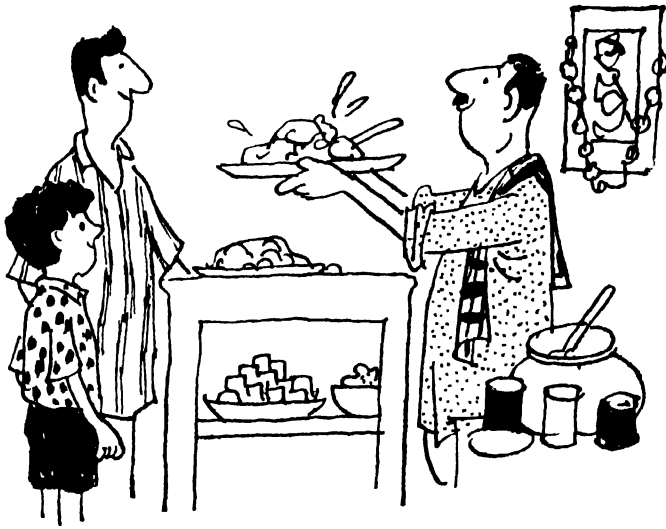
চাট

সত্যজিৎ রায় কোথায় যেন বলেছিলেন, চারুলতা ছবিটির প্রামাণিক আবহ সৃষ্টির জন্য তাঁকে অনেক অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। সেকালের পোশাক-আশাকের, খাট-পালঙ্কের ছবি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বিগত কোনও কালকে মূর্ত করতে হলে দৃশ্য বস্তুই যথেষ্ট নয়, তৎকালীন শব্দমন্ডলও সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়েছিল। যে কোনও শহর বছরে বছরে যেমন দৃশ্যত বদলায়, সেখানের শব্দ, কোলাহলের রূপও বদলাতে থাকে। আশি বছর আগে এই শহরে মোটর গাড়ির হর্ণ কদাচ কানে আসত, ট্রামের ঘড়ঘড় শোনাই যেত না। ব্রুহামের তীব্র ঠন-ন্-ন্-ন্ ঘণ্টাধ্বনি অশ্বক্ষুরের সঙ্গে সঙ্গত করে নিস্তব্ধ দুপুর বিদীর্ণ করত। এই শহরের শব্দমণ্ডলে খাবারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমাদের বাল্যের অনেক পরিচিত ধ্বনি এখন হয় স্তব্ধ, নয় সামান্য শোনা যায়। আলুকাবলি, ঘুঘনি, মুড়ি মিশেল, নকুলদানা, চানাচুর, পকৌড়ি—অনেকেই এখন ম্রিয়মাণ। একালের কৈশোর পরোটা-রোল, ডিমের ডালনা, ফুচকাতে আচ্ছন্ন। আমাদের সময়ে ফুচকা বা পানিপুরির সবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভেলপুরি, তো সেদিনের। পাওভাজি নেহাতই অর্বাচীন।

চাট উত্তর ভারতের প্রিয় জলখাবার—অবসরের খাদ্য। আগে চাটের স্বাদ নিতে হলে বড়বাজার বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যেতে হত। বড়বাজারে গ্যারেজের পাশে, বাড়ির রোওয়াকে কি ফুটপাথে দু-একজন সুবিখ্যাত চাটওলা বসত। তারপর চৌরঙ্গি অঞ্চলে হিন্দুস্থান রেস্টুর‍্যান্ট, আমার ধারণায় সর্বপ্রথম, পানিপুরিকে বিস্মৃত পাঠ বালকের ভূমিকা থেকে শান্তশিষ্ট ছাত্রের ভূমিকায় নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, টেবিল চেয়ারে বসে চাট খাবার ব্যবস্থা হল, আর অমনোযোগী ছাত্রের মতো স্ট্যান্ড আপ হয়ে থাকতে হল না। হিন্দুস্থান

রেস্টুর‍্যান্ট অভিনবত্বে প্রথম হয়েও নাম করতে পারলেন না। নাম হল জুনিয়র ব্রাদার্সের। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে বাংলা কালচারের সুরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে কায়েম হলেন। জুনিয়র ব্রাদার্সে (গুপ্ত ব্রাদার্স, মিষ্টান্নের দোকানের পাশে) দেখতে পাবেন অবাঙালির চেয়ে বাঙালির সংখ্যা বেশি। খাদ্যাদির দাম যথেষ্ট বেশি হওয়া সত্ত্বেও। তার মানে বাঙালি উত্তর ভারতীয় জলখাবার আত্মসাৎ করেছে, পানিপুরি এবং বহুবিধ চাট।

জুনিয়ার ব্রাদার্সের খ্যাতি তাদের চাটের জন্য। দোকানটির দুটি অংশ। সামনের অংশে কাচের শোকেসে খাদ্যাদি সজ্জিত থাকে। বিদেশি কাফেটেরিয়ার মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়। টেবিলের বিকল্প দেওয়ালে তাক লাগানো আছে। অথবা, কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসেও খাওয়া যায়। জন কুড়ি বসার মতো টেবিল বেঞ্চি আছে। চাট খেতে হলে দুটি অনভ্যস্ত স্বাদের সঙ্গে বাঙালি রসনার মিত্রতার প্রয়োজন। প্রথম, অমিষ্ট দই, দ্বিতীয় বিট নুন। বিট লবণের বিচিত্র গন্ধ ছাড়া চাট কল্পনাই করা যায় না! যাঁরা সিংহ-হৃদয় নন, তাঁরা বাটুরা খেতে পারেন ছোলা সহযোগে। দু-টাকা এক প্লেটের দাম। কিন্তু পদটি নিতান্ত মামুলি। এইখানে আজ যে দুটি বস্তু সহজেই আপনার মনোহরণ করবে, কোনও অজ্ঞাত এবং অপ্রকাশিত কারণে সে দুটি শুধু সকালে পাওয়া যায়। আলুর তরকারির অনুপান সহযোগে ছোট কচুরি এবং জিলিপি। প্রথমোক্ত ১.৬০ টাকা প্লেট। দ্বিতীয় ১ টাকা। এই কচুরি জুনিয়রের বিশেষত্ব। আক্ষেপের কথা বিকালে পাওয়া যাবে না। পরিবর্তে হিং কচুরি আস্বাদন করতে পারেন। ভাল, নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্য কোথাও পাওয়া যায় না এমন নয়। এর পর পানিপুরি বা ফুচকা। এখনও পর্যন্ত দই বা বিট নুনের রাজ্যে প্রবেশ হয়নি। পাঁচটি ফুচকা ১.২৫ টাকা। আমার অনুরোধ এখানে ফুচকা খাবেন না। প্রথমত, এদের তেঁতুলের জল অত্যন্ত জোলো। পুরে মরিচমশলা সামান্য। সর্বোপরি, কখনও কখনও পানিপুরিগুলি মুচমুচে থাকে না। আর পানিপুরি মুচমুচে না হলে ফুচকা গ্রহণ করাই বৃথা। স্বাদের অর্ধেকও প্রাণে পৌঁছবে না।

এদের একটি পদের প্রতি আমাদের পক্ষপাত। বিনা দ্বিধায় বলতে পারি এত উচ্চাঙ্গের আলু টিক্কা আমি কখনও খাইনি। চানা বা ছোলা সহযোগে—৫ টাকা দাম। কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না কেন? তাও অজ্ঞাত। খেতে গেলে আপনাকে যেতে হবে পার্ক স্ট্রিট। সেখানে এদের নতুন শাখায় এই অসাধারণ পদটি পাওয়া যায়। সাধারণ টিক্কাকে অস্ত্রোপচার করে দুটি গোলার্ধে ভাজা হয় বলে কি এই টিক্কা এত সুস্বাদু?

এবার বিট নুন ও দই-এর রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। বিবিধ চাটনির বিবিধ স্বাদ, মিষ্ট, অম্ল তীব্র। দই, বিট, নুন ও লঙ্কার বিরোধী সুগন্ধ। সব মিলে অকস্মাৎ দক্ষ পরিচালকের বৃন্দবাদনের ঐকতানের মতো আপনার রসনাকে ঝংকৃত করবে। আপনি কচুরির ভক্ত না হলে মিক্সট চাট নিতে পারেন। ওই এক দাম, ২.৫০ টাকা। কচুরির খণ্ড পাবেন এ ছাড়া আলু এবং পাপড়ি। স্বাদের অতিরিক্ত, স্পর্শের বৈচিত্র—শক্ত কচুরি, নরম-আলু, নাতি নরম পাপড়ি আপনার রসনাকে অপার আনন্দ দেবে। চাটের সুবিধা হল এই যে কিছুক্ষণ পরে আপনি নিজেই সঙ্গীতসভার কন্ডাক্টরের ভার নিতে পারেন। শ্রোতা বা সমঝদার যখন আপনিই এবং একমাত্র আপনি, তখন ইচ্ছামতো বিবিধ অনুষঙ্গের মেকদার নির্ণয়

করে কন্ডাক্টরের ভূমিকা পূর্ণ করবেন। একটু বিট নুন মেশান, মনে হবে ক্ল্যারিওনেট এবার জোরে বাজছে, তেঁতুলের চাটনি বাড়িয়ে দিয়ে যেন পিয়ানোকে জোরালো করলেন। অথবা লঙ্কা গুঁড়ো মেশালেন একটু,—করতাল ঝমঝমিয়ে উঠল।

দুজনে গেলে দুটি পদ আদেশ করবেন। ভাগ করে খেতে পারেন, তাতে বৈচিত্র বেশি হবে, আনন্দও। ভোজনের পর যদি মিষ্টান্নের ইচ্ছা হয়, কুলফি ছাড়া অন্য কিছু আদেশ করবেন না। এরা জাফরানের স্পর্শ দিয়ে উত্তম কুলফি প্রস্তুত করেন। মাপে বড় নয়, দাম ৩ টাকা। সুগঠিত কুলফি জিহ্বার স্পর্শে মুহূর্তে দ্রবীভূত হয়ে স্বাদ ও গন্ধে আপনাকে বশ করবে। বাদামের সরবত, ৪ টাকা দাম। তৃষ্ণার্ত হলেও পান না করাই বিধেয় হবে, এমন মোহনীয় গন্ধ। যদি সত্যিই আপনার বাদামের সরবতের ইচ্ছা হয়, কখনও মুম্বই গেলে সেঞ্চুরি বাজারের ভেতরে নীচের তলার রেস্টুর্যান্টে সরবত পান করবেন। অমৃত সমান।

চৌরঙ্গির রংমহল

আমি লক্ষ করে দেখেছি কোমল কার্পেটে আচ্ছাদিত গৃহতলে যেমন জুতোর শব্দ পাওয়া যায় না, মানুষের গলার স্বরও সেখানে কেমন নম্র হয়ে আসে। ডবল দরজা পার হয়ে রংমহলে পা দিতে যখন বেশ ঘন কোলাহল কানে এসে বাজল তখন সেই কথাটাই মনে পড়ল। রংমহলের মেঝেতে কার্পেট নেই, যদিও রংমহল উচ্চকুল-সম্ভূত। কারণ রংমহল বিলাসিতার উচ্চভূমি গ্র্যান্ড হোটেলের রেস্টুর‍্যান্ট। অনেক দিন পরে আবার রংমহলে গিয়েছিলাম। আগে এত লোক সমাগম ছিল না। এখন দেখলাম অতিথির সংখ্যা কম নয়। আমার জুতোর ক্ষুর-ধ্বনি প্রচণ্ড আলাপচারীতে নিঃশেষে হারিয়ে গেল। অথচ এই গ্র্যান্ডের অন্য রেস্টুর‍্যান্ট পলিনেশিয়াতে যান, দেখবেন আপনার চলাফেরা ধীর হয়ে আসবে, কণ্ঠ নম্র। পরিচারককে ডাকবেন এতই নত কণ্ঠে, মনে হবে নিজের সঙ্গে কথা বলছেন।

গ্র্যান্ড হোটেলের বিশাল অট্টালিকার উত্তরাংশে রংমহল। প্রবেশদ্বার চৌরঙ্গি টেরেসের ওপর। কেবল বাইরের রাস্তা দিয়েই ভোজনশালাটিতে প্রবেশ করা যায়। গ্র্যান্ডের অন্যান্য মহার্ঘ ভোজনশালাগুলির মতো হোটেলের প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায় না। রংমহলের অবস্থা কেমন যেন ধনীর ত্যাজ্যপুত্রের মতো। অনুমান করি, যখন সরকার বড় হোটেলের রেস্টুর‍্যান্টগুলির ওপর বিলাস-কর ধার্য করেছিলেন, তখন এই ভোজনশালাটিকে দৃশ্যত গ্র্যান্ডের সম্পর্কচ্যুত করে বিলাস-করের এক্তিয়ারের বাইরে আনা হয়েছিল। অতিথিরা শতকরা ১৫ টাকা বিলাস-কর থেকে আইনসঙ্গত অব্যাহতি পেয়েছিলেন। ফলে আমার মতো অতিথিদের সুবিধাই হয়েছে। রংমহল রেস্টুর‍্যান্টের মূল্যস্তরও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে।

রংমহলে অনেক অতিথি থাকা সত্বেও স্থান পেতে অসুবিধা হল না। শতাধিক আসনের বেশ কিছু তখনও খালি ছিল। মেঝেতে কার্পেটের আবরণ নেই যদিও, রংমহল রূপচর্যায় কিছু নিকৃষ্ট নয়। ফরমাইকা ঢাকা পাটকেল রঙের পরিচ্ছন্ন টেবিল, গদিযুক্ত চেয়ার, ছায়া-ছায়া আলো। ছাদ থেকে প্রলম্বিত দীর্ঘ রজ্জুর শেষে মস্ত পেতলের শেজ সংকীর্ণ বৃত্তে টেবিলটির ওপর আলো ফেলছে। দেওয়ালে পিপলির আপ্লিকের রঙিন কাজ। তার সবুজ ও নারঙ্গি রং ভোজনকক্ষের মৃদু আলোতেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল পরিবেশ।

এতক্ষণে পরিচারক আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই পানীয়ের তালিকা উপস্থিত হবে। মূল্যবান উষ্ণ পানীয় না চাইলে জিরাপানির ক্ষুদ্র গেলাস নিতে পারেন— ২ টাকা। নির্ভেজাল উত্তর ভারতীয় প্রকৃত জিরাপানি, ভারী আরামদায়ক। শুনেছি ক্ষুধাবর্ধকও। যদি তৃষ্ণার্ত হন ফ্রেশ লাইম অ্যান্ড সোডা আদেশ করবেন—হিমশীতল হলে অচিরে তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি নিবারণ করবে। তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাকা দাম।

এবার আহার্য নির্বাচন করতে হয়। কাজটা খুব কঠিন নয়। কারণ, তালিকা দীর্ঘ হলেও অতিদীর্ঘ নয়—দু পাতা। ভারতীয় অর্থাৎ পঞ্জাবি আহার্য পাবেন, তন্দুরে অথবা চুল্লিতে প্রস্তুত হয় এখানে, আশ্চর্য, রেশমি বা রুমালি রুটি পাওয়া যায় না। অথচ, আপনি প্রথম যে পদটি আদেশ করবেন রুমালি রুটি তার যোগ্য সহকারী। আপনি দিতে বলবেন মটন বরা কবাব। আমার অভিজ্ঞতায় এই পদটি এই ভোজনশালার বিশেষত্ব। সুগন্ধী, তপ্ত, অতি কোমল।

তিনটি সুনির্বাচিত মাংসখণ্ড দাম ১১ টাকা। তন্দুরে প্রস্তুত করলে মাংসের অংশত চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। মাংস বলে অবশ্যই চেনা যায়, কিন্তু আরও কিছু অপরিচিত নতুন স্বাদ সংযুক্ত হয়। সেই নতুন স্বাদ যে কত সুখের রংমহলে বরা কবাব খেলে সম্যক অনুভব করবেন। সঙ্গে একটা কাঁচা পিঁয়াজ পশ্চাৎপটে মৃদু সঙ্গীতের সমতুল কাজ করবে। রুমালি রুটি নেই, অভাবে তন্দুরি রুটি নিয়েছেন, কিংবা নান।

এখানে তন্দুরি রুটি মামুলি—এক টাকা। নান অপেক্ষাকৃত ভাল। ২ টাকা। এই শ্রেণীতে এঁদের আর একটি রচনা আছে, খাস্তা রুটি। জোয়ান ও নুন দিয়ে তৈরি এই রুটি গুণীজনের হাতে অপূর্ব রূপ পায়। এখানে খাস্তা রুটির একমাত্র গুণ অধিক ময়ান। প্রকৃত খাস্তা রুটি পাবেন দিল্লির মোতিমহলে। তাঁরা অবশ্য নাম দিয়েছেন, নমকওয়ালি রোটি।

তন্দুরির অন্য পদের মধ্যে মুরগি এবং মুরগির টিক্কা কবাব উল্লেখযোগ্য—১২ টাকা করে দাম, কিন্তু স্বাদ এমন নয় যে মনে থাকবে। এখানে শিক-কবাব নিশ্চয় আহার করবেন না। শিক-কবাব যে কী ধরনের অলৌকিক পদার্থ হতে পারে, এঁদের ধারণাই নেই। আর একটি পদ অবশ্যই পরিহার করবেন, চিকেন বাটার মশালা। ১২ টাকায় দুখণ্ড মুরগির মাংস, থকথকে মশলায় মণ্ডিত—বোধ হয় পোস্তর আধিক্য। বাটার অর্থাৎ মাখনের হদিস পাওয়া কঠিন। নেহাত যদি অন্য কোন পদ আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, মটন রোগন জোস অথবা শাক মিট পরীক্ষা করতে পারেন—৮.৫০ টাকা। রংমহলে আর একটি পদ আমাকে অত্যন্ত হতাশ করেছে ব্রেন মশালা। ব্রেনের সঙ্গে অবান্তর কিছু

সবজি মিশিয়ে এঁরা যে ঘণ্টটি রচনা করেন সেটি ভদ্রলোকের পাতে দেবার নয়, দাম দিয়ে কেনবার তো নয়ই। সবজিতে বরং দুটি উত্তম পদ পাবেন এখানে। প্রথম, পালং ক্রিম। বিলিতি ঢঙে পালং শাক রান্না, ওপরে একটু ক্রিম দেওয়া, কিন্তু পরম সুস্বাদু। আর দ্বিতীয়, চনা পিন্ডি। ছোলার এই পরিচিত পদটি এখানে আপনার ভাল লাগবে।

তা হলে দাঁড়াল এই যে, রংমহলে মটন বরা কবাবের স্বাদ নেবার পর আর কোনও পদ দাঁড়ায় না, তাই না? তাতে অবশ্য লজ্জার কোনও কারণ নেই। একটি পদই বা কটি ভোজনশালায় এমন প্রস্তুত হয় যে আপনার বারবার আসবার ইচ্ছা হবে? এঁদের বরা কবাবই যথেষ্ট। বিদেশে বহু ভোজনশালায় কেবলমাত্র একটি পদই পরিবেশিত হয়, যে পদের সৃষ্টির জন্য তাঁরা গর্বিত। এমন বহু শিল্পীর কথা আপনার মনে পড়বে যাঁরা একটি মাত্র ছবির জন্য অমর হয়েছেন। জাপানে দেখেছি, স্টেকহাউস আছে রাশি রাশি। তাঁরা শুধু প্রস্তুত করেন। তাই বলে সেখানে রসিকজনের ভিড় কিছুমাত্র কম নয়। আপনি যেদিন স্টেক না ভোজন করে তেম্পুরার ইচ্ছা করবেন সেদিন কোনও তেম্পুরা বারে যাবেন—যাঁরা শুধুই তেম্পুরা রন্ধন করেন। শিল্পীর দক্ষতা একটিমাত্র ছবিতেই স্পষ্ট হতে পারে, তার জন্য তো তাঁর বহু ছবি আঁকবার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকাতেও এমন বিশেষ দোকান অজস্র, যাঁদের ব্যুৎপত্তি একটিমাত্র পদ রচনায়।

শেষ পদ মিষ্টান্নের আশা করবেন না রংমহলে। উল্লেখযোগ্য কিছু দেবার নেই এঁদের—এক কুলফি ছাড়া। এখানের কুলফি আপনার মনে চিরস্থায়ী দাগ কাটবে না, কিন্তু আহারের সময় আনন্দ পাবেন। তবে, লোডশেডিং-এর দাক্ষিণ্যে সব দিন কুলফি পাওয়া যায় না। ৫ বা ৬ টাকা দাম। বেশি হলেও ক্ষতি ছিল না, পাওয়াই যায় না যখন।

লোডশেডিং-এর কথায় আর একটি বিষয় মনে পড়ল। রংমহল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। মনে হবার কথা। ওই অঞ্চলে নিষ্প্রদীপ হলে, রংমহলে তাপ নিয়ন্ত্রিত হয় না। বন্ধ ভোজনকক্ষটি ক্রমশ গরম হতে থাকে। ওই হোটেলের আর সব ভোজনকক্ষে জেনারেটর কাজ করে। লোডশেডিং তাদের জব্দ করতে পারে না। ত্যাজ্যপুত্রকে তার পরিবার বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত করলেও আমরা বাইরের লোক তার গুণের কদর করব না কেন?
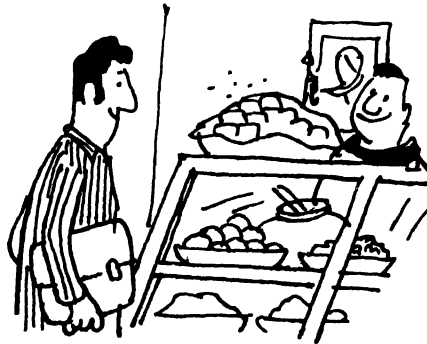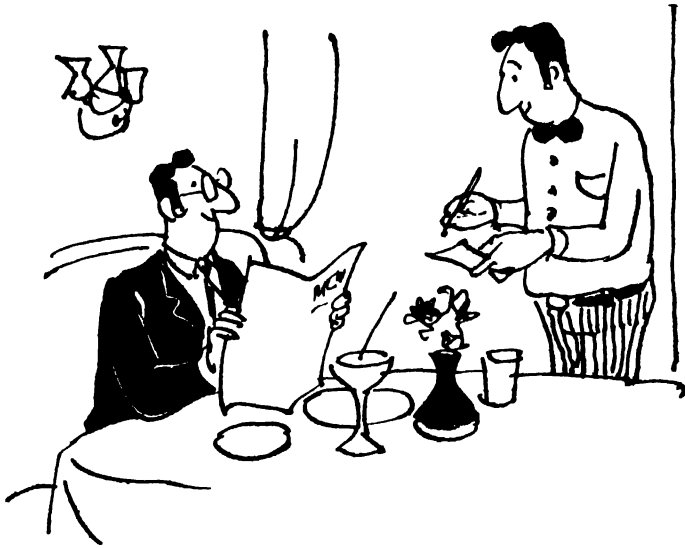
পার্ক স্ট্রিটের তারকা

আজকের কলকাতার অন্যতম অভিজাত জনপথ পার্ক স্ট্রিট। কল্পনা করা কঠিন যে একদা এই পার্ক স্ট্রিট দিয়ে মানুষ একা যেতে ভয় পেত। তখন অবশ্য পার্ক স্ট্রিট নাম ছিল না। বলা হত, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, বাংলায় কবরখানার রাস্তা। পার্ক স্ট্রিটের পূর্ব সীমান্তে যে সমাধিক্ষেত্র আছে, সেটি তখন, ১৭৬৮ সালে, তৈরি হয়েছে। শবযাত্রীরা লোক-লস্করের বল না থাকলে দিন-দুপুরেও ওই পথে যেতে খুব সাহস পেত না। এখন যেখানে লরেটো স্কুল, সেইখানে প্রধান বিচারপতি সার এলিজা ইম্পের বিশাল অট্টালিকা এবং একটি মস্ত পার্ক ছিল—মৃগদাব। অনেক পরে এলিজা ইম্পের পার্কে যাবার রাস্তা হিসাবে কবরখানার রাস্তার নতুন নামকরণ হল পার্ক স্ট্রিট। কলকাতার আর সব রাস্তা যখন লোডশেডিং-এর দাপটে তিমিরাচ্ছন্ন হয়, তখনও পার্ক স্ট্রিট আলোয় ঝলমল করে। এই জনপথ তাই অনেক রাত্রি পর্যন্ত অকুতোভয়। পুরনো সেই কবরখানার রাস্তা এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্রমোদ-অঞ্চল, ইংরেজিতে যাকে বলে এনটারটেনমন্ট ডিস্ট্রিক্ট। লন্ডনের সোহো আর টোকিয়োর আকাসাকার সগোত্র।

পার্ক স্ট্রিট কিন্তু শুধু জ্ঞাতি-সূত্রেই এনটারটেনমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট। অন্ধের দেশে কানাও পদ্মলোচন। সোহো কি আকাসাকার মতো এখানে নাইট ক্লাব নেই। কদাচিৎ কোনও ভোজনশালায় নর্তকীর আবির্ভাব হয়। তারাও অধিকাংশ এখন নাট্যমঞ্চের ক্যাবারেতে ভূমিকা পাবার পর, অতিথিরাই পাশ্চাত্য নৃত্যে জোড়ায় জোড়ায় অবতীর্ণ হয়ে বাকি অতিথিদের নাইট ক্লাবে আসার আশ মিটিয়ে থাকেন। ভোজনশালাগুলি অবশ্য অভাব মেটাবার জন্য ব্যান্ড বা বাজনার আয়োজন করেন। আজকাল যেমন হয়েছে, শোরগোল বেশি, সুর খুঁজে বার করতে হয়। যাতে সব সহনীয় হয় তাই অধিকাংশ রেস্টুর্যান্টে

আহারের টেবিলে মদ্যাদি পাওয়া যায়। মনে একটু নেশা না ধরলে কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো সম্ভব?

পার্ক স্ট্রিটের মোহিনী-রূপ মাত্র বারো চোদ্দ ফুট উঁচু। একতলায় মহার্ঘ দোকান ও ভোজনশালা, তার ওপরে আলো থাকে না। দিনমানে দোতলার দিকে নজর করলে দেখবেন, ইট বেরিয়ে পড়ছে, যত্নের চিহ্ন নেই। দোতলার পুরনো ভাড়ার গৃহস্থ বাড়ির মালিকের নেকনজর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এখন দুটি ভোজনশালা দোতলাও দখল করেছে—বার্বে কিউ এবং তন্দুর। সেই অংশে আলোর ছটা ঊর্ধ্বগামী।

উত্তর দিকের ফুটপাথে চৌরঙ্গি থেকে অনেকটা এগিয়ে পার্ক স্ট্রিটের যেখানে স্কাইরুম রেস্টুর‍্যান্ট, সেখানে আলোর ঘটা কিছু কম। ভেতরে, প্রশস্ত ভোজনকক্ষে আলো স্তিমিত হলেও যথেষ্ট। অনায়াসে ভোজ্যতালিকা পড়া যায়। কিন্তু তার আগে আপনার টেবিল পাওয়া দরকার, এবং সে কাজটি সহজ নয়। প্রায় কোনও সময়েই অগ্রিম আসন সংরক্ষিত না করলে স্থান পাওয়া যায় না। অন্য ভোজনশালার মতো এঁরা অপেক্ষমান অতিথিদের দাঁড়িয়ে থাকা পছন্দ করেন না। তাই ফিরে আসতে হয়। নিন্দুকেরা বলেন, স্কাইরুম উটকো লোকদের আসন দিতে চায় না, টেবিল খালি থাকলেও উদাসীনকণ্ঠে বলে ও আসনগুলি সংরক্ষিত। যে কারণেই হোক অতিথিরা বেশ শান্ত। নাতিউচ্চ কণ্ঠে আলাপচারী হয়। অন্য টেবিলের কেউ আপনার বিঘ্নের কারণ হয় না।

স্কাইরুম শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। লাল ছাপা গভীর কার্পেটের ওপর নরম, আরামদায়ক চেয়ার। দেওয়ালে হালকা ফ্রেস্কোতে সুরুচির পরিচয়। ছাদে তারাখচিত আকাশের প্রতিরূপ—যার থেকে নাম স্কাইরুম। স্কাইরুমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৬ সালে। সুখাদ্যের এমনই মহিমা যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রসিক-সমাজের প্রশস্তি পায়। ৬০/৬৫টি আসন, রাত্রের আহারের সময় পূর্ণ থাকে।

রবীন্দ্রনাথের রাজা যেমন বলেছিলেন, সাজাব না ফুলের হারে/সোহাগ আমার মালা করে/গলায় তোমার পরাব, স্কাইরুমেরও ধরনটা তেমনি। রূপে ভোলাবার আয়োজন নেই। স্কাইরুম আপনাকে মোহিত করতে চায় তার শিল্পে, কৃতিতে। তাই এখানে পানশালা বা বলরুম ড্যান্সিং-এর ভূষণভার নেই, এমনকী ব্যাণ্ড নেই যা আহার্য থেকে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবে।

এতক্ষণে ভোজ্যতালিকা এসে গিয়ে থাকবে। আপনি আদেশ লেখাবার আগেই একজন পরিচারক আপনার টেবিলে ছোট ছোট রেকাবে কিছু আখরোট, কিশমিস এবং লবণসংযুক্ত পেস্তা রেখে যাবে। খাদ্য নির্বাচন করা সহজ হবে না। মিষ্টান্নাদি বাদ দিয়েও ১৮৯টি পদ পাবেন। হলফ করে বলতে পারব না সব কটি পদ আস্বাদন করেছি। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যখন যে পদের স্বাদ নিয়েছি, কখনও আশাভঙ্গ হয়নি। আপনি সুবিধামতো আপনার মনোমতো নামের আহার্যের সঙ্গে পরিচয় করবেন, আমি আপাতত কয়েকটি পদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।

স্কাইরুমে মদিরা পাওয়া যায় না, আগেই বলেছি। তবে এখানে ফল-জাত পানীয় একটা অবশ্যই নেবেন। আমার পক্ষপাত অরেঞ্জ ব্লসম। কমলালেবুর সুগন্ধি রসে, একটু বুঝি আনারস মেশানো, আর ডিমের শ্বেতাংশ দ্বারা সফেন এবং হিমশীতল। স্বাদের

বর্ণনা করব না। কিন্তু আমার প্রত্যয় আপনি আনন্দ পাবেন। দাম ৯ টাকা।

আমার আর একটি প্রিয় পদ আছে এখানে, প্রধান আহার্যের উপক্রমণিকা, প্রন ককটেল। প্রন ককটেল বড় চেনা জিনিস, প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কী জাদু আছে এঁদের সসে, ওই চেনা পদার্থই অসামান্য হয়ে ওঠে। একটু তাবাস্কো, সিলবাস্কো নিশ্চয় মেশাবেন। এঁদের ককটেলে সস একটু বেশি তরল, খানদানি ধারার অনুসারী নয়, কিন্তু সেটাই তার বিশেষত্ব। মনে হবে প্রন ককটেল এমনটিই হওয়া উচিত। এরও দাম ৯ টাকা।

এবারে প্রধান খাদ্যে আসা যাক। কী খাবেন, মাছ, না মাংস? কীসের মাংস? অসময়েও ভাল স্মোকড হিলসা পাওয়া যায়, ২৫ টাকা। অথবা নিতে পারেন প্রন থামিডর। ছোট ছোট চিংড়িমাছ সাদা কোনও সসে জারিত হয়ে চিজের আস্তরণে চড়িয়ে স্বাদে আপনাকে সম্মোহিত করবে। দামেও ১৮ টাকা। যদি মাংস নিতে চান, মুরগির সুপ্রিম দ ভোলেই আমার মন টানে। এখানে সস সাদা নয় ব্রাউন। দিগন্তের বংশীধ্বনির মতো ঈষৎ রসুনের সুগন্ধ। অথবা চিকেন আলা কিয়েভ নিতে পারেন। এই পদার্থটির স্থাপত্য আমাকে যত মুগ্ধ করে, স্বাদ তত নয়। দাম ২৫ টাকা। কী উপায়ে অমন কুক্কুটমাংসের খোল তৈরি হয় আমার কাছে চিরকালের বিস্ময়। তবে সুস্বাদ চিকেন কিয়েভের রাজা হল, মুম্বইয়ের গেলর্ড। তার বর্ণনা আর একদিন শোনাব। অথবা, হ্যাম স্টেক নিতে পারেন—ব্রাউন সস এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের, তা ছাড়া প্রচুর মাশরুম, ১৮ টাকা।

বলা হয়নি, ইতিমধ্যে আপনার প্লেটে একখণ্ড তরমুজ দিয়ে গেছে, (অন্য সময়ে আমও) আর দেবে এ বাড়ির সালাদ। বিনামূল্যে।

মিষ্টান্নের জন্যও স্কাইরূমের খ্যাতি আছে। একটা জুকোটা অবশ্যই আদেশ করবেন। ১০ টাকা। দুজনে ভাগ করে খেতে পারেন। এখানেও স্থাপত্যের কৌশল আছে। ক্রিম ও ফলের মিশ্রণের ওপর চকোলেট স্পঞ্জের সুদৃশ্য আস্তরণ। স্বাদে অবশ্যই অপূর্ব—১০ টাকা। আরও দু-একটা স্বাদিষ্ঠ মিষ্টান্ন আছে। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক—৮ টাকা, আমণ্ড সুফলে ১০ টাকা।

দুজনের ভোজনে প্রায় একশো টাকা খরচ হল। তবু গায়ে লাগবে না। জীবনে কটা সুখই বা টাকা দিয়ে কেনা যায়?

খানদানী

আমাদের বাল্যকালে কলকাতায় মোঘলাই ভোজ্যের প্রবক্তা হিসাবে আমজাদিয়ার নাম ছিল। শোনা যেত তাঁরা নাকি বিশুদ্ধ ঘৃত ছাড়া ব্যবহার করেন না। চিৎপুর রোডের অন্তঃস্থলে কোথায় তাঁদের ভোজনশালা ছিল কখনও যাওয়া হয়নি। যুদ্ধের পর, সম্ভবত আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশ সালে তাঁরা সোসাইটি সিনেমার দ্বিতলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একবারই সেখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। কী আহার করেছিলাম, কিছুই মনে নেই। শুধু এইটুকু স্মৃতিতে আছে, অনেক পদের মধ্যে শাজাহানী পোলাও নেওয়া হয়েছিল, যার স্বাদ মুহূর্তে রসনা ঝংকৃত করেছিল। প্রায় একই সময়ে, হয়তো বা কিছু আগে ওই অঞ্চলে আমিনিয়া রেস্টুর‍্যান্টের প্রতিষ্ঠা হয়। সালটা ১৯৪৭। তখন আমিনিয়ার আতিথ্য গ্রহণ হয়নি। দূর থেকে এক নম্বর কর্পোরেশন স্ট্রিটের ওপর ব্যস্ত ভোজনশালাটি দেখেছি। অনায়াসে অগ্রাহ্য করে দুপা এগিয়ে নিজামে গিয়েছি।

আমিনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মধ্য সত্তরে। বড় রাস্তার ওপর, কর্পোরেশন ভবনের পূর্বদিকে ভোজনশালা। মস্ত একটি ঘর। সত্তর-আশিজন অতিথি স্বস্তির সঙ্গে বসতে পারেন। নিয়নের আলোয় উজ্জ্বল। জনসমাগমে সর্বদা গমগম করছে। মর্মর মেঝে। পরিবেশন দ্রুত। ফলে, অনবরত, লোক যাতায়াত করছে। শান্তি চাইলে এবং সপরিবার গিয়ে থাকলে ভিতরে দশটি ফ্যামিলি রুমের একটি নিতে পারেন। নিভৃতে ভোজন হবে, কিন্তু তেমনি ভরা হাটের মজা থেকে বঞ্চিত হবেন।

পাঠকের কি মনে আছে, দিল্লি দরবারের কথা? না, দিল্লি রাজদরবার নয়, মুম্বইয়ের দিল্লি দরবার ভোজনশালা। অনেকটা সেই ধরনের। তবে লোকজন

অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু তেমনি ব্যস্ত। কারও মুহূর্তেও বিশ্রাম নেই। ঢুকেই দেখি ক্যাশ রেজিস্টার নিয়ে খাজাঞ্চি বসে আছেন। সভয়ে ভেবেছিলাম, খাবার-দাবারও আধুনিক হতে আরম্ভ করেছে নাকি। খাবার আসার পর উদ্বেগ কাটল। একই রকম আছে। সেটাই এই সব ভোজনশালার বিশেষত্ব। এই বিপদসংকুল মূল্যমানের ঝড়-ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও এরা মাথা ঠাণ্ডা করে আপন ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। দাম কিছু বেড়েছে অবশ্য। কিন্তু সামান্য।

আমিনিয়াতে আমার অনুরাগ মটন চাঁপের ওপর। শুনে ভাবছেন, আমি কি তবে রসনালোভন, রয়্যালের চাঁপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি? আদৌ নয়। ঘরানা এক হলেও আমিনিয়ার চাঁপের গায়কি আলাদা। এখানে তেল মশলার পরিমাণ একটু বেশি। এবং মাংস খণ্ডগুলি পাকের পর তাদের সত্ত্বা হারিয়ে না ফেলে স্বমহিমায় স্বতন্ত্র। জাফরানের স্বাদ আঘ্রাণ আছে বলে মনে হয় না। সেজন্যই হয়তো বিশেষ। অতি উত্তম স্বাদ। এক পাত্র মটন চাঁপ ৩.৫০ টাকা। চিকেন চাঁপও পাওয়া যায়। দাম ৮ টাকা। আমার খুব মনোমতো নয়। তবে যাঁরা কুক্কুট মাংসের ভক্ত তাঁরা পরীক্ষা করতে পারেন।

আমিনিয়াতে আর একটি পদ আপনার মনোহরণ করবে। আমিনিয়ার স্পেশাল কারি। মেষ বা ছাগ মাংসের। রোগন জোসের ধরনে রান্না। অপূর্ব স্বাদ। এর বেশি বোঝানো কঠিন। অবশ্যই স্বাদ নেবেন, ৪ টাকা। চার টাকাতে আমিনিয়াতে আর একটি পদ পাওয়া যায়। রেজালা। সাবিরের বিশ্রুত রেজালার পর আর কারও রেজালা মনে ধরবার নয় তবুও এক পাত্র রেজালা আদেশ করেছিলাম। সত্যিই মনে ধরল না। সেই অফ হোয়াইট রঙের ঝোল, অখণ্ড লাল লঙ্কা একটি তার শোভা বর্ধন করছে, স্বাদ-গন্ধও প্রখর করছে, সুনির্বাচিত পুরু চরিত্র আস্তরণ দেওয়া এক খণ্ড মাংস। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু কোথায় সেই বিমোহন স্বাদ? একই সাজানো মঞ্চের ওপর কি দুটি দল সমান অভিনয় করতে পারে? তার ওপর জাফরানের গন্ধ অনুপস্থিত।

আমিনিয়াতে উপরোক্ত দুটি পদ সেবন করবার জন্য অনুষঙ্গ তন্দুরি রোটি বিধেয়। সাবিরের মতো এখানেও তন্দুরি রোটির চরিত্র নান এবং রোটির মধ্যবর্তী। ভাল। দাম ৪০ পয়সা। সঙ্গে একটু পিঁয়াজ টমাটোরও প্রয়োজন বোধ হবে। কিন্তু তারা কেউ নিঃশুল্ক আসবে না। সালাদ এক পাত্র ৩০ পয়সা।

আমিনিয়াতে অনেকে বিরিয়ানি আহার করে থাকেন। কিন্তু এঁদের বিরিয়ানির কোনও বিশেষত্ব নেই। সুপক্ক মাংসখণ্ড ও হলুদরঙের ভাত। দুয়ে খুব প্রাণের যোগ আছে মনে হবে না। এখানেও জাফরানের সৌরভের অভাব। এক মাত্র ৬ টাকা। চিকেন বিরিয়ানিও পাবেন, ৭ টাকা। আমিনিয়ার অপর একটি পদও সংবাদপত্রের ভাষায়, উল্লেখের দাবি রাখে। পসিন্দা কবাব। ২ টাকা মাত্র দাম। কিন্তু সব দাবি যেমন মানা যায় না, এও তেমনি। নিতান্ত পদাতিক। তা ছাড়া আপনি যদি সিরাজের কবাব আস্বাদ করে থাকেন, আপনার নাগাল পাবে কী করে আমিনিয়ার কবাব?

অনুরূপ কারণেই আমি আমিনিয়ার মিষ্টান্ন আস্বাদ করিনি। মিষ্টান্ন বলতে ফিরনি। আমার ফিরনির চিরন্তন প্রেম মৌলানা আজাদ রোডের হোটেল এণ্ড পিওর মিল্ক এম্পোরিয়ামের সঙ্গে। অন্য কোনও সুন্দরীর দিকে তাকানো আমার পক্ষে সম্ভবই নয়, গর্হিত কাজ হবে। তা ছাড়া আমার অনুরাগের দোকান পিওর মিল্ক এম্পোরিয়াম-এ ফিরনির দাম ১.২৫ টাকা আর আমিনিয়াতে ১.৫০ টাকা। স্বাদের তফাত, যদিও আমিনিয়ার ফিরনি আস্বাদন করিনি, নিশ্চয় আকাশ পাতাল হবে। অন্তত সেই বিশ্বাসে আমি একনিষ্ঠ।
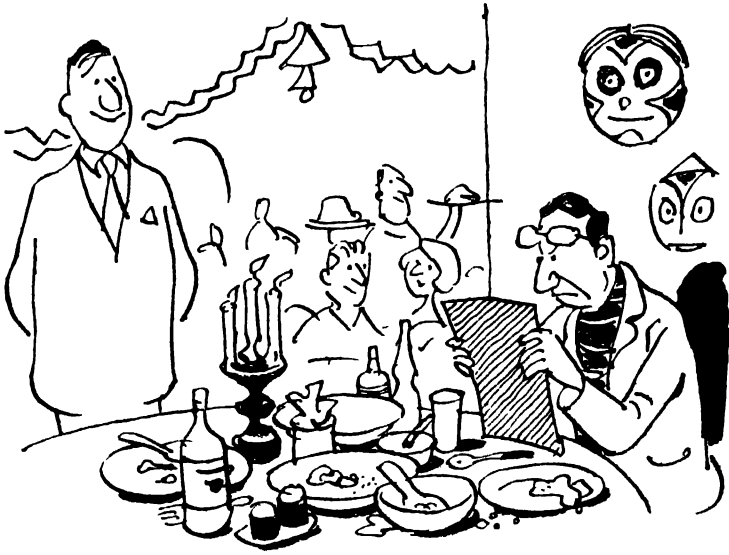
গ্রহান্তর

পোদ্দার কোর্টের পিছনের ছাতাওলা গলি থেকে চৌরঙ্গি খুব দূর নয়। কিন্তু ভোরবেলার পথের ওপর চিনা প্রাতরাশের বাজার থেকে পলিনেশিয়া রেস্তোরাঁ—মনে হবে যেন গ্রহান্তর। আবর্জনা বিশৃঙ্খলা মানুষের ভিড় কোলাহল থেকে শৃঙ্খলা পারিপাট্য, নম্রকণ্ঠ সুবেশ নরনারীর সান্নিধ্য। গ্র্যান্ড হোটেলের প্রধান তোরণ পার হলেই পায়ের নীচে কোমল কার্পেট, দুপাশে কাচের শো-কেসে মহার্ঘ পণ্য সম্ভার। আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে চতুষ্কোণ অভ্যর্থনা কক্ষ যার শীর্ষের বিশাল ঝাড়লণ্ঠন দুই শতাব্দীকে একত্র চিত্রার্পিত করেছে। আরও এগুলে মর্মরের বারান্দা। মস্ত মস্ত কাচের পাল্লার ওপাশে সুইমিং পুল, এপাশে পলিনেশিয়া। দু-একটি অতিথি ধীর পায়ে চলেছেন, কথোপকথন হচ্ছে মৃদুস্বরে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত, প্রথম বসন্তের আমেজ আনে। দরজা পার হলেই আর এক জগৎ। তিন দেওয়ালে নম্র আলোয় নারকেল গাছের সারি, সামনে মাছ ধরার জাল। আঁকা ছবি মনে হয় না। পায়ের নীচে বালির বদলে নরম কার্পেট, তবু দক্ষিণ সমুদ্রের কোন এক দ্বীপের না দেখা চেহারা মুহূর্তের ইন্দ্রজাল রচনা করবে। ভোজনকক্ষটি ছোট নয়। শতাধিক মানুষ স্বচ্ছন্দ আরামে বসতে পারে। সুবেশ সুদর্শন পরিচারক সৌজন্যের মূর্তি হয়ে এগিয়ে আসবে। মার্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে আপনার টেবিল সংরক্ষিত আছে কি না। না থাকলে স্থান পাওয়া কঠিন হবে। অতএব পূর্বাহ্নে টেবিল রিজার্ভেশন করে রাখা বাঞ্ছনীয়। আপনাকে সমাদরের সঙ্গে আপনার টেবিলে পৌঁছে দেওয়া হবে। চেয়ারগুলি মোটা বেতের, উপরের গদি আর একটু নমনীয় হতে পারত। কিন্তু এ সব কথা আপনার তখন মনে হবে না। টেবিলের ওপর বাতিদানে মোমের বাতি লাল চিমনির দাক্ষিণ্যে স্নিগ্ধ ছায়া ছায়া আলো বিকিরণ করছে। সহসা

দক্ষিণ সমুদ্রের নারিকেলকুঞ্জ শোভিত দ্বীপের সাগরবেলার মায়া আপনাকে আচ্ছন্ন করবে। বড় বড় বিচিত্র মুখোশ অস্পষ্টভাবে নজরে আসবে। অকস্মাৎ দামামার কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী আওয়াজে ক্ষণিকের স্বপ্নমায়া দূর হবে। উপলব্ধি হবে, আপনি পলিনেশিয়া রেস্তোরাঁয় এসেছেন, কলকাতার প্রধান এবং সর্বোত্তম ভোজনশালা। সেই সুবেশ ব্যক্তি একটি মস্ত কার্ড নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে। কার্ডটি ভোজ্যতালিকা। আর দামামা নয়, ওই আওয়াজ আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষঙ্গ ড্রামের ধ্বনি। মনে হবে পাঁচজন বাজনদার এত প্রবল কোলাহল সৃষ্টি করছে কী করে। ততক্ষণে জেনী গান শুরু করেছে। স্টিরিয়োফোনিক অ্যামপ্লিফায়ার তার কণ্ঠে যেন নতুন আর এক মাত্রা এনে দিয়েছে।

তালিকাটি আকারে যত বড়, ভোজ্যের সংখ্যা তত বড় নয়, তা হলেও মূল ভোজনের আগে গৌরচন্দ্রিকার মতো আট প্রকারের অ্যাপিটাইজার পাবেন, আপনার ক্ষুধাকে ক্ষুরধার করা যার কাজ। বালি মিকি বা জি বাউ হার পড়ে কিছু বোধগম্য যদি না হয়, তাই আপনার সুবিধার্থে ইংরেজিতে সামান্য বর্ণনাও আছে। জি বাউ হার অর্থে চিংড়ি মাছ কাগজে মুড়ে ভাজা। লোকমুখে শুনেছি, এই কাগজও নাকি খাওয়া যায়, কিন্তু আহার্য হিসাবে কাগজে আমার অরুচি থাকায়, আমি প্রস্তাব করব টিডবিট্‌স পলিনেশিয়ান অথবা ড্রাম্‌স অফ হেভেন। প্রথমোক্তের কিছুটা পরিচয় নামেতেই আছে। দ্বিতীয়টি নবীন মুরগির ডানা বেকনে মুড়ে ভাজা। অতি সুস্বাদ। সেই স্বাদ আরও লোভনীয় হয় পীনাট বাটার, সস ও গার্লিক সস সহযোগে। পাঁচটুকরো ক্ষুদ্র মুরগির ডানার দাম ১৮ টাকা। টিডবিট্‌সও তাই। দুজনের জন্য এক প্লেট যথেষ্ট নয়। একজনের পক্ষে পর্যাপ্ত। আর কিছু এখন নেবেন না। তবে অ্যাপিটাইজারের পূর্ণ ফল পেতে হলে একটু পানীয় সংযুক্ত হওয়া দরকার। পলিনেশিয়ার বিশেষ মিশ্রিত মদিরাগুলির প্রধান উপকরণ রাম। ফলের রসের সঙ্গে রাম মিশিয়ে তৈরি হয় মাই তাই, ৩০ টাকা। আমার মনের জিনিস আকু আকু। ডাবের জল এবং আনারসের রসে রাম ভাল করে চেনা যায় না। হিমশীতল, মনপ্রাণ মুহূর্তে স্নিগ্ধ করে। আর রমণীয় পরিবেশনের পাত্রটি, চিনেমাটির তৈরি, কাটা ডাবের আকারে। দক্ষিণ সমুদ্রের গন্ধ যেন ভারী স্পষ্ট হয়; আকু আকুর দাম সামান্য কম, ২৪ টাকা।

এবারে মূল খাবার অর্ডার দেবার সময় হয়েছে। ইতিমধ্যে মাঝখানের খালি জায়গাটুকুতে নাচ শুরু হয়েছে। মৃদু আলোয়, অল্পস্থানে নরনারীর নৃত্যের বিচিত্র উদ্দাম রূপ আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবে। স্বল্পালোকা ভোজ্য-তালিকা পড়াও সহজ নয়। সুপ ছ-সাত রকমের পাবেন। তবে এদের বিশেষত্ব সোটানহং সুপ। অনেকটা সিউচুয়ান ধারার চিনা সাওয়ার ও হট সুপের ধরনের। অনেক মানুষ মেজাজে, ব্যবহারে মৃদু অথচ মনে প্রভাব রেখে যায়, তেমনি। গোলমরিচের গন্ধ, একটা প্রচ্ছন্ন তীব্রতা সুপটিকে বড় লোভনীয় করে। কোন সস মেশাবার প্রয়োজন হবে না। শিল্পী যেন আপনার জন্যই পদটি সৃষ্টি করেছিলেন। এক বাটির দাম ১৬ টাকা। একজনের পক্ষে বেশি, দুজনের পক্ষে একটু কম। দু বাটি নিলে তিনজনের উপযুক্ত হয়। কেন না এর পর তো আসল পদ। কোটাল, মন্ত্রীর পর মহারাজাধিরাজ।

পলিনেশীয় আহার্যে চিনা রন্ধনশিল্পের ছাপ স্পষ্ট। দক্ষিণ সমুদ্রের বসন্ত বাতাসে তার

স্বাদ যেন আরও কোমল, আরও মনোহারী, আরও সুরভিত হয়েছে। অনেকগুলি রমণীয় পদ আছে। কিন্তু আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে আজকের সন্ধ্যায় কার প্রতি আপনার পক্ষপাত। মাছ, মাংস, না মুরগি। আমার বিশ্বাস লবস্টার কালালাউ মাছের পদের শীর্ষে। কিছু মাশরুম, সামান্য পিঁয়াজ, কোনও অলৌকিক সসে চারটি বড় বড় গলদা চিংড়ির টুকরো। এখন তাকে চিংড়ি মাছ বলে চেনা যায় শুধু অনচ্ছ স্মৃতির মতো। এখন সেটা কালালাউ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত কোনও পরম স্বাদিষ্ঠ যৌগ পদার্থের মতো। বলে দেওয়া দরকার ভাত বা ফ্রায়েড রাইস পৃথক আদেশ করবেন না। প্রায় সব পদের সঙ্গেই সাদাসিধা ফ্রায়েড রাইস পরিবেশন করা হয়। সাদাসিধা এইজন্য যে মূল পদটির স্বাদ যাতে কোনও প্রকারে ব্যাহত না হয়। সেতারের থেকে তবলা চড়া হলে কি আমাদের সহ্য হয়? আর এরা তো শিল্পী। কালালাউ এর দাম ৪৮ টাকা।

যাই হোক যদি মাংসে আপনার পক্ষপাত হয় এই সন্ধ্যায়, নির্দ্বিধায় পোর্ক পাইনঅ্যাপল দিতে বলবেন। পদটি চিনা রান্নার স্মৃতি বহন করে আনবে, কিন্তু কোথায় যেন বিশেষ, তুলনারহিত। রন্ধনশিল্পের কোন কুশলতায় শূকরমাংস এত সরস হয় আমি জানি না। অম্ল মিষ্ট সস সেই সরস মাংসকে আরও মাদকতাময় করে তোলে। ভাসা ভাসা লঙ্কার গন্ধ সেই স্বাদকে অপার্থিব অভিজ্ঞতার স্তরে পৌঁছে দেয়। দাম ২৮ টাকা। বলা বাহুল্য, নিঃশুল্ক ফ্রায়েড রাইসও পাবেন।

মুরগি ইচ্ছা করলে চিকেন ব্যাম্বু টাহিটিয়ান আস্বাদ করবেন। বাঁশের কোঁড় আগেও পরখ করেছেন নিশ্চয়। কিন্তু এখানে অস্থিশূন্য মুরগির খণ্ডের সঙ্গে অনাস্বাদিত টাহিটিয়ান সসের কল্যাণে বাঁশের কোঁড়ের এমন একটি অভিনব মিলন হয় যে নিজে আস্বাদ না করলে ভাষায় বোঝানো যাবে না। দুই উপকরণকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে, অথচ দুয়ে মিলে তৃতীয় আর এক রসের সৃষ্টি করছে। আপনার রসনা যুগপৎ এই ত্রিধারায় আপ্লুত হবে। অভিজ্ঞতাটি মনে রাখবার মতো। এখানেও ফ্রায়েড রাইস আসবে না চাইতেই। দাম ৩৬ টাকা।

ওদিকে বাজনা আরও প্রবল হয়েছে, তাল দ্রুত হয়েছে, নৃত্যপর নরনারী একটা উদ্দাম ছবির মতো, যেন ফ্রেমের বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। আপনার খেয়াল নেই কী খেয়েছেন। সব মিলিয়ে একটা পরম সুখের অনুভূতি। মিষ্টি কি খাবেন? কী খেয়েছেন মনে আছে? নেই? মনে করিয়ে দিইঃ অ্যাপিটাইজার ১৮ টাকা, মিশ্রসুরা ২৪ টাকা, সুপ ১৬ টাকা, চিকেন টাহিটিয়ান ৩৬ চাকা। মোট ৯৪ টাকা। মিষ্টান্ন এদের গর্বের বিষয় নয়। দুজন হলে বেক্‌ড্ আলাস্কা প্রথমবারে আস্বাদন করায় নূতনত্ব আছে। শিল্পীর কুশলতার বিশেষ পরিচয় দেবার সুযোগ নেই এই পদে। আইসক্রিমকে ডিমের ফেনায় মুড়ে, সামান্য বেক করে, তার ওপর ব্র্যান্ডি ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলে যতটা দর্শনধারী হয়, স্বাদে ততটা নূতনত্ব থাকে না। সুতরাং চকোলেট এক্লেয়ার নিতে পারেন। ১৫ টাকার দু খণ্ড পাবেন। পেস্ট্রির খোল ক্রিমে ভরা, ওপরে চকোলেটের আস্তরণ। ভাল সন্দেহ নেই—তবে এমন বিশেষ কিছু নয় যার জন্য পলিনেশিয়াতে আসা। হিসাবটা মনে আছে ১০৯ টাকা হয়েছে। এরাও বোধ হয় টাকার অঙ্কটা দেখে একটু লজ্জায় পড়ে। আপনার টেবিলে বিল আনতে তাই বুঝি অনেক দেরি হয়। এনেও কেমন সঙ্গোপনে

একটা ফোলডারের মধ্যে ঢাকা দিয়ে আপনার টেবিলে রেখে যায়। তারপর পরিচারকরা একটু আড়ালে চলে যায়। আপনি ফোলডার খুলে বিলটা দেখে একটু চমকে উঠবেন। ভাববেন আলো কম, তাই ভুল দেখছেন, নাকি ভুল করেছে। বিলের সঙ্গে যোগ হয়েছে সরকারি প্রমোদকর শতকরা ৩০ টাকা এবং হোটেলের সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। একজনের জন্য মোট ১৫৩ টাকার কাছে। তা হবে বই কী? পরম অভিজ্ঞতার একটা দাম দিতে হবে তো। বলবেন, তা বলে প্রমোদকর! ওটা জেনীর গান না তীব্র চিৎকার? দেখুন, সরকার আপনার আনন্দের একটু ভাগ নেবেন না? দুঃখ দুর্দশা তো উদার হাতে আপনাদের বিলিয়ে দিচ্ছেন সরকার। আপনার সুখের একটু ভাগ সরকারকে দিন।

ওঠবার আগে পরিচারকের জন্য ফোলডারের ভাঁজে কিছু রেখে আসা বিধেয়। সার্ভিস চার্জ দিয়েছেন। তাতে কী? অধিকন্তু ন দোষায়।

ফরসান

এই শহরের সর্বভারতীয় চরিত্র আমাকে আকর্ষণ করে। এখানে একটি গুজরাটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার বয়স ষাট বছরের ওপর। উত্তর কলকাতায় অবশ্য হিন্দিভাষী ছাড়া অন্য প্রান্তের লোক বিশেষ পাওয়া যাবে না। অঞ্চলটা এখনও বাঙালির সুরক্ষিত দুর্গের মতো থেকে গেছে। অধিকার করা দূরে থাক, বাইরের লোক ভাল করে অনুপ্রবেশও করতে পারেনি। শুধু ওই হিন্দিভাষী ছাড়া। কিছু ওড়িশাবাসীও আছেন। কখনও লক্ষ করেছেন, বৌবাজারে আয়নার দোকানগুলিতে এক অপরিচিত ভাষার গোল গোল লিপিতে লেখা সাইনবোর্ড? ওড়িয়া খদ্দেরদের জন্য তাদের ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড।

অপরপক্ষে দক্ষিণ কলকাতা দেখুন—একেবারে সর্বক্ষণ সর্বজাতিসমন্বয়। কম-বেশি সব প্রদেশের মানুষই রুজি-রোজগার করছেন, বাস করছেন, পুরুষানুক্রমে নিজেদের রীতি-রেওয়াজ পালন করছেন। দু-একটা অঞ্চলে তাদেরই প্রাধান্য, বাঙালি প্রায় নেই বললেই হয়। এই শহরে গুজরাতির সংখ্যা কত তার আদম-সুমারি রিপোর্ট আমার কাছে নেই। বেশি হবে না বলেই মনে হয়। তারা প্রধানত ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করেন। সেই কারণে কলকাতায় যে ক'টি গুজরাতি আহার্যের দোকান আছে, সেগুলি ভবানীপুর এবং আর একটু উত্তরে লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যতদূর জানি গুজরাতি ভোজনশালা নেই কলকাতায়। পঞ্জাবিদের মতো গুজরাতিরা অত বাইরে ভোজনের পক্ষপাতী নয়। তা ছাড়া তারা সংখ্যায় সামান্য বলে বোধ করি কোনও ভোজনশালা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গুজরাতি পানভোজনে জলখাবারের স্থান অনেকটা বাঙালিদের মতো। আহার্য

পদগুলি অবশ্যই ভিন্ন। কিন্তু সকালে বিকালে জলখাবারের বেশ প্রভূত আয়োজন থাকে সব বাড়িতে। খানদানি গুজরাতিরা বাড়িতে প্রস্তুত করা খাবার পছন্দ করেন।

গুজরাতি রন্ধনশৈলীর কচ্ছি থারার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়ে থাকবে যদি ইতিমধ্যে মুম্বইয়ের নিউ আরাম রেস্টুর‍্যান্টের আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন। এবারে কলকাতায় গুজরাতি জলখাবার কেমন পাওয়া যায় পরখ করা যাক। বসে খাবার ব্যবস্থা নেই। আপনাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। আমার প্রিয় দোকান রাজনগর ফরসান হাউস। ফরসান অর্থে ভাজা-ভুজি জাতীয় পদার্থ। তবে রাজনগর ফরসান হাউসে মিষ্টান্নাদিও পাওয়া যায়। বাঙালিরা যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুন, গুজরাতিরা, বিশেষ করে সুরাটের অধিবাসীরা তাঁদের মিষ্টান্নের জন্য খুব গর্ববোধ করেন। কখনও সুরাটে গেলে ঘারি আস্বাদ করবেন। প্রচণ্ড মিষ্টি এবং প্রভূত ঘৃতযুক্ত। গুজরাতিরা নিজেরাই বলেন, এক কিলো ঘারি প্রস্তুত করতে হলে দেড় কিলো ঘৃতের প্রয়োজন হয়।

দোকানটির ঠিকানা রায় স্ট্রিট, ল্যান্সডাউন রোড থেকে বেরিয়েছে। ঠিক রায় স্ট্রিটের ওপর নয়, একটা বাড়ি পিছনে। রায় স্ট্রিটে ঢুকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। রাজনগর ফরসান হাউসের বয়স তেরো চোদ্দ বছর।

গুজরাতি ঢোকলা শুধু প্রাতরাশেই নয় দ্বিপ্রহরের এবং রাত্রের ভোজনের অঙ্গ। প্রায় অচ্ছেদ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। রাজনগরে আতপ্ত ঢোকলা পাওয়া যাবে। অনেকটা ধোঁকার মতো। কিন্তু ভাজা নয়, ভাপানো। সেইজন্য বর্ণে নির্মল হলুদ-সরষে ফুলের চেয়ে একটু হালকা। উপরে সরষের ফোড়ন দেওয়া। অতিশয় হালকা, তুলোর মতো কোমল। একটু অম্ল এবং মিষ্ট আছে—বস্তুত এই দুয়ের পরিমিত এবং মাপসই প্রয়োগেই ঢোকলার স্বাদ আকর্ষক হয়। ভাপানো কাঁচা লঙ্কা এবং তেঁতুলের চাটনি আপনার রুচিমতো প্রয়োগ করতে পারেন। দাম ১৪ টাকা কিলো। যেহেতু অন্যান্য বস্তুও পরখ করবেন, ১০০ বা ২০০ গ্রামের অধিক নেবার দরকার নেই। ওজনে হালকা, তাই আকারে পর্যাপ্ত হয়।

ছোট কচুরি পাবেন রাজনগরে—ডালের। টক-মিষ্টি অথবা পুদিনার চাটনি সহযোগে গ্রহণ করা বিধেয়। আহামরি কিছু নয়। তবে দামে কম। একটি কচুরি ৩০ পয়সা। গাঁঠিয়া পাবেন কয়েক প্রকার—যাকে আমরা ঝুরিভাজা বলি, বেসমের। শুধু ছানা এবং চিনি দিয়ে যেমন বহু বিচিত্র স্বাদের, বিবিধ পাকের সন্দেশ প্রস্তুত হয়, এঁরাও তেমনি শুধু বেসম দিয়ে বিবিধ পাকের গাঁঠিয়া প্রস্তুত করতে পারেন। আজ লম্বা গাঁঠিয়া পরখ করা যাক। ১৮ টাকা কিলো। ওই ১০০ বা ২০০ গ্রাম যথেষ্ট হবে। কারণ এই গাঁঠিয়া ফুরফুরে এবং হালকা। প্রচ্ছন্ন গোলমরিচের স্পর্শ আছে। একটি তেঁতুলের চাটনি দিয়ে খেতে অপূর্ব। গুজরাতিরা সরষে ফোড়ন দেওয়া সিদ্ধ করা চিল্‌তে পেঁপের অনুষঙ্গ পছন্দ করেন। আমরা এখনও এই বস্তুটির গুণগ্রাহী হতে পারিনি। এখানে মিষ্টান্নের মধ্যে বালুসাঈ পাওয়া যাবে। ৮০ পয়সা দাম। আর কয়েক প্রকারের পেঁড়া পাবেন। শ্রেষ্ঠ পেঁড়ার স্বাদ নিতে হলে রাজকোট যেতে হয়। খোওয়া ক্ষীর এবং চিনির সহযোগে যে এমন সুস্বাদ মিষ্টি তৈরি হতে পারে, রাজকোটের পেঁড়া না খেলে বিশ্বাস হবে না।

ল্যান্সডাউন রোডের ওপরই, রায় স্ট্রিটের সংযোগের উত্তরে, আর একটি উত্তম

ফরসানের দোকান আছে। এখানে দামও বেশি। যেমন ঢোকলা, ১৬ টাকা কেজি। কচুরি আকারে বড়, স্বাদে তেমন কিছু বিশিষ্ট নয়, কিন্তু দাম ৭০ পয়সা। দোকানের নাম অন্নপূর্ণা। যে আকর্ষণে এই দোকানে বার বার যেতে হয়, সেটা হল এদের জিলাপি। এই সরল, অতি সুস্বাদ মিষ্টান্নটির ঐতিহ্য ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে। তপ্ত জিলাপি, বিশেষ করে শীত বা বর্ষার সকালে যে কী মোহ রচনা করতে পারে, সে যাঁরা একবার উচ্চবর্ণের জিলাপিতে দীক্ষিত হয়েছেন তাঁরাই জানেন। অন্নপূর্ণায় জিলাপির দামও চড়া। ১৯ টাকা কেজি। ১০০ গ্রামে দুটি তিনটির বেশি ওঠে না। কিন্তু মুখে দিলে আর সে কথা মনে থাকে না। স্বর্ণবর্ণ, সুমিষ্ট, রসভরা, মুচমুচে এই পদটির জন্য নিশ্চয়ই একদিন অন্নপূর্ণাতে যাবেন। জিলাপি কোন দেশি খাবার আমি জানি না। এক দক্ষিণ ভারত ছাড়া এই দেশের সর্বত্র জিলাপির প্রচলন আছে। কিন্তু সাধনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় আমার প্রিয় অপর জিলাপির স্থান, জুনিয়র ব্রাদার্স, রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ জিলাপির দোকান অবশ্য বড়বাজারে কালিগুদাম অঞ্চলে। সে জিলাপির কথা বলতে উত্তর ভারতীয়দের জিহ্বা এত রসস্থ হয়, ভাল করে কথা বলতে পারেন না। সেই জিলাপির একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না করলে অবিচার করা হবে।

বসে খাবার ব্যবস্থা নেই বলেছিলাম, কিন্তু লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর টিডবিট্‌সে দাঁড়িয়ে খাবার ব্যবস্থা আছে। টেবিলের বিকল্প দেওয়ালে লাগানো সরু তাক। এখানে খাবার প্লেট হিবাবে বিক্রি হয়, কাজেই দাম বেশি পড়ে। গুজরাতি খাবারের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য এদের মিনি লাঞ্চ একদিন পরীক্ষা করতে পারেন। ৩.৭৫ টাকা। দুটি পুরি, আলুর দম, ছোলার তরকারি, ঢোকলা ও খাণ্ডভি। আলাদা নিতে পারেন কাসুন্তি। গুজরাতি জলখাবারে সর্বোত্তম পদ হল খাণ্ডভি, বলতে পারেন বেসমের অমলেট। দই আর বেসম দিয়ে প্রস্তুত এই পদটি অপরূপ সৃষ্টি। আক্ষেপের কথা সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না। কোন ভাল জিনিসটাই সুলভ?

নিরামিষ খেতে গেলে

আজ জন্মাষ্টমী। আজ অনেক বাড়িতেই নিরামিষ ভোজন। বাঙালি মূলত আমিষভোজী হলেও, বাংলা নিরামিষ রান্নাও কম ছিল না। এখন কে বাজার থেকে মরশুমের কলমি শাক নিয়ে আসবে, আয়োজন করবে কাসুন্দির যা অনুঘটকের কাজ করে শাককে সুস্বাদ কোনও অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করে। চালকুমড়ো আনলে নারকেল কোরা-র আয়োজন চাই, কুমড়ো হলে ছোলা ভিজিয়ে রাখতে হবে আগে, কচু শাকে ডালের বড়ার প্রয়োজন। সত্যিই এত হাঙ্গামা আর এ যুগে পোষায় না। তাই নিরামিষ রান্নার ঐতিহ্য ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। তাই আমরা নুনজলে ভেজান কিংবা শুকনো মাশরুমের সবজিতে সন্তুষ্ট থাকি। ভুলেই তো গিয়েছি বাঁকুড়া মেদিনীপুরের উইঢিপির ওপর বর্ষাকালের তাজা ব্যাঙের ছাতার স্বাদ।

বাড়ি থেকেই যে জিনিস পলাতক, সাধারণ ভোজনালয়ে তার আশ্রয় হবে কেন? যে ভোজনায়লে নিরামিষ খাবার আশ্রিত আত্মীয়ের মতো কোনও প্রকারে টিকে আছে, সহসা মুখ দেখায় না, সে সব স্থান অর্জুনেরও নয়, যুধিষ্ঠিরেরও নয়। অর্থাৎ, সুখাদ্য সন্ধানীরা সেখানে যাবেন না। সেখানে ভোজ্য নিতান্তই মামুলি। উদরপূর্তি হয়, হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না।

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে নিরামিষাশীর সংখ্যা অধিক। উত্তর ভারতীয়রা আবার বাঙালিদের মতো ভাতে আগ্রহী নন। তাঁদের ভোজনশালায় পুরি, কচুরি চলে, এখন ছোলা-বাটুরা পর্যন্ত এগিয়েছে। তা বলে পুরি-কচুরি হলেই ফেলনা হয় না। গুণীজনের হাতে মৃৎকলসেই মৃদঙ্গের বোল ওঠে। এমন গুণী ক'জন এখনও আছেন দিল্লির পরটা গলিতে। তার মধ্যে অন্তত আমার জানা একটি ভোজনশালার শত বৎসর

উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনা ওই পরটাতেই তাঁরা বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছেন। কোনও দিন তাঁদের কথা বিস্তারিত বলব।

কলকাতায় দক্ষিণী ভোজনশালা অনেক আছে। সব নিরামিষ। কিন্তু এঁদের পদবৈচিত্র্য নেই। শুনেছি গত পাঁচ হাজার বছর ধরে ডাল বলতে অড়হর ডালের সম্বার খাচ্ছেন দক্ষিণ দেশীয়রা। রসমের বয়সও দু চার হাজার বছর হবে। তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যদি প্রতি দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় একই পদের সঙ্গে পরিচয় করতে হয়, কতদিন ভাল লাগবে, তা সে যতই ভাল হোক?

সুতরাং নিরামিষ ভোজনের স্থান এই শহরে আঙ্গুলে গোনা যায়। তারাও খুব উচ্চকোটির গাইয়ে নয়, তবু তাঁদের আসরে মাঝে মাঝে গেলে খারাপ লাগবে না। তবে তাঁরা আবার লোকসমাগম বাড়াবার জন্য অন্য নানাবিধ খাবারের আয়োজন করে আসল ভারতীয় নিরামিষ রন্ধনের দিকে অমনোযোগ দিয়েছেন। যেমন, অভিনন্দন—পার্ক স্ট্রিটের। প্রচন্ড বাদ্যসঙ্গীত সাইকাডেলিক আলোর খেলা, টেবিলে আলো অপেক্ষা আঁধার বেশি। তার ওপর বিদেশি নামের খোলস চড়িয়ে আমাদের দেশি সবজির অপরিচিত পদ। ভাললাগা কঠিন। তবে, ফ্যাশন বলে একটা কথা আছে। পৃথিবীব্যাপী গোমাংসের এত নাম। নিরামিষাশীরা শুধু তার ঘ্রাণেই সন্তুষ্ট থাকবেন? অতএব তাঁদের জন্য ভেজিটেবিল সিজলিং স্টেক, ভেজিটেবল আ লা কিয়েভ। হায়, নামে যদি রসনার শান্তি হত, তাহলে এই দুনিয়া বড় সুখের স্থান হত।

এমনই আর একটি ভোজনশালা উত্তর ভারতীয়দের প্রিয়। নাম বিনীত। শেক্সপীয়ার সরণির এয়ার কন্ডিশানড বাজারের বেসমেন্টে। যাবার পথ সুগম নয়। কিন্তু সামনেই বিনীতের কোনও কর্মচারী আপনাকে পথনির্দেশ করবার জন্য উপস্থিত থাকবে। দু প্রস্থ সিঁড়ি নেমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ভোজনশালায় ঢুকবেন। প্রশস্ত স্থান, আরামদায়ক। এক প্রান্তে বাজনদারের উচ্চাসন। হিন্দি ফিলমের বিখ্যাত কোনও গান শুনবেন, উদ্দাম বাজনার সঙ্গে, রীতি অনুসারে আলো কম। নাম বিনীত, পরিচারকেরা বুঝি সেই জন্য এত বিনীত। কিছু বলার জন্য পরিচারকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষা করতে হবে না, সে আপনার পাশে সর্বদা উপস্থিত।

মুসাকা আ লা গ্রেক আস্বাদ করে দেখতে পারেন। মাংসের কিমা এবং বেগুন সহযোগে এই আদি গ্রিক পদটি নতুনত্বের জন্য ভাল লাগে। মাংসে আমরা আলু অথবা শালগমের যোগে অভ্যস্ত। বেগুন দিয়ে এমন পরিপাটি পদটি গ্রিকদের আবিষ্কার। আপনি যদি আমিষভোজী হন, বিনীতে মুসাকার স্বাদ নিতে নিতে আপনার বারংবার মাংসের অভাবটাই মনে পড়বে। সবজি দিয়ে দৈরি হলে কি হবে, দাম অনেক, ২৬ টাকা। আসলে এখানে সব জিনিসেরই দাম বেশি। ওই গানবাজনা, ওই স্তিমিত আলো, নরম চেয়ার—তারও দাম আহার্যের দামে যোগ হয়। ভেজিটেবল ক্যানালোনি পরখ করবেন। এতক্ষণে যদি মাংসের অভাবের কথা ভুলে থাকেন তাহলে ভাল লাগবে। দামও স্বস্তি দেবে; ১২.৫০ টাকা।

চিনা এবং ভারতীয় পদও পাওয়া যায় বিনীতে। ভারতীয় পদগুলি দামে একটু ভব্য ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। কিন্তু পঞ্জাবী রান্নার ধারা এমন ভারত জয় করেছে যে

কলকাতার বিনীতও তার সুবেদারি করছে। তন্দুরি পদগুলি বাদ দিলে পঞ্জাবী আর সব সবজিতে একই মশলার, পিঁয়াজ ও টমাটোর থকথকে ঝোল। সে নবরতন কোফ্‌তাই খান, অথবা মটর পনীর—সব স্বাদ এক। কাজেই একটা পদ নিলেই যথেষ্ট হবে। পরটা ভাল হয় এখানে, ২.৫০ টাকা।

চিনা পদগুলি আমার পরীক্ষিত নয়, যদিও জানি, চিনারা নিরামিষ রান্নায়ও সমান পারদর্শী, আমি এ দেশে বিশেষ চিনা নিরামিষ ব্যঞ্জন আস্বাদ করিনি। বিনীতের চিলি পোট্যাটো অর্থাৎ লঙ্কা ও আলুর সবজি আনন্দ দিয়েছিল—১০ টাকা। কড়াইশুটির পোলাও পাবেন ১২ টাকাতে—একপাত্র জন তিনেকের পক্ষে যথেষ্ট। এখানে কুলফির দাম বেশি, ১০ টাকা। তেমন মনোহারী নয়।

শুনেছি দ্বিপ্রহরে এঁরা কিছু দক্ষিণী পদ পরিবেশন করেন, সেগুলি রসিকদের অনুমোদন পেয়েছে। নিরামিষ থালিও শুধু দ্বিপ্রহরে পাওয়া যায়। আমার এখনও পরখ করে দেখা হয়নি। কিন্তু পঞ্জাবী ধাঁচের রান্না চারটি সবজির কথা ভাবলেই আমার জিহ্বা সঙ্কুচিত হয়।

আপনার থালির যদি অভিলাষ হয় গুপ্ত ব্রাদার্সের জুনিয়র ব্রাদার্সে যেতে পারেন পার্ক স্ট্রিটের ওপর। আসলে মিষ্টান্নের দোকান। দ্বিতলে ভোজনের জন্য গুটি ত্রিশ আসন আছে। স্থানটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং আলোকিত। পরিচ্ছন্ন ভোজনশালা। এঁরা আসলে দিশি নিরামিষ খানার কারবারি। কিন্তু দু-একটা আমিষ নাম ধার করেছেন, যেমন ভেজিটেবল শিক কবাব। আমাদের ওদিকে যাবার দরকার নেই। সবজির শিক কবাব হয়? সব জিনিস সবাইকে মানায়? বৃদ্ধা নর্তকী কেমন দেখায় মঞ্চে?

এঁদের রাসবিহারী এভিনিউর দোকানের কথা পূর্বে এই কলমে লিখেছি। স্বাদিষ্ঠ সেই চাটগুলি এখানে পাবেন। অধিকন্তু, পাবেন এঁদের সর্বোত্তম সৃষ্টি চানা সহযোগে আলু টিক্কা। আলুকে কোন মন্ত্রবলে এমন সুস্বাদ পদার্থে পরিণত করা যায়, তার রহস্য শুধু এঁরাই জানেন। পাঁচ টাকা ব্যয় করলে সেই রহস্য আপনাকেও আকুল করবে।

এখানে থালি পাওয়া যায়। ১২.৫০। ভাত পাবেন না। উত্তম উত্তপ্ত পুরি, ডাল, দুটি সবজি, দই। বোধহয় সামান্য মিষ্টান্নও ছিল। স্বাদেও নিশ্চয় সামান্য ছিল তাই মনে নেই। অন্য স্থানের তুলনায় এখানের থালি আমার পছন্দ। নিরামিষ রন্ধনের চূড়ান্ত নয়, তবে অপছন্দেরও নয়। সবজিতে আর একটু বৈচিত্র্য আনলে নিশ্চয় মনোহারী হত। আলুর দম না হয় নাই বা পরিবেশন করতেন। উত্তর ভারতীয় বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের সবজি রান্নার যে ঘরানা, হালকা মশলায়, লবণ অথবা অম্ল, হিং অথবা পিঁয়াজের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে যে অসাধারণ স্বাদিষ্ঠ রন্ধনশিল্প, তা কি উঠেই গেল?

বাংলা রান্নার জন্য আমার একটি মাত্র স্থানই জানা আছে। তার কথা আগেই লিখেছি। নিরামিষ দু-চার পদ অবশ্যই থাকবে। মোচার চপ হতে পারে, হতে পারে এঁচড়ের কোফ্‌তা। লাউঘন্ট বা কুমড়ো ছক্কা থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আজ তো জন্মাষ্টমী। এটা তালের সময়। একদা এই দিনে বাঙালির ঘরে তালক্ষীর অনিবার্য পদ ছিল। তাল খুব মনোহারী ফল নয়। কিন্তু ওই এক দিন তার উগ্র গন্ধও ভাল লাগত। ক্ষীর সহযোগে তালের বড়া। তা কি সুরুচিতে পাওয়া যাবে? আর কোথাও পাওয়া যাবে না জানি। বাড়িতেও নয়।
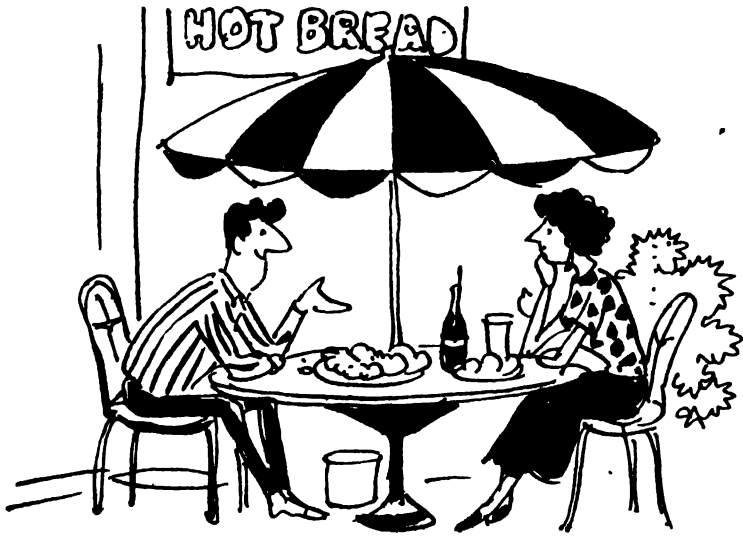
উৎসবে আহারে

ছুটির অন্য নাম ফূর্তি। পুজোর চারদিন তাই অনাবিল ফূর্তির। ঘড়ির শাসন না মেনে ঠাকুর দেখে বেড়ানো আর ডাক্তারের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে ক'দিন যত্রতত্র যথা-ইচ্ছা ভোজন।

এখনও, এত বয়সে প্যাণ্ডেল থেকে প্যাণ্ডেলে ঠাকুর দেখে বেড়াতে আমার ভাল লাগে। আলোর বন্যায় শহরটা ভাসে, সবার মুখে হাসি, অঙ্গে নতুন জামাকাপড়। দায়-দায়িত্ব-মলিনতা-মুক্ত ক'টা দিন। স্বীকার করি, প্যাণ্ডেলের বাইরে নানাবিধ ভোজ্যের স্টলও আমাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কবে কোন স্টলে কী পাওয়া যাবে জানি না বলে ভোজনের প্ল্যান করে রাখতে পারি না। তাই অন্য প্ল্যান করে রাখি, যা আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো ব্যর্থ হয় না!

এই শহরে ভোজনের কথা ভাবলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এত বড় শহর, এত বাসিন্দা। এত ভোজনরসিক থাকাও তো উচিত ছিল। আশ্চর্য, তিন বছর আগে যখন স্কাইরুম বন্ধ হয়ে গেল, কলকাতায় একটা প্রতিবাদসভা পর্যন্ত হল না।! বুদ্ধিজীবীরা গান্ধীজির মূর্তির পাদদেশে পালা করে অনশন করলেন না, পতাকা-ফেস্টুন নিয়ে একটা মিছিলও বেরুল না। একটা মহৎ অস্তিত্বের এমন নিঃশব্দ অন্তর্ধান আমাকে এখনও পীড়া দেয়।

স্কাইরুমের ধারাটি এখনও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করছে ওই পার্ক স্ট্রিটের ব্লু ফক্স রেস্টুর‍্যান্ট। সেখানে কী খাব সপ্তমীর দ্বিপ্রহরে, তা-ও ভেবে রেখেছি। প্রন ককটেল, চিকেন আ লা কিয়েভ এবং ব্ল্যাক ফরেস্ট। গুরুভোজন হবে সন্দেহ নেই। তা হোক!

তবে শাস্ত্রে বলেছে, ভিন্ন রুচির্হিঃ লোকাঃ। অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি।

আপনি আপনার মনোমতো পদ আদেশ করবেন। ব্ল্যাক ফরেস্ট অপেক্ষা জুকোটা আপনার ভালবাসার মিষ্টান্ন হতে পারে। অথবা, চিকেন আ লা কিয়েভ অপেক্ষা চিকেন স্টেক সিজলিং। এই ভোজনশালার একটি বিশেষত্ব, পানীয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার সিঙাড়ার পরিবেশন বিনামূল্যে।

দ্বিপ্রহরের ভোজনের আগে ছিল ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশ। তারও আগে দেবস্থানে অঞ্জলি। আমরা অঞ্জলি দিতে যাই বেলতলার গভীরে একটি সর্বজনীন পুজোয়। মূর্তিতে শোলার সাজ। শান্ত পরিপাটি পুজো হয়। অঞ্জলির মন্ত্র স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। নির্ভুল পুনরুচ্চারণ করি। কখনও ম্যাডক্স স্কোয়ারেও গিয়েছি। সেখানেও অন্তরঙ্গ পরিবেশ। ভিড় একটু বেশি। মূর্তির সনাতন উজ্জ্বল ডাকের সাজ। প্রসাদ প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না।

অতঃপর, প্রাতরাশের জন্য আমার প্রিয় স্থান ছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর জুনিয়র ব্রাদার্স। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। আমাদের ভোজনের পদ অপরিবর্তিত থাকত। ছোট কচুরি, তরকারি আর তপ্ত জিলিপি। এয়ারকণ্ডিশানিং কেন বর্জিত হল জানি না। ছোট ঘরটাও গেল তার সঙ্গে। এবং চেয়ার-টেবিল। এখন সামনের ঘরে দাঁড়িয়ে খেতে হয় ভিক্ষুকের মতো। তাও খেয়েছি একবছর। এবার ঠিক করেছি হাজরা রোডের দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গরম সিঙাড়া এবং সদ্যপ্রস্তুত সীতাভোগ-মিহিদানা বাড়িতে নিয়ে এসে প্রাতরাশ সারব। আমার বিশ্বাস, কলকাতায় দেশবন্ধুর মতো উপভোগ্য সীতাভোগ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর ঠাকুর দেখতে বেরুব। বালিগঞ্জ কালচারাল এবং সমাজসেবী আমাদের বাড়ির কাছে। এদের প্রতিমা এবং প্যাণ্ডেলের সজ্জা অনবদ্য। এই সময়টা ভিড় থাকে না। সন্ধ্যায় গেলে প্যান্ডেলের আলোকসজ্জা যেন কোনও স্বর্গসভায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু যেতে-আসতে অনেক সময় লাগে।

এবারে বাড়ি ফিরে আবার বিশ্রাম। তারপর যাব উত্তরে। কঠিন যাত্রা। শহরের আলোকসজ্জা মনে রাখার মতো। মহম্মদ আলি পার্কের বিখ্যাত পুজো দেখতে অনেক সময় লাগে। বেরিয়ে এসে গাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতি বছর পৃথিবীর কোনও বিখ্যাত সৌধের প্রতিরূপ তৈরি হয় এখানে। বাঁশ আর কাপড় দিয়ে শিল্পীর অলৌকিক কীর্তি। কোনওক্রমে বিবেকানন্দ রোডে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজো দেখে ফিরতে হয়। কলকাতার অন্যতম প্রাচীন সর্বজনীন পুজো। সব জায়গায় যেতে না পারার আক্ষেপ থেকে যাবে। বাগবাজার সর্বজনীন পুজো বুঝি আশি পেরিয়েছে। একচালা সাবেকি দুর্গামূর্তি। চোখ ঝলসানো ডাকের সাজ। সেখান থেকে আমরা যাব শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।

পাঁচমাথার মোড়ে অনেকদিনের পুরনো ভোজনশালা গোলবাড়িতে। কষা মাংসের জন্য বিখ্যাত। বসে খাওয়া সুবিধের হয় না। কষা মাংস আর রুটি গাড়িতে বসে খাওয়া সম্ভব হলে ভাল হয়। তাই করি। বাড়িতে আনতে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে তার স্বাদ কমে যায়। আর-একটা উপায় অবশ্য ছিল। গ্রে স্ট্রিট আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সংযোগে মিত্র কাফে। এদের চিকেন কবিরাজি খেতে খেতে পথ চলা যায়। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।

তার স্বাদ ম্লান হয়নি।

মহাষ্টমীর সকালে অঞ্জলির পর যাব বাবুবাগানের পুজোমণ্ডপে। ঢাকুরিয়া পোল থেকে দক্ষিণে নেমে নানা গলিপথে যেতে হয়। এই সময়টায় তবু যাওয়া যায়। রাত্রে, যখন যাওয়ার আদর্শ সময়, যখন সমস্ত অঞ্চলটা অবর্ণনীয় সুরলোকে রূপান্তরিত হয়, তখন ভিড় হয় অকল্পনীয়। মণ্ডপের ভেতরে সাজসজ্জা ও আলোতে মন্ত্রমুগ্ধ হয় মানুষ। ফেরা আরও কঠিন হয়, এই জন্য যে, যাওয়ার আর ফেরার পথ ভিন্ন। বড় হাঁটাহাঁটি করতে হয়। অতএব যোধপুর পার্কের পুজো দেখে ফেরার পথে, আজ আমাদের প্রাতরাশ হবে রাজ হোটেলে। এই দক্ষিণী ভোজনালয়টি উত্তম মঞ্চের পাশে বলা যায়। সাজসজ্জা বিশেষ নেই। এয়ারকণ্ডিশনিং আছে। এবং প্রকৃত বিশুদ্ধ দক্ষিণী ভোজ্য পাওয়া যায়। মশলা দোসা গ্রহণ করলে আর কিছু পরখ করার সামর্থ্য থাকে না, তাই আমি সাদা ঘি দোসার পক্ষপাতী। পরে একটি ইডলি এবং এক খণ্ড বড়া। এক গ্লাস ঘোল ইচ্ছে থাকলেও গ্রহণ করতে পারি না। কারণ উপরোক্ত তিনটি পদের সঙ্গে প্রভূত সাম্বর এবং চাটনি যুক্ত হয়েছিল। শ্যেনদৃষ্টি পরিচারকের আতিথেয়তায় ওই দুটি বাটি খালি থাকার উপায় নেই। পারলে এক কাপ কফি নেব। সদ্য প্রস্তুত দক্ষিণী ফিল্টার কফির স্বাদ গন্ধে অন্য মাদকতা। অনাস্বাদিত সুখ এনে দেয়।

শৌখিন জায়গা পছন্দ হলে অবশ্য যেতে হবে আনন্দ-এ। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ওপর দোতলার এই ভোজনশালাটি সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। রাত্রে ডিনারের জন্য বাইরে লাইন দিয়ে সমঝদারদের অপেক্ষা করতে দেখেছি। ব্রেকফাস্টে আসন পাওয়া সহজ। দোসা, ইডলি ও বড়া এখনও প্রধান। ভোজনকক্ষ আধুনিক রীতিতে সামান্য অন্ধকার, কিন্তু সাজসজ্জা সুন্দর।

অষ্টমীর দ্বিপ্রহরে আমরা ভোগের অপেক্ষায় থাকব। পাড়ার যে পুজোয় চাঁদা দিই তাদের অষ্টমীর ভোগ দেওয়ার অনুরোধ করা থাকে। শালপাতা এবং প্লাস্টিকের বাটিতে দুপুরের আগেই ভোগ বাড়িতে পৌঁছে যায়। খিচুড়ি, বেগুন বা কুমড়ো ভাজা, বাঁধাকপি বা কুমড়োর তরকারি—কী তার অপূর্ব স্বাদ। সেই ভোগ আমাদের পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুম্বই শিবাজি পার্কে কত বন্ধুবান্ধব এক সঙ্গে বসে ভোজ খাওয়া হত। এক সঙ্গে ভোজনের মতো সুখ আর হয় না।

অষ্টমীর সন্ধ্যায় আর একবার আলোর খেলা দেখতে যাব। এবার দক্ষিণে। বিজয়গড়ে ভারতমাতা দুর্গাপুজোর আলোকসজ্জা অনেক দূর থেকে শুরু হয়ে যায়। অনেকখানি হাঁটতে হবে। দর্শনের পর আবার বড় রাস্তায় ফিরে এসে সুকান্ত সেতুর নীচে যে সর্বজনীন পূজা তার প্রতিমা অভিনব এবং সুন্দর।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কেমন নেশা ধরে যায়। পারলে গড়িয়ার মিতালি সঙ্ঘের নবদুর্গাও দেখে আসব। ফিরতে ইচ্ছা করে না।

আমাদের আজ রাত্রে খাবার কথা গোলপার্কের কাছে সাদার্ন আমিনিয়াতে। অতি অল্প সময়ে এই ভোজনশালাটি সমঝদারদের মন কেড়েছে। সহজে জায়গা পাওয়া যায় না, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নীচে। গিয়ে বসতে পারলে কী আদেশ করব আমার স্থির করা আছে। মেনুকার্ড দেখতে হবে না। মটন বিরিয়ানি, মটন পসন্দা কবাব এবং

ধনিয়া চিকেন। এই তিনটি পদই আপন আপন ভূমিতে সম্রাট। নানাস্থানে ঘুরে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, বিরিয়ানি সমাজে সাদার্ন আমিনিয়ার মটন বিরিয়ানি উঁচু কুলীন। বাকি দুটি পদও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এবং অন্যত্র সহজলভ্য নয়।

নবমী। এই সকালে যথারীতি অঞ্জলির পর পদ্মপুকুরের প্রতিমা দেখতে যাব। পুকুরের ওপর এই প্রতিমা প্রতি বছরই আনন্দ দেয়। আশপাশে উল্লেখযোগ্য আরও দু-একটি পূজামণ্ডপ দেখে আজকের ব্রেকফাস্ট শরৎ বসু রোডের ওপর (গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) হট ব্রেড্‌সে। এখানে বসবার আসন অল্প। আমাদের উদ্দেশ্য বাইরে ছাতার নীচে বসা। একটি বিদেশি স্পর্শ পাওয়া যায়। আহারাদি সবই বিদেশি, সদ্যপ্রস্তুত বিবিধ চরিত্র ও রূপের পাউরুটির এমন সমারোহ আর কোথাও নেই। কলকাতায় একমাত্র এই স্থানেই সত্যিকারের ক্রোয়াসঁ পাওয়া যায়। পরতে পরতে খুলে ক্রোয়াসঁর স্তরগুলি অবর্ণনীয় সুস্বাদু। মুশকিল হল, এদের আয়োজন মূলত এখান থেকে কিনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই মধু বা মেপল সিরাপ পাওয়া যাবে না। তবু যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হব। অন্য তপ্ত সদ্যপ্রস্তুত পদের মধ্যে আমার প্রিয় সসেজ রোল এবং চিকেন রোল। বলা বাহুল্য, আমাদের পরোটা রোলের জ্ঞাতি নয়। এখানে চা সন্তুষ্টি দেয় না। চা বাড়ি ফিরে পান করা যাবে। লাঞ্চে এলে হট ব্রেড্‌সের বিভিন্ন সালাদ গ্রহণ করা যেত।

নবমীর দুপুরে আমাদের অভিলাষ পিটার ক্যাট। পার্ক স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে এই স্বল্পখ্যাত ভোজনশালাটি অবহেলার নয়। আমার আদেশের মধ্যে অবশ্যই একটি বিশেষ পদ থাকবে। সেই পদটি চেলো কাবাব। কলকাতায় ইরানের এই ভোজ্যটির একমাত্র সফল প্রবক্তা পিটার ক্যাট। গলিত মাখনে সিক্ত ভাতের সঙ্গে কাবাবের ঈষৎ ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। দুয়ের মিলন অপূর্ব। আর কী নেব এখনও ঠিক করিনি।

নবমীর রাত্রে আবার দূরের যাত্রা। বাইপাস ধরে এয়ারপোর্টের পথে শ্রীভূমি। সামনে খানিক জল পেয়ে যাওয়াতে এঁরা স্থল-জল মিলিয়ে এমন একটা মায়াময় আবহ গড়ে তোলেন যে স্থির হয়ে দেখতে হয় অনেকক্ষণ।

কাছের আরও দু-একটি প্রতিমা দেখব। ব্রহ্মকুমারীদের এক বিচিত্র প্রতিমা দেখেছি কাছেই কোথাও। সেখানে মানুষেরা দেবদেবী মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখে বোঝা যায় না প্রতিমা মাটির নয়। আসলে মানুষ দিয়ে তৈরি, জীবন্ত মানুষ। আধঘণ্টা দর্শন দেওয়ার পর একবার পর্দা ফেলা হয়। মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা সাময়িক বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার পর্দা তোলা হয়। জানি না সে-পূজা এ বছরও হবে কি না।

নবমীর রাত্রে কোথায় ভোজন হবে এখনও ঠিক করতে পারিনি। পিয়ারলেসের আহেলী রেস্টুরেন্ট থেকে আমার প্রাথমিক তালিকায় আছে। আহেলী মানে খাঁটি। বাংলা ভোজ্যের অতি সুসজ্জিত সুন্দর ভোজনশালা। থালি আদেশ করতে হবে। মাছ মাংস সবজির বিবিধ ব্যঞ্জন থাকবে থালিতে। পরিচারক-পরিচারিকারা অতি বিনীত, পরিবেশন অভিনব এবং রুচিসম্মত। কাঁসার থালায় কলাপাতার আস্তরণ দিয়ে খাবার সাজিয়ে নিয়ে আসবে। খালি মনে হয়, সর্বাঙ্গীণ পরিশীলিত সুন্দর আয়োজন, সুন্দরতম হত পাকপ্রক্রিয়ার দিকে আর একটু মন দিলে। আসলে কী জানেন, কোনও

ভোজনশালাতেই বাংলা রান্না আমাদের কাছে একশো নম্বর পায় না। আমরা যে মা-মাসিমা, ঠাকুমা-পিসিমার রান্না খেয়ে বড় হয়েছি।

বলতে গেলে নবমীতেই পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ দশমীতে বিদায়ের বাঁশি বাজছে সর্বত্র। কোনওবারেই দশমীর অঞ্জলি দেওয়া হয় না। পৌঁছনোর আগেই বিসর্জন-পূজা হয়ে যায়। মণ্ডপে অলস ঘোরাঘুরি করে ব্রেকফাস্টের সন্ধানে যাব। আজ ব্রেকফাস্টের মেনু চানা-বাথুরা। সব 'কোয়ালিটি'তে পাওয়া যায়, গঙ্গৌরে পাওয়া যায়। আমরা যেহেতু লাঞ্চ করব গঙ্গৌরে তাই ওখানে ব্রেকফাস্টে যাব না। আরও অনেক ভোজনশালাতেই যথোপযুক্ত চানা-বাথুরা পাওয়া যায়। পছন্দ না হলে চাটও নিতে পারি। কলকাতার অনেক জায়গায় এখন উচ্চশ্রেণীর চাট পাওয়া যায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের জুনিয়র ব্রাদার্স তার মধ্যে অন্যতম।

আজ আর প্রতিমাদর্শন নয়। মণ্ডপে গেলেই মনে বিষাদের ছোঁয়া লাগে। আসন্ন নিরঞ্জনের ছায়া সবার মুখে। দুপুরে উৎসাহ সংগ্রহ করে গঙ্গৌরে যাই। রাসেল স্ট্রিটের উত্তর প্রান্তে একদা মিষ্টান্নের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই দোকানটির কিয়দংশে নিরামিষ ভোজনশালা। প্রথম প্রবেশ করেই আঘাত পেয়েছিলাম। জনৈক ব্যক্তি মস্ত দোসা খাচ্ছিলেন। এখানেও দোসা! হায়রে, পিঁয়াজ টমাটার পঞ্জাবি প্রকরণ আর দক্ষিণী দোসা আর ইডলি আমাদের বিনীত রন্ধনপ্রকরণগুলিকে প্রায় পরাভূত করে এনেছে। গঙ্গৌরে দেখেছি, এখনও খানদানি রাজস্থানি ভোজ্যর চর্চা আছে। আমি রাজস্থানি থালি আদেশ করব। জানি খেয়ে শেষ করতে পারব না, তবু। কারণ মাথাপিছু একথালা নিতেই হয়। তবে অন্যান্য খাবার আলাদা করে নেওয়া যায়। পূর্ণ থালির শুরু দুটি প্রকাণ্ড এবং হালকা পুরি দিয়ে। সব বর্ণনা করব না। রাজস্থানি খাবারের সঙ্গে সবার পরিচয় নেই। গঙ্গৌর সেই অভাব দূর করেছে। বিখ্যাত পদ গাট্টা থাকবে, সেংরির তরকারি থাকবে আর সর্বকালের বিখ্যাত রাজস্থানি পদ ডাল-বাটি-চুরমা থাকবে। ডাল, সবজি, রায়তা সবই স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। পাপড়, মিষ্টান্ন তো আছেই।

ভোজনের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিত বিশ্রাম। বিজয়ার দিন বাড়ি থেকে বেরোব না। বেরোবার প্রয়োজনও নেই। ছোটরা কেউ হয়তো আসতেও পারে। বিজয়ার রাত্রে আমাদের ভোজ্য পূর্বনির্দিষ্ট। বহুকাল ধরে। লুচি, আলুভাজা অথবা বেগুনভাজা, অথবা দুই-ই, মাছের চপ এবং শেষ পদে সন্দেশ।

আলু ঝুরি করে ভাজা হবে, বেগুনভাজা তেল চপচপে হবে না। সন্দেশ হয় সিমলা স্ট্রিটের কালিচরণের গোলাপি পেঁড়া অথবা বাঞ্ছারামের আবার খাব। আর লুচি? লুচি তো শরতের প্রতীক। শরতের লঘু মেঘখণ্ডের মতো তার উপস্থিতি চোখ ভরে দেখতে ভাল লাগবে, ছিঁড়তে ইচ্ছা করবে না। সম্পূর্ণ বৃত্তাকার, তুলোর মতো ভারহীন, শরতের মেঘের মতো অলৌকিক এই পদার্থটি বাঙালির গর্ব, বিশেষ করে কলকাতার। লুচি ছাড়া কোনও উৎসব পূর্ণতা পায় না।

আশা করছি এবার পুজোও তেমনি নিটাল হয়ে উঠবে।

ছুটির উতলা রসনা

ছুটির সঙ্গে বাঙালির রসনার একটা গূঢ় রহস্যময় সম্পর্ক আছে। তা না থাকলে ছুটি আসন্ন হলেই কেন সুখাদ্যের স্বাদের জন্য বাঙালির মন উতলা হয়ে উঠবে? বয়স হলে অনেক সম্পর্কের মতো ছুটি ও সুখাদ্যের যোগটাও ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই বয়স্ক মানুষ বাঁধা ছক পেরিয়ে কিংবা বাড়ির বাইরে সহসা আহার করতে দ্বিধা করেন। সেই দ্বিধার সবটাই পরিপাকশক্তির বর্ধমান দুর্বলতার কারণে নয়।

যাঁরা বয়সে বা শরীরে না হোক, মেজাজে বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন তাঁদেরও ধারণা, বাড়ির বাইরে ভাল খাবার হয় না এবং বাইরের সবাই আপনার খাবারে বিষ অথবা প্লেগের জীবাণু যুক্ত করবার জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করছে। তাই পুজোর কদিনও তাঁরা অনায়াসে বাড়িতে ভালমন্দ রন্ধনের ফরমায়েশ করতে কার্পণ্য করেন না। অথচ বলুন তো, কালিকার সাড়ে তিন টাকার বেগুনি অথবা চৌত্রিশ টাকার রয়্যালের চাঁপের মতো অপার্থিব খাদ্য কোন্ বাড়িতে হতে পারে। বুকে হাত দিয়ে এমন কথা বলতে পারবেন?

তা ছাড়া, সাংসারিক শান্তির 'স্থিতাবস্থা' রাখতেও অন্তত পুজোর ক'দিন বাইরে ভোজন করা সমীচীন হবে। প্রত্যহ বাড়িতে স্বহস্তে পাকশালা পরিচালনা করে, অথবা নিরন্তর স্বমুখে রন্ধনের নির্দেশ দিয়ে, কোন গৃহিণীই না একটু অবকাশ চাইবেন? যখন সেই অবকাশ দীর্ঘ চারদিনের এবং আকাশ যখন নীল, বাতাসে ফূর্তির সৌরভ? এমন দিনে কে যেতে চাইবে রন্ধনশালে, স্বেচ্ছায়? তবে এটা ঠিক যে, পকেট এমন আকাশের মতো অবারিত নয়, সামর্থ্যও নয় দিগন্তপ্রসারী। তাই কিঞ্চিৎ সতর্ক হয়ে এবং বিবেচনা করে বাইরে ভোজনের আয়োজন করতে হয়। পরিবার বড় হলে তো বটেই।

এদিকে সব কাগজে, দৈনিক এবং সাময়িক, লাগাতার পুজোর রকমারি রান্নার প্রলম্বিত ফিরিস্তির চর্বিতচর্বণ চলেছে। ওই সব রঙিন প্রলোভন অবজ্ঞা করাই বিচক্ষণ পুরুষের লক্ষণ। ও সব যাঁরা লিখছেন, তাঁরাই রন্ধন করে খেয়ে দেখুন। খাওয়ালেও আপত্তি করবেন না। পুজোর ছুটির ক'দিন গৃহিণীকে বহুবর্ণে মুদ্রিত খাদ্যরাশির সোনার হরিণ দেখিয়ে রান্নাশালের অরণ্যে ডাকবেন না। ডাকলে একদা লঙ্কাকাণ্ডই হয়ে যাবে।

কথা হচ্ছে, তা হলে পুজোর এই চারদিন সবাইকে নিয়ে কোথায় যাবেন? আক্ষেপের কথা আমাদের এই শহরে ক্রমশই মনে রাখবার মতো ভোজনশালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পার্ক স্ট্রিটের স্কাইরুমের মতো এমন একটা মায়াবী ভোজনশালা কোনও শহর থেকে উঠে যায়, ভাবতেও কষ্ট হয়। দীর্ঘদিন জন-রসনা ও চিত্তকে আপ্লুত করে কয়েক মাস আগে স্কাইরুমের বিদায়যাত্রা জাতীয় শোকের দিনের মতো। দু-দশটা নতুন নতুন ভোজনশালা এখানে-ওখানে প্রায়ই উদয় হচ্ছে দেখতে পাই, তারা সবাই রূপে মোহিত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন, গান দিয়ে দ্বার খোলাবার কথা তাদের কল্পনায় আসেনি, অন্তত পরিকল্পনায় তো নয়ই।

জানি, বেগুনির সঙ্গে দুর্গাপুজো ঠিক খাপ খায় না, নইলে কালিকা তো ছিলই মির্জাপুর স্ট্রিটে। কিন্তু আজকাল তো প্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবিরও চল হয়েছে, চলেছে ভালই। তবে? তেলেভাজার আর এক অসাধারণ শিল্পী ছিলেন বাগবাজারে, যাঁর সাইনবোর্ড তাঁর ভোজ্যের চেয়ে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। সেই 'বেঙ্গল ফেমাস অয়েলফ্রায়েড শপ' এখন রাহুগ্রস্ত হয়েছে। যাঁদের সঙ্গে সেই দোকানের শুক্লপক্ষের পরিচয়, তাঁরা এখন নিরাশ হবেন।

যদি তেলেভাজা মনোমতো না হয়, তা হলে কচুরি এবং রাধাবল্লভীর কথা ভাবা যেতে পারে। একদা সুপরিচিত পুঁটিরাম এখনও উত্তর কলকাতার কলেজপাড়ায় তাঁদের স্টুডিয়ো চালু রেখেছেন। যে রাধাবল্লভী সেখানে পাওয়া যায় তার স্বাদ ফেলনা নয়, কিন্তু অর্ধশতাব্দী আগের এক আনার রাধাবল্লভীর স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। এই পঞ্চাশ বছরে রাধাবল্লভীর স্বাদ এমন বদলে যায়? আসলে সব সময় খেয়াল থাকে না, এই সময়ে আমিও অনেক বদলে গিয়েছি।

দক্ষিণে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের রাধাবল্লভী এবং ছোলার ডাল সহযোগে কচুরি—উভয়ই দামে কম। সেই কারণে ভাল বলতে পারি। কিন্তু কচুরিতে যদি আপনার অভিলাষ হয়, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর জুনিয়র ব্রাদার্সে যাওয়া প্রয়োজন। এরা কচুরি শিল্পের বিশেষজ্ঞ। এখানে আলুর তরকারি সহযোগে ছোট কচুরি, এক প্লেটে চারখানি, দাম সম্ভবত পাঁচ টাকা, আপনাকে মাতিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভাল শিল্পীর আঁকা ছবির মতো ভাল কচুরিও অতি দুর্লভ বস্তু। প্রায়ই গিয়ে শুনেছি, নেই ফুরিয়ে গিয়েছে। আরও একটা আকর্ষক বস্তু এই দোকানে বেলা গড়াবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়, তার নাম জিলিপি। গভীর পীতবর্ণ, সুঠাম এই মিষ্টান্নটি সুগঠিতা সুন্দরী যুবতীর মতোই লুব্ধ লোকচক্ষু পরিহার করে চলে। অনেকবার ভেবেছি, মালিকদের অনুরোধ করব, যাতে এই বস্তুটিকে জনগণের সুস্বার্থে আরও কিয়ৎকাল দোকানে থাকতে বাধ্য করেন।—বলা হয়ে ওঠেনি।

মনোহরণ জিলিপি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের তিওয়ারি এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের তিওয়ারি এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের হলদিরামের দোকানেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও জিলিপির উপস্থিতির সময় সীমিত। এই জিলিপি পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যসচেতন ক্ষীণাঙ্গী যুবতীর মতো। আগে আমরা যে জিলিপির মায়ায় সম্মোহিত ছিলাম সেই স্লিমিং-না করা ঈষৎ পুষ্টাঙ্গিনী সুন্দরীর মতো রসস্থ জিলিপি এখন আর সর্বত্র পাওয়া যায় না। এবং আমার অজ্ঞাত কোনও কারণে এদেরও আবির্ভাব অতি প্রত্যুষে এবং উপস্থিতি এক প্রহরের বেশি নয় সাধারণত কম।

দ্বিপ্রহরের ভোজনের একটু অসুবিধা আছে অনেক অনিন্দ্যনীয় ভোজনশালা, যেমন শ্যামবাজার অঞ্চলের মিত্র কাফে বেলা সাড়ে পাঁচটার আগে খোলেই না। ছুটির দিনে বাংলা খাবার খেতে হবে এমন অপ্রতিরোধ্য জেদ যদি থাকে আপনার, তা হলে প্রশস্ত স্থান এসপ্লানেডের ওপর পিয়ারলেস কোয়ালিটি ইনের আহেলী রেস্টুর‍্যান্ট। এখানে শুধুই বাংলা খাবার পরিবেশন হয়। বড় হোটেলের ভোজনশালা, পরিপাটি, সুপরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত অলঙ্করণ। আহার্য পরিবেশনের রীতিও অভিনব। মাছ মাংস ডাল সবজি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো একটি থালির দাম পুজোর কদিন ১৭০ টাকা—সব সরকারি শুল্ক নিয়ে। দাম বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু এর কমে কোনও প্রসন্ন ভোজনকক্ষে এমন রুচিকর ভোজন হবে না।

অন্য বড় হোটেলগুলির বাংলা ভোজ্যের আলোচনা না করাই ভাল। তারা দামে যত বেশি, স্বভাবে ও স্বাদে ততই কম। তবে, যদি অন্য কোনও দেশের অন্য কোনও ধারার পদ আপনার অনুরাগের হয়, তা হলে অবশ্যই বড় হোটেলের ভোজনশালাগুলি ভাল। মাথা পিছু তিনশো টাকার কমে উঠে আসতে পারবেন না। এবং এ কথাও হলফ করে বলতে পারব না যে, দেশজ অথবা যে জাতের খাবার আপনি আদেশ করেছিলেন, পরিবেশিত ভোজ্যগুলি প্রকৃতই তাই। এদের বাংলা রান্নার এলেম দেখে এমন সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

স্কাইরুমের তিরোধানের পর, এখন আমার পছন্দের ভোজনশালা ব্লু ফক্স। আগে নৃত্যবাদ্যাদির আয়োজন এদের অনেক ব্যস্ত রাখত। এখন নিরঙ্কুশ ভোজ্যের দিকে মন দিয়ে গ্রাহকদের প্রশংসা পাচ্ছেন। স্কাইরুমে মদ্যপান বর্জিত ছিল। ব্লু ফক্সে সেই বাধা নেই। এদের অনেক পদই মনমুগ্ধকর। আমার দুটি প্রণয়ের কথা বলি। ছোটে নবাব এবং ক্রাব থার্মিডর। প্রথম পদটি কুক্কুটশাবকের ডানা থেকে উৎপন্ন, দ্বিতীয়টি, নামেই প্রকাশ, কর্কট অর্থাৎ কাঁকড়া থেকে। এক পাত্রে তিনখণ্ড ক্র্যাব থার্মিডর থাকে। চার খণ্ড ছোটে নবাব গ্রহণ করবার পর তিন খণ্ড ক্র্যাব থার্মিডর, অতিভোজনের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, কিন্তু উভয় পদই আনন্দ দেয় অবিরল।

একটু আগেই বলছিলাম রীতিসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত বিশুদ্ধ রন্ধনধারার কথা। চিনা খাবারে সেই বিবিধ রীতির মিশ্রণের আশঙ্কা নেই। চিনা রন্ধনশিল্পের এত অসংখ্য ধারা আছে এবং তাদের পার্থক্য এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে, রন্ধনরীতির কোনও বেনিয়ম হলেও তর্কের অবকাশ থাকে না। চিনা খাবারে আমার প্রিয় পার্ক হোটেলের জেন (Zen) রেস্টুর‍্যান্ট।

এই সুসজ্জিত ভোজনশালায় এক সন্ধ্যার ভোজন মনে রাখবার মতো অভিজ্ঞতা। ভোজ্য পদগুলিও অনির্বচনীয় সুস্বাদ। পদের পরিমাণে কার্পণ্য স্পষ্ট। শ আড়াই টাকার কমে একজনের মনোমতো ভোজন হবে না।—তাও যদি চিংড়ি মাছ সতর্ক পরিহার করেন।

পুরনো ওয়ালডর্ফ রেস্টুর‍্যান্ট এখন একটা থাই ভোজনশালা সংযুক্ত করেছে। পৃথিবীতে এখন থাই রন্ধনভোজনের রমরমা চলেছে। কলকাতায় ওয়ালডর্ফ সূত্রপাত ভালই করেছে। দামও সাধ্যতীত নয়।

জামা মসজিদের কাছে রয়্যালের চাপ প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। খ্যাতির সঙ্গে দামও বাড়ছে, এখন কুড়ি টাকা, মুরগি বা মটন যাই হোক না কেন। রয়্যালের অন্য একটি পদের সঙ্গে আমি আটপাকে বাঁধা পড়েছি। সেই পদটির নাম নার্গিস কোফতা। পৃথিবীর তাবত সুন্দর বস্তুই দুর্লভ। রয়্যালের নার্গিস কোফতাও তার ব্যতিক্রম নয়। সপ্তাহে একদিনই পাওয়া যায়, বুধবার। দেরি করে গেলে নাও পেতে পারেন। মসৃণ সিদ্ধ একটি কুক্কুট ডিম্বের ওপর পঙ্খের কাজের মতো অতি মিহি কিমার সর্বাবয়ব আস্তরণ। সেই কোফতা অলৌকিক কোনও সুধাময় সমুদ্রে ভাসছে—না গ্রহণ করলে এর মর্যাদা মর্মস্থ হবে না। অল্প দাম, চোদ্দ টাকা। রুটি বা বিরিয়ানি যাই হোক, আপন পদগৌরবে নার্গিস কবাব তাকেও সুখের কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে।

নেই নেই করেও তালিকা বেড়েই যায়। শেষ করবার আগে বলে নিই পার্ক স্ট্রিটের লক্ষ্ণৌ হোটেলের, মৃত্যুশোক ভুলিয়ে দিয়েছে মোড়ের অদূরে জগদীশ বসু রোডের রহমানিয়া রেস্টুর‍্যান্ট। এঁদের চিকেন চাপ একটি অনবদ্য পদ। সর্বদা পাওয়া যায় এবং মনে হয় অফুরন্ত আয়োজন। আমার বিশ্বাস, আজকের কলকাতায় রহমানিয়া চিকেন চাপের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। দাম বাড়িয়ে সাড়ে সতেরো টাকা করেছে। তার জন্য দুঃখ তত নয়, যত দুঃখ কুক্কুটখণ্ডের আকারও কমানোর জন্য।

শেষ আর একবার শ্যামবা জারে ফিরে যাই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার ওপর রাউন্ড বিল্ডিং-এ পাঞ্জবি দোকানের কষা মাংসের খবর বেপাড়ার লোকও জানে। কিন্তু গ্রে স্ট্রিট এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ সংযোগস্থলে মিত্র কাফের কথা অনেকেই জানেন না। এরা সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার আগে ভোজনশালা খোলে না। রাত্রি দশটায় বন্ধ। তবে পুজোর সময় শেষরাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকবে। এদের চিকেন কবিরাজি-কাটলেট অথবা মটন চপ ড্রাই—চব্বিশ-পঁচিশ টাকা দাম পড়বে বটে, কিন্তু আহারের পর বলতে বলতে ফিরবেন, এমনটি আর হয় না। মিত্র কাফে রন্ধনশিল্পেও অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার কথা তো অনেক হল। সত্যি বলতে কী, পুজোর মধ্যে আমি যে ভোজ্যটির জন্য আকুলতা বোধকরি, তার ওপর যদি আকাশ ঈষৎ কালো হয়, শীতল হাওয়া বইতে থাকে,—সেই ভোজ্যপাচ্যটির নাম হল খিচুড়ি। গব্যঘৃতে সুরভিত, ভাজামুগের তপ্ত খিচুড়ি, সঙ্গে নারকেল ভাজা, বেগুনি এবং সামান্য আলুভাজা—তার কি তুলনা হয়, না হবে! কিন্তু আমার জানা কোনও ভোজনশালাতেই এই অমৃতসম পদটির আয়োজন নেই। ঘুরে ফিরে সেই বাড়িতেই আসতে হয়, গৃহিণীকে দ্বিধান্বিত অনুরোধ করতে হয়, আজ পুজোর ছুটি, আজ খিচুড়ি হলে কেমন হয়?

পান

গুরুভোজনান্তে এখন পান খাবার পালা। সুখকর ভোজনের পর একখণ্ড সুগন্ধি পান মুখে দিলে কেমন মুহূর্তে ভোজনের ক্লান্তি চলে যায়, উপরন্তু ভোজনের আনন্দ যেন দ্বিগুণ বোধ হয়। শরীর ও মন দুই-ই হালকা লাগে। তাই বোধ করি কাজের বাড়িতে শেষ দৃশ্যে পানের আবির্ভাব অবধারিত। আমরা অতিথিরা সানন্দ অভ্যর্থনা করি। ভোজনের আয়োজন যেমনই হোক, পানের আয়োজন করতে গৃহকর্তার ভুল হয় না।

কিন্তু হায়, প্রফুল্লচন্দ্র রাত্রে প্রেয়সীর জন্য যখন অপেক্ষা, অকস্মাৎ তাঁর পরিবর্তে অন্য কারও আগমনে যেমন রসভঙ্গ হয়, বিয়েবাড়ির পানও তেমনি প্রায়ই রসভঙ্গ ঘটায়। একগাদা চিনির সঙ্গে নারকেল ইত্যাদি কতগুলি অবান্তর, বেসুরো পদার্থ দিয়ে তৈরি পান সারা সন্ধ্যা ধরে প্রতিষ্ঠিত সুরের মেজাজ মুহূর্তে ভঙ্গ করে। তাড়াতাড়ি উৎসবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রিয় পানের দোকানটিতে যেতে হয়। সেখানে পুরনো সুরের আবহাওয়া আর ফিরে পাওয়া যায় না, তবু মনটা একটু প্রফুল্ল হয়। অথবা, আপনি যদি ভাগ্যবান পুরুষ হন, গৃহিণী আপনাকে তার পানের রৌপ্যাধারটি এগিয়ে দেন। পরিচিত, সুগন্ধি, সুস্বাদু পান আপনার ভোজনের আনন্দ ফিরিয়ে দেয়। পান তো মাছের কালিয়ার পর চাটনি নয় যে অমন নির্লজ্জ মিষ্টি হতে হবে। বরং কাব্যি করে বলা যায় পান হল বিয়ের পর ফুলশয্যা—পূর্ণতার, সুখের, গভীরতার চিহ্ন।

আগে অনেক বাড়িতে পানের আয়োজন থাকত। গৃহিণীরা সকালে দুপুরে পানের বাটা খুলে পান সাজার পাট শুরু করতেন। সুপারি কাটারই কি কম ঘটা ছিল? ঠাকুমার পান সাজার স্মৃতি আমার স্পষ্ট মনে আছে। গরমকালে বাড়িতে কেয়া খয়ের তৈরি হত। কেতকী ফুলের ভেতর খয়ের পুরে কাপড়ে মুড়ে কিছু দিন রাখলে কেতকীর উগ্র গন্ধ

কেমন পোষমানা নম্র হয়ে আসত। শীতকালে কমলালেবুর খোসা শুকানো হত নরম রোদে। দুপুরের আহারের পর ঠাকুমা পান সাজতে বসতেন। পানগুলি অবশ্য সকালেই ধোওয়া হয়ে ভিজে কাপড়ে মোড়া আছে। সুপারি কাটা হল মিহি করে, তার সঙ্গে আবার দোকানে কেনা সূক্ষ্ম চাকা সুপারির কয়েক খণ্ডও যোগ হবে। আমরা সবাই ঘিরে বসে আছি, এক খিলি পান পাব। দূরান্তের কেতকী ফুলের গন্ধ বহন করে অপার্থিব কেয়া খয়ের, কমলালেবুর ভাসা ভাসা সুগন্ধ, একছিটে গোলাপ জলের সৌরভ। ছোট এলাচের লাজুক স্বাদ। সাধে কি আর তখন ঠাকুমাকে বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম? শুধু সুন্দরী বলেই নয়। পাতলা ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুকে লাল। ঘরটার বাতাসও যেন অজানা পারিজাতের মতো সুরভিত।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর বিজয় সার্ভিস স্টেশন, পেট্রল পাম্পের পাশের পানের দোকানটি আমাকে অনেক সুখ দিয়েছে। এখানে মিঠে পান বললে এক ধ্যাবড়া চিনি দেওয়া পান দেয় না। সত্যিকারের মিঠে পানের পাতা ব্যবহার করে। তার স্বাদই আলাদা। দোকানটি সহজেই খুঁজে পাবেন। পঞ্জাব ক্লাবের পাশে, ওই সারিতে। এদের খয়েরও বেশ সুস্বাদু। পানের দোকানের বিশ্বজনীন স্টাইলে এঁরাও খয়ের উত্তমরূপে বেঁটে নাকি সিদ্ধ করে খয়েরের ক্বাথ তৈরি করেন। এলাচ ও ভিজে সুপারি দিয়ে এঁদের মিঠা পান আমার ভাল লাগে। কখনও একটু পিপারমিণ্টের স্পর্শ দিয়ে দেন। মুখাভ্যন্তর অনেকক্ষণ শিরশিরে আনন্দ পায়।

আর একটি প্রিয় পানের দোকান আছে আমার। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিপরীতে পেট্রলের দোকান, অটো ফুয়েল অ্যান্ড সার্ভিসেসের লাগোয়া, তাদেরই হাতার মধ্যে। এঁরাও খয়ের সযত্নে প্রস্তুত করেন। এখানে পাতলা, হালকা হলদে রঙের মঘাই পাতা পাওয়া যায়। বরফের ওপর পান সাজা হলে পিপারমিণ্টের দরকার হয় না। মুখে দিলেই, সৌরভের রেশ রেখে মিলিয়ে যায়। এই দুটি দোকানেই এখন একটু পান-বাহার বা পান-পরাগ মিশিয়ে দেবার প্রবণতা আছে। আমার পানে এই সব অপ্রাসঙ্গিক অপকরণ মনোমত নয়। অনুপ্রবেশ কখন আগ্রাসন হয়ে পানের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে ধরা যায় না। অনেকে আবার পান-পরাগের সংযোগ খুব পছন্দ করেন। সেটা হল ব্যক্তিগত রুচির কথা। আমি শুদ্ধ রাগের ভক্ত। সামান্য মিশ্রিত রাগ কখনও আনন্দ দেয়, সচরাচর নয়।

আগে মহাত্মা গান্ধি রোড এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগ উত্তর-পশ্চিম কোণে চৌরাশিয়ার পানের দোকানে আমার খুব যাতায়াত ছিল। তাঁরা একটু খুশবু মিশিয়ে দেন। আসল শব্দটি হল, একটু। বেশি দিলেই মাটি। এখন পানের দোকানে বিবিধ খুশবু এবং নানা মিষ্টি মশলার প্রয়োগ হয়। আমার মনে হয় তারা পানের প্রাণটাকেই কোণঠাসা করে দেয়। পানের মক্কা-মদিনা কাশী-লক্ষ্ণৌতে আগে বিশুদ্ধ পান পাওয়া যেত। অর্থাৎ নবীন এবং কোমল মঘাই পানের পাতায় গোলা খয়ের এবং ছোট এলাচের দানা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন পান-পরাগের অনুপ্রবেশ সেখানেও হয়েছে। তবু মুহূর্তে মুখ ভর্তি রসে আপ্লুত হবেন। দিল্লিতে যদি যান, যদি দরিয়াগঞ্জের আদি মতিমহলে পূর্ণানন্দ ভোজন সারেন, বেরিয়েই রাস্তার অপর দিকে প্রিন্স পান হাউসে একবার যাবেন। মস্ত বড় এক বরফের চাঙড়ের ওপর মঘাই পানের পাতা সাজানো

আছে। অনেক অনুরোধ করে অল্প মশলায় আটকে রাখা যায়, নইলে সাত আটটি ছোট ছোট কৌটা থেকে রহস্যময় নানা মশলা যোগ করে দেয়। মশলাগুলো ভাল লাগে, কিন্তু পান খুঁজে পাওয়া যায় না। মুম্বইয়ের দিকে, বিশেষ করে মুম্বই শহরে আর এক রকম পানের পাতা পাওয়া যায়, মহোবা। এই পানের পাতা কোথা থেকে আসে জানি না। কিন্তু এই পান মুম্বইয়ের আলফানসো আমের মতো বিশেষ। মুচমুচে পান আলফানসো আমের মতোই মুহূর্তে মুখে বিলীন হয়ে রসে মুখ ভরে যায়। কলকাতায় যেমন প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ পানের দোকানের প্রতি অনুরাগ, মুম্বইতে তার বিপরীত। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে ভারতীয় বিদ্যাভবনের সামনের পানের দোকানের সৃষ্টি অভাবনীয়ের শ্রেণীতে পড়ে। উপকরণ তো সেই একই। অনেকে বলেন স্বাদের রহস্য নিহিত আছে মহোবা পাতায় এবং খয়ের প্রস্তুত করার শিল্পকর্মে। রাত্রে ভোজনের পর অনেক দেরিতেও শহরের উপান্ত থেকে রসিকজন এখানে এসে ভোজনপর্ব সমাপ্ত করেন। চুনের মধ্যেও কিছু থাকে। একজন বললেন, চুনে নাকি এঁরা মালাই মেশান। বলতে পারব না। এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কলকাতায় কল্পতরুর মালিকরা বললেন, ও সব বাজে কথা, ওরা সব খয়েরে বার্লি মেশায়। আমাদের দোকানে বিশুদ্ধ খয়ের পাবেন। কল্পতরুর পানের বহর খুব। আপনারা পরিচিতও হবেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ধারে এই দোকানটির বয়স হল প্রায় চল্লিশ বছর। নানা দামের পান পাওয়া যায়, ২৫ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকার পানে এঁরা কী অমৃত মেশান, কস্তুরী না জাফরান না অন্য কোনও মহার্ঘ বস্তু জানবার চেষ্টা করিনি। যত দূর মনে পড়ে এঁরা যখন দোকান শুরু করেন, তখনও পাঁচ টাকা দামের পান ছিল। তখনও পরীক্ষা করতে পারিনি। আমরা এক পয়সায় দুটি মিঠা পানে অভ্যস্ত। এখন ৫০ নতুন পয়সায় একটি পান খেতে হিমসিম খাচ্ছি। ২৫ পয়সার কমে তো পাওয়াই যায় না। পাওয়া না যাবার দলে একটি বিশেষ পান পড়ে, ছাঁচি পান, তার জন্য আমি এখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। ঠাকুমা ছাঁচি পান খেতেন, তাঁর নিশ্বাসেও ছাঁচি পানের সুগন্ধ ছিল। তাছাড়া ওই পানের স্বাদেও একটা বিশেষত্ব ছিল। এখন দোকানে সে পানের চল উঠে গিয়েছে। এখন গন্ধের স্থান নিয়েছে নম্বরি জর্দা এবং কিমাম। নম্বরের সঙ্গে যার ধাপে ধাপে দাম বাড়ে। জর্দা ও কিমাম পানকে বড় দাবিয়ে রাখে, তাই আমার ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁরা খান সেই মানুষগুলিকে বড় ভাল লাগে। অম্বুরি তামাকের মতো তাঁরা একটা সুগন্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন।

বাড়ির পান বড় ঘটার জিনিস ছিল। কত রকমের ডিবে, পানদান। নেপথ্যের কত রকমের ডাবর ও জাঁতিও নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। দুঃখ করে লাভ নেই। চলুন, সানন্দ ভোজনান্তে একটা ভাল পান খেয়ে একটু মুখশুদ্ধি করে আসি, মেয়েদের মনে করিয়ে দিই, এক সময়ে পান প্রসাধনেরও কাজ করত। ঠোঁট রাঙিয়ে দিত, সৌরভের পরিমণ্ডল গড়ত।

পানের পর আর খাওয়া যায় না। পান ভোজন-শেষের সংকেত।

দশপ্রকাশ

শুনেছি ভারতবর্ষে নিরামিষাশীর সংখ্যাধিক্য। নিরামিষ রন্ধন-প্রণালীও আমাদের নিজস্ব। এবং এখনও পর্যন্ত প্রায় অপ্রভাবিত ও অবিকৃত। আমাদের আমিষ রন্ধনে যেমন মোগল কি ইরানি ছোঁয়া লেগেছে, নিরামিষ রান্নাতে বাইরের তেমন কোনও স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় না। পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু সামান্য। দক্ষিণ ভারতের খাদ্য সম্ভবত গত দু-চার হাজার বছর সংক্রমণ মুক্ত আছে। ভারী বিরল নিদর্শন। ভাবুন তো হাজার কয়েক বছর দাক্ষিণাত্যের মানুষ শুধু এক রকমের ডাল খেয়েই কাটিয়ে দিলেন, অড়হর। উপকরণই এক নয়, রান্নার প্রণালীও রীতিগত যার থেকে উদ্ভব একমেব সম্বার। বোধ করি কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি হল। সম্বারের প্রধান মশলা ছিল তেঁতুল, স্বাদ এবং গন্ধে যা সম্বারকে চিনিয়ে দেয়। কিন্তু এখন তেঁতুল টমাটোর সঙ্গে সহাবস্থান করতে শিখেছে। আর টমাটো তো এই সেদিনের সবজি।

দাক্ষিণাত্যের নিরামিষ রান্নায় বৈচিত্র্যের অভাব, কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই বলা চলবে না। যে বিশেষ উপকরণগুলি দাক্ষিণাত্যের রান্নায় আদিমকাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি অন্যত্র এত ব্যবহার হয় না। ফলে, দক্ষিণ-ভারতের চারটি রাজ্যের মধ্যে এক কেরালায় মুসলিম ও ক্রিশ্চান প্রাধান্যের জন্য আমিষেরও বেশ চল আছে। ফলে কেরালায় নিরামিষ ভোজ্যের রন্ধনে সামান্য অবহেলা অপ্রত্যাশিত নয়।

গত যুদ্ধান্তের পর দাক্ষিণাত্যের ভোজ্যের উত্তরাপথ অভিযান চলেছে অবিরাম। যে কলকাতায় যুদ্ধের আগে আমরা সম্বার ইডলির নামও শুনিনি, সেই শহরের উত্তরের অন্তঃপুরেও ইডলি-দোসা সর্বদা উপস্থিত। আমরা যাকে বলি জলখাবার, তামিলরা বলে টিফিন, দোসা-ইডলি উপ্‌মা সেই শ্রেণীতে পড়ে। তারাই প্রথম ট্রোজান অশ্বের মতো

কলকাতায় এবং আর্যাবর্তের অন্যান্য শহরে অনুপ্রবেশ করেছিল। এখন অক্ষৌহিনী না হোক, তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ অনেক জমি অধিকার করে নিয়েছে। এমন সময় ছিল যখন দক্ষিণে জলখাবারের সময় ব্যতীত ইডলি-দোসা পাওয়া যেত না। এখনও অনেক নীতিবাগীশ ভোজনশালা দ্বিপ্রহরে বা রাত্রে ওই সব জলখাবার পরিবেশন করেন না। পূর্ণ ভোজনের সময় কি আর ও সব চুটকি জিনিস চলে? এত শাসন সত্ত্বেও যেভাবে দক্ষিণী জলখাবারের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, দক্ষিণী পূর্ণ-ভোজন তার সূচ্যগ্রও জয় করতে পারেনি। কলকাতা শহরে দক্ষিণীদের জন্য কয়েকটি ভোজনশালা আছে। সেখানে বিশুদ্ধ ঘৃত, অবিমিশ্র তেঁতুল এবং এ-দেশি নারকেল দিয়ে প্রস্তুত কয়েকটি পদ ভাতের সঙ্গে আহারের জন্য পাওয়া যাবে। কিন্তু স্থানগুলি বাঙালিদের মনঃপূত হবে না। আমরা তো আবার কিঞ্চিৎ আন্তর্জাতিক চরিত্রের মানুষ। যেখানে দক্ষিণী ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের রসিকদের যাতায়াত আছে, এমন ভোজনশালা সংখ্যায় কম। পরে কোনওদিন তাদের কথা বলা যাবে। আজ উপক্রমণিকা করা যাক এই ঘরানার কৃতী ভাষ্যকার দশপ্রকাশকে নিয়ে। দাক্ষিণাত্যে দশপ্রকাশ অতি পরিচিত নাম, উডল্যান্ডের সমকক্ষ। ইংরেজিতে যাকে বলে রেস্টুর‍্যান্ট চেন—তাই।

দশপ্রকাশ অবশ্য কলকাতাতে নেই। মাঝে উডল্যান্ড এসে ফারপোর বাড়ির দোতলায় ফরাস পেতেছিল। অগৌণে বন্ধ হয়ে গেল। নানা কারণ শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হয় এঁদের ভোজ্যগুলি তেমন হৃদয়গ্রাহী ছিল না, সেটাই প্রধান কারণ। যাই হোক, দশপ্রকাশের জন্য আপনাকে বিন্ধ্যপর্বত উল্লঙ্ঘন করতে হবে না। এখন, বছর দুই হল দিল্লিতে সুজন সিং পার্কের অ্যামবাসাডার হোটেলে দশপ্রকাশ প্রকাণ্ড আসর বসিয়েছে। আমার নাড়া বাঁধবার জন্য মুহূর্তেকও ভাবতে হয়নি।

দিল্লির দশপ্রকাশ অভিজাত ভোজনশালা। আভিজাত্য যাতে সামান্যও মালিন্যের স্পর্শ না পায়, তাই বোধ করি পদগুলি ঈষৎ উচ্চমূল্য। ভোজনকক্ষটি মনোহর। ষটকোণ, বিস্তৃত কক্ষের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম কাজ করা দারুদীপস্তম্ভ। পরিবেশন অযথা বিলম্বিত নয়, পরিচারকেরা অবহিত, মনোযোগী। চেয়ারগুলি আরও একটু আরামদায়ক হলে আমরা আপত্তি করতাম না।

খাদ্যতালিকা দেখবেন খুব দীর্ঘ নয়। তবে ক্ষুদ্রও নয়। দক্ষিণের পদভাণ্ডার বিশাল নয়, তাই এই খাদ্যতালিকায় কিছু বিদেশি পদ দেখা যাবে। তারা শুধু আগন্তুক নয়, অবাঞ্ছিত এবং অপাঙক্তেয়। যেখানে রসম পাওয়া যায় সেখানে কেউ স্বাদ-গন্ধহীন সুপের আদেশ করে? হলই বা বিলাতি। সুপ কদাচ আদেশ করবেন না। যদি দক্ষিণী পূর্ণভোজনের সিংহাবলোকন করতে চান, একটা থালি আদেশ করবেন। এখানেও কিছু অবাঞ্ছিত পদ পাবেন, যেমন লুচি। চাইলে রুটিও দিতে পারে। থালির দাম ২০ টাকা। এক বাটি উত্তপ্ত সম্বার, অর এক বাটি রসম। এঁদের সম্বার শান্তপ্রকৃতির, টমাটোর শাসনে তেঁতুল কোণঠাসা, ঝাল উগ্র নয়। আপনার তড়কা-ডাল খাওয়া অভাস হলেও সম্বার ভাল লাগবে, অড়হর ডালের আদিম, বন্য গন্ধের মধ্যে একটা অজানা মায়া আছে। রসম সন্তর্পণে আস্বাদ করবেন। আকৃতিতে নিরীহ হলেও প্রকৃতিতে কিছুটা বিপরীত। তাছাড়া রসমে গোলমরিচ ব্যবহারের বিধি আছে। বশংবদ পরিচারক ঘন ঘন আপনার পাত্রগুলি

পূর্ণ করে দেবে। সুঘ্রাণ, তপ্ত ভাত আসবে, যা অকৃপণ পরিবেশিত ঘৃতের গন্ধকেও ম্লান করে। একটা কোমল মুচমুচে বড়া পাবেন। একপাত্র ঘোল এবং একপাত্র দই। সবজির দিকটা দক্ষিণী ভোজনশালায় প্রবল নয়। এঁরাও তার ব্যতিক্রম নন। বাঁধাকপি সরষে ফোড়ন সহযোগে কিংবা নারকেল-কুরো আকীর্ণ আলু বা কুমড়োর শুকনো সবজি। একপাত্র দই দিয়ে প্রস্তুত লাউও আপনার অভিনব লাগবে। মিষ্টান্ন থাকবে। এটা এঁদের লাইন নয়। এক মিষ্টান্ন ছাড়া আর সব পদই অনবরত পূর্ণ করে দেওয়া হবে। বলতে ভুলে গেছি, দক্ষিণী চাটনি এবং আচারও প্রভূত পাবেন। এবং আমের আওয়াকাই একেবারে এটম বোমা, কিন্তু তার আকর্ষণ বড়ই প্রবল।

থালি যদি আপনার পছন্দ না হয়, এখানে কাঞ্জিভরম ইডলি পাবেন। তার মানে, যারা শাড়ি তৈরিতে বিখ্যাত তাদের ইডলিও বিশেষ। যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? এই ইডলির ভেতরে দু-এক টুকরো শাক-সবজি থাকে। দু খণ্ড, ৫ টাকা। ভাত পাবেন ছ প্রকারের। বাঙালিরা বকলা ভাত, অর্থাৎ সরষে ফোড়ন দেওয়া দই মাখা সাদা ভাত অত পছন্দ করেন না। তাই বিসিবেলা-পুলিয়ানা নিতে পারেন—সম্বারের মশলায় প্রস্তুত কর্ণাটকি খিচুড়ি, স্বাদে অপূর্ব—৬ টাকা। এখানে পেসরেটও পাওয়া যায়—অন্ধ্রের আস্ত কালো মুগ বেটে তৈরি দোসা। এই পদটি সর্বত্র পাওয়া যায় না। আমি প্রথম পরিচয়ে প্রণয়াসক্ত হয়েছি—৬.৫০ টাকা।

ওঠবার আগে দশপ্রকাশের নিজস্ব আইসক্রিম অবশ্যই গ্রহণ করবেন। ঝাল যদি কিঞ্চিৎ বেশি থাকে, আইসক্রিম আপনাকে শান্ত করবে। তা ছাড়া স্বাদেও অপূর্ব। আমার অনুরাগ, ফিগ এণ্ড হনি। পরিপক্ক ডুমুর, যাকে পশ্চিমপ্রদেশে আঞ্জির বলে, দুগ্ধপাক হয়ে আইসক্রিমের রূপ পেলে যে পদার্থ তৈরি হয় তার তুলনা মেলা ভার। ৭ টাকা। আপনার তো রোজ নিরামিষ খাবার বাধ্যতা নেই। সুতরাং, সানন্দ দশপ্রকাশ থেকে ফিরবেন।

হাউস অফ মিং

মিং রাজবংশের প্রায় তিনশো বছর রাজত্বকালে চিনের সমৃদ্ধি হয়েছিল খুব। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন কোনও ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উন্নতি দেখা যায়নি। তবে কেন যে ভারতবর্ষের দুটি বিশিষ্ট ভোজনশালার নাম মিঙেদের সঙ্গে জড়িত হল, আমার জানা নেই। ভোজনশালাগুলির একটির কথা এই কলমে পূর্বে লিখেছি, পার্ক স্ট্রিটের দি মিং রুম। দ্বিতীয়টির কথা আজ বলি। দিল্লির তাজমহল হোটেলের এই ভোজনশালাটির নাম দি হাউস অফ মিং। এই দুটি ভোজনশালাতেই চিনের শিউ-চুয়ান প্রদেশের রন্ধনশালার খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়। শিউ-চুয়ানের পাক-শৈলী আমার প্রাণের জিনিস। এখানে তেল, লঙ্কা ও মশলার কার্পণ্য নেই। ম্যাণ্ডারিন চিনের রাজসূত্র রান্নার সঙ্গে তেল-লঙ্কার যোগে যে খাদ্য প্রস্তুত হয় স্বাদে তা স্বর্গীয় বললে অত্যুক্তি হবে না।

তাজমহল হোটেল দিল্লিতে হাউস অফ মিঙের প্রতিষ্ঠার আগে মুম্বইতে একটি শিউ-চুয়ান খাদ্যের রেস্টুর‍্যান্ট খুলেছিলেন বছর দশেক হল, দি গোল্ডেন ড্রাগন। হাউস অফ মিঙের অস্তিত্ব অনেক পরে, মাত্র বছর তিনেক আগে। উভয় রেস্টুর‍্যান্টেই মুহূর্তে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের সুখাদ্যের তালিকায় এদের নাম ওপরের সারিতে থাকবে।

হাউস অফ মিং-এ দেড়শো দুশো জন অতিথির বসবার আসন আছে। কিন্তু যখনই যান পূর্বে আসন সংরক্ষণ করে না রাখলে আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশ কিছু লোক অপেক্ষা করেনও। তাতে আর আশ্চর্য কী। ইষ্ট পাওয়ার জন্যে সেকালে মুনি-ঋষিরা কম তপস্যা করতেন? একবার আসন পেলে প্রশস্ত কক্ষটি আপনার অনুমোদন পাবে। হালকা জাফরি কাটা পার্টিশানের আভাস দিয়ে নামমাত্র তিনভাগ করা,

আসলে একটাই হল। বলা বাহুল্য, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। মেঝেতে নীল, হালকা-নীল নকশা করা পুরু কার্পেট। আসনগুলি আরামদায়ক। আশেপাশে কাঠের ছাদ। ছোট ছোট ডোম করা ছাদও বহুলাংশে নীল। সেখান থেকে সারে সারে চিনা লণ্ঠন ঝুলছে। পরিবেশন-দ্রুত। পরিচারকের নজর পাবার জন্য তপস্যার প্রয়োজন নেই।

অগৌণে পুষ্ট খাদ্যতালিকা হাতে আসবে। প্রথম চক্রে নির্বাচন সহজ। কারণ, সুপ মাত্র সাত প্রকারের। দামও সবার সমান, ২৪ টাকা। কবে, এক দশক আগে কেন যে মুম্বইয়ের তাজের গোল্ডেন ড্রাগনে প্রথমেই সাওয়ার ও পেপার সুপ আদেশ করেছিলাম নিজেও জানি না। তারপর অনেকবার গিয়েছি গোল্ডেন ড্রাগনে এবং হাউস অফ মিং-এ। কিন্তু দ্বিতীয় কোনও সুপ আস্বাদনের সুযোগ হয়নি। স্ত্রৈণ মানুষ যেমন সুন্দরীদের সভা থেকেও স্ত্রীর কাছে অনিবার্য ফিরে আসে, আমিও তেমনি অনেক প্রলোভন হেলায় অগ্রাহ্য করে সাওয়ার অ্যান্ড পেপার সুপ উইথ চিকেন অ্যান্ড এগ-এর প্রতি আমার অনুরাগ অটল রেখেছি। অভিজ্ঞতার অভাবে বলতে পারব না, স্ত্রৈণ মানুষ স্ত্রীর কাছে কী পায়, পায় কি তার অনুরাগের উৎস? কিন্তু সাওয়ার অ্যান্ড পেপার সুপ প্রত্যেকবার যেন নব আবিষ্কার, প্রত্যেকবার যেন মাদকতায় নতুন প্রণয়িনী। মস্ত এক চিনা বোল পূর্ণ হয়ে সুপ আসবে। দু জনের জন্য এক মাত্র আদেশ করবেন। তাতেও একটু বেশি হবে। অমৃতের অধিকন্তুতে কিং দোষায়?

বলে রাখা ভাল, শিউ-চুয়ানের গোলমরিচ দেওয়া এই সুপটি বেশ ঝাল। সুপ গরম থাকে বলে ঝাল আরও বেশি মনে হয়। একটু সয়ে গেলে শুধু সুখস্বাদ জিভে লেগে থাকে। এই সুপটি কলকাতায় আর দু জন গুণী প্রস্তুত করেন। তাঁদের কথা অনেক আগে লিখেছিলাম—কুঙ্গা এবং দি মিং রুম রেস্টুর‍্যান্ট। সুপটি পানীয় এবং ভোজ্যের মধ্যপথে। গাঢ় এবং নানাবিধ খাদ্যবস্তু তাতে নিমজ্জিত থাকে, তা ছাড়া ফেটানো ডিমের সূক্ষ্ম কুচি। পান-ভোজনের যুক্ত স্বাদের মধ্যে একটা মোহ আছে, যেমন থাকে বর্ষার সকালে অথবা মেঘ-ভরা বিকালে, যা দেখে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, সকাল হল বিকেল আর বিকেল অন্ধকার। এমন দিনে নাকি বিপুল ডাকে।

কাঁপিল বুক, দুয়ারে দিনু নাড়া। তেমনি পরম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হবে তাজের হাউস অফ মিং-এ সাওয়ার ও পেপার সুপ আস্বাদন করে। যদি কিছু না মনে করেন সংগোপনে একটা কথা বলে রাখি। দি হাউস অফ মিং-এর শিল্পকর্মগুলি স্বাদে, গন্ধে, গুণে খোদ চিনের শিউ-চুয়ানের রান্নার থেকে কোন অংশে ছোট নয়। স্বীকার্য, হাউস অফ মিং-এ চা-পাতায় রোস্ট করা হাঁস পাওযা যায় না, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা প্রতিষ্ঠিত ঘরানার বৈধ সন্তান।

এবারে অন্যান্য পদ আসবার কথা। কী আদেশ করেছিলেন? দু জনে গেলে নির্বাচন করা বড় কঠিন। একপাত্র করে দুটি পদ নিলে সামান্য বেশিই হয়, কিন্তু মাত্র দুটি পদে রসনাকে নিরস্ত্র করা যাবে কী উপায়ে। আমার কয়েকটি প্রিয় পদ আছে এখানে। পরখ করে দেখবেন। আমারও সব পদ পরীক্ষার সুযোগ হয়নি। পারলে, একটু অভিযান করাই তো ভাল। কত আর অন্যের পায়ে-চলা-পথে চলা যায়? শ্রেডেড ল্যাম ইন হট গার্লিক সস অথবা শ্রেডেড বিফ উইথ গ্রিন পেপার সয়া সস। প্রথমোক্তের প্রতি আমার অধিক

অনুরাগ, কিন্তু এই পদটিতে লঙ্কা অতি প্রখর। মেষমাংসের অন্য একটি পদও আমাকে খুব আকৃষ্ট করে, ড্রায়েড ল্যাম ইন চিলি সস। এই পদটিতে মাংসখণ্ডগুলি ভাজা হওয়ার পর সয়া এবং চিলি সসে পাক করা হয়। ঝাল, কিন্তু পরম স্বাদিষ্ঠ। এই তিনটির প্রত্যেকটি পদেরই দাম ৪২ টাকা। শূকর মাংসে আপনার পক্ষপাত হলে, আমার প্রিয় স্পেয়ার রিবস উইথ পেপার সল্ট। মেদশূন্য শূকরের সিনার খণ্ডগুলি মুচমুচে করে ভাজা। তারপর অবিস্মরণীয় কোনও মশলায় আচ্ছন্ন করে নবীন পিঁয়াজের আধভাজা, আধসেদ্ধ টুকরোর সঙ্গে পরিবেশিত হবে। অনির্বচনীয় শব্দটা আর কতবার লিখব?

ভাবছেন, খুব উন্নাসিকতা দেখাচ্ছি, একটাও প্রনের পদের কথা বলছি না কেন? শ্রিম্প বল্‌স উইথ সুইট এন্ড সাওয়ার সস নিতে পারেন, ৫৫ টাকা। চিংড়ি মাছের প্রস্তুত গুটি আস্টেক গোলক সদ্য কটাহ থেকে উঠে আসবে। সস না মেশালেও অনবদ্য। এখানে আর একটি অতি মূল্যবান চিংড়ি মাছের পদ আছে নাম এভং, দাম মনে নেই। খাদ্যতালিকায় পাবেন, প্রণ উইথ শেল কথাটা থাকবে। সেও আরেক অভিজ্ঞতা হবে। আহারের সময় বুঝতে পারিনি, পরে পরিত্যক্ত খোলাগুলি দেখে বিশ্বাস হয় না, আমরাই অতগুলি চিংড়িমাছ ভোজন করেছি।

বলা হয়নি, প্রধানত শিউ-চুয়ান রন্ধনধারার ভোজনশালা হলেও, এখানে অন্যান্য রন্ধন-রীতির ফসল কয়েকটি পাওয়া যায়। ক্যান্টনীয় ধারায় একটি পদ আমার মাঝে মাঝে স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছা হয়। নাম লেমন চিকেন। দাম ৪৮। মুরগির ছোট ছোট খণ্ড, আনারস, টমাটো, সিমলা মরিচ, কোনও রহস্যময় দেবভোগ্য অম্লস্বাদ সসে আশ্লিষ্ট। একটি সবজির পদও একদিন পরখ করেছিলাম। ব্রেজ্‌ড মাশরুম, ব্যাম্বুশুট অ্যান্ড গ্রীনস্‌, ৩৬ টাকা। সুস্বাদ। সম্প্রতি একটি নতুন পদ আবিষ্কার করে মোহিত হয়েছি। বীনকার্ড উইথ মিক্সড ল্যাম চিলি, ৩৮ টাকা। মিহি কিমা ও সিমলা মরিচের ফালি একটু ঘাঁটা সয়াবিনের দই-এ মেশানো। সয়াবিনের ভাজা বা সিদ্ধ খণ্ড দিয়ে প্রস্তুত দু-একটা পদ আগে ভোজন করেছি। কিন্তু এখানে সয়াবিন মশলা এবং অন্যতম খাদ্য উভয় ভূমিকাই মনে রাখবার মতো।

ভাত এবং নুড্‌ল অবশ্যই পাওয়া যায়। এমনিতেই আপনার আর আহারের সাধ্য থাকবে না, পকেটের ওপরও চাপ বাড়ছে, তার ওপর ভাত বা নুড্‌ল বোধহয় এঁদের লাইন নয়। নেহাত মামুলি রান্না, দাম প্রতি পাত্র ৩০ টাকা। আসলে সূর্যের দিকে তাকাবার পর যেমন কিছুক্ষণ আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, কয়েকটা মনোমতো পদ আস্বাদন করবার পর, আর কোনও কিছুই আপনার মনে ধরবে না।

কুচা ঘাসিরামে কচৌড়ি

কম করে সাত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী দিল্লি শহর। মহাভারতের ঐতিহ্য না ধরলে, বলা যায় দিল্লি শহরের পত্তন করেছিলেন তোমর বংশের রাজপুত রাজ অনঙ্গপাল একাদশ শতাব্দীতে। শহরটার রমরমা হল মুঘল আমলে। ১৬৩৮ সালে সিংহাসন আরোহণ করে শাজাহান আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। লালকেল্লা তৈরি হল দশ বছর ধরে। তার দশ বছর পরে ১৬৫৮ সালে সিংহাসনচ্যুত শাজাহান পুত্র ঔরঙ্গজেবের বন্দি আগ্রায়। তাঁর রাজত্বকালে শাজাহান দিল্লিতে অনেক সৌধ, মসজিদ, উদ্যান ইত্যাদি তৈরি করিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত রাস্তা দিল্লির চাঁদনিচকও শাজাহানের তৈরি।

লালকেল্লার পশ্চিম তোরণ লাহোরি গেট থেকে দেখা যায় সোজা পুব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে চাঁদনি চক। একদা চাঁদনি চকের উত্তর দিকে জলা জায়গা ছিল, হ্রদের মতো। আমির-ওমরাদের বিবি-বেগমেরা নৌকায় কেল্লা থেকে চাঁদনি চকে আসতেন বাজার করতে। ১৭৩০ সালে নাদির শা দিল্লি আক্রমণ করে শহরটাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। নাদির শা-র সৈন্যরা রাজার প্ররোচনায় শহরটার শেঠ ও সদাগরদের বাড়িতে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছিল। শোনা যায়, সুনহরি মসজিদের ছাদে বসে নাদির তাঁর সৈন্যদের পৈশাচিক উল্লাসে হত্যালীলা ও লুণ্ঠন দেখে খুব উপভোগ করেছিলেন। চাঁদনি চক মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। নাদির শা কোহিনুর হিরা এবং ময়ূর সিংহাসন নিয়ে পারস্যে ফিরে গিয়েছিলেন।

চাঁদনি চক আবার জেগে উঠেছিল। ১৯১১ সালে যখন ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে, চাঁদনি চকের উত্তরে আজকের সিভিল লাইনসে। তখন

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র চাঁদনি চকের খ্যাতি মধ্যগগনে। লুটিয়েনের তৈরি নতুন দিল্লি তো সেদিনের।

ক্রমে যেমন নতুন দিল্লির জেল্লা বাড়তে থাকল, তেমনই চাঁদনি চকের জৌলুস কমতে থাকল। এখন তো মানুষ, ঠেলাগাড়ি, মোটর, টাঙ্গা, অটোর ভিড়ে চাঁদনি চক প্রায় হারিয়ে গিয়েছে।

কাজে, অকাজে, ছুটিতে অনেকেই দিল্লি যান। দিল্লি হল উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের সিংহদ্বার। ক'জনই বা চাঁদনি চক এলাকার কথা মনে রাখেন। চাঁদনি চক উপেক্ষায় প্রায় বিস্মৃত। আরও হারিয়ে যাচ্ছে চার পাশের বিচিত্র নামের অঞ্চলগুলিও। খারি বাউলি, বাল্লিমারান, পরাঠেওয়ালি গলি, দরিবা—যেখানে সোনারূপার গহনার দোকান। অথবা, ফতেপুরি, যেখানের সোনারূপার পাত তৈরি করার দক্ষ কারিগরদের সমকক্ষ ছিল না সমগ্র ভারতবর্ষে। সদরবাজার এখনও অতিব্যস্ত ব্যবসায়িক অঞ্চল। এখানেই কোথাও সার সার আতরের দোকান ছিল। পাড়াটার নাম মনে নেই, এখনও আছে কি না বলতে পারব না।

আমাদের গন্তব্য পরটাগলি। এক সময় ঘৃতপক্ক আলু কপি মেথি ইত্যাদির পরটার সার সার দোকান ছিল। গিয়ে দেখি পরিচিত দোকানগুলি নেই। সেখানে স্টিলের আলমারি, কাটা কাপড় বিক্রি হচ্ছে। শুনলাম, ভিতর দিকে দু-চার ঘর পরটাঅলা আছে। যেতে ইচ্ছা হল না। বিফল, বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম চাঁদনি চকে। ঘন্টেওয়ালার মিষ্টান্নের দোকানে। ঘন্টেওয়ালার বয়স দুশোর বেশি। ১৭৯০ সালে চাঁদনি চকে দোকানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখনও সগৌরবে চলছে। ঘন্টেওয়ালাও অবশ্য অনেক বদলে গিয়েছে। চাকচিক্য বেড়েছে, নানা সুদৃশ্য মিষ্টান্নের পসরা, নিয়ে যাওয়ার জন্য সুন্দর বাক্স, ইলেকট্রনিক ওজনের যন্ত্র। বিলও কাটা হচ্ছে যন্ত্রে। এতকাল এক জায়গায় আছে, এরা নিশ্চয় সব খবর রাখে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম ভাল কচুরি কোথায় পাওয়া যায়? বিক্রেতাকে একটু ভাবতে হল। বলল, কচৌড়ির দোকান আর বেশি নেই। তার ওপর, ভাল? কুচা ঘাসিরামে যেতে পারেন, এখন সাড়ে আটটা, এই তো কচৌড়ি ভাজার সময়। ভাল লাগবে।

ঘন্টেওয়ালা কচৌড়ি নিবেদন করেন না। এঁদের সৃষ্টি হল সোহন হালুয়া। কোন উপকরণ সহযোগে, কী প্রকরণে এই অভিনব মিষ্টান্ন তৈরি হয় জানি না। আমার সন্দেহ, কোনও অলৌকিক উপায়ে এক কিলো ওজনের এই মিষ্টান্নে দুকিলো ঘৃত লুক্কায়িত থাকে। এই মিষ্টান্নের শুভযোগ শীতকাল। বাতাস জল-বাষ্পহীন না হলে সোহন হালুয়ার সমূহ বিকাশ ঘটে না। তখনই বোঝা যায়, প্রায় পাথরের মতো কঠিন সোহন হালুয়াতে কী অপার স্বাদ সুপ্ত থাকে। এই পদটির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ঘন্টেওয়ালা। খেয়ে দেখবেন, নইলে পস্তাবেন। তার চেয়ে খেয়ে পস্তানোও ভাল। ঘন্টেওয়ালা থেকে খানিকটা পশ্চিমে গিয়ে ডানদিকে কুচা ঘাসিরাম। দোকানটির নাম মনে নেই। হয়তো নাম ছিলই না। কত নম্বর কুচা ঘাসিরাম, তাও বলতে পারব না। কুচা মানে গলি। সেই গলিতে প্রবেশ করে ঈষৎ এগুলেই আর দোকান খোঁজার দরকার হবে না। অনুপম, অনাস্বাদিত কোনও ঘ্রাণের মাদকতা আপনাকে অভ্যর্থনা করবে এবং নির্ভুল সেই দোকানে পৌঁছে

দেবে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওই ঘ্রাণের উৎস হল আসলি ঘৃত এবং কান্দাহারি হিঙের কচুরি রসায়ন।

দোকানের কোনও শোভা নেই। সদ্য ধোওয়া মেঝে তখনও জলে ভেজা। সামনেই খাটো ধুতি পরা অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ হালুইকর মস্ত কটাহে কচুরি ভাজছে। দু পাশে হাফপ্যান্ট পরা দুই বালক পুর সংযুক্ত করে পরিত্রাহি কচুরি বেলছে। নড়বড়ে টেবিল, তেমনই চেয়ার। জন দশেক রসিক ইতিমধ্যে আসরে বসে গিয়েছেন। অত্যল্পকাল পরেই স্টিলের রেকাবে নিটোল পূর্ণবৃত্তাকার দুটি দু খোলে ফোলা কচুরি এল। ছোট একটি বাটিতে গুটিকয় চরিত্রশূন্য আলুর টুকরো ঈষৎ নিষ্প্রাণ ঝোলে সিক্ত। বুঝতে কিঞ্চিৎ সময় লেগেছিল।—যতক্ষণ না কচুরির স্বাদ রসনা ছাড়িয়ে মর্মে পৌঁছেছে। ভাল ছবি হলে, বাহারি ফ্রেমের দরকার হয় না। বলতে কি, ভাল ছবিতে যেমন দামি ফ্রেম লাগানো বারণ, এখানেও তাই। কচুরির মাধুর্য ছাড়িয়ে গেলে চলবে কেন, আলুর তরকারিটা তাই ফিকে, কচুরিকে আরও উজ্জ্বল, বর্ণময় ও স্বাদিষ্ঠ করবার জন্য। বলতে পারি, আয়োজন সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল । রেকাবের এক পাশে অবাঞ্ছিত সামান্য আচার দিয়ে দোকানদার কচুরির আসলে অসম্মান করেছিলেন। এটা কী করে সম্ভব হল, আজও ভেবে পাই না।

প্রথম দুটি কচুরি মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভেতরে ডালের পুরের সঙ্গে স্বাদ তৈরি করতে পারে, বুঝতে পারলাম। তার ওপর কচুরিগুলি তপ্ত পরিবেশিত হচ্ছে—সোজা কড়াই থেকে ভোজনপাত্রে, স্বাদ উদগ্র করতে তার অবদানও কম নয়।

আমাদের অনুরোধ দোকানের মালিক একসঙ্গে দুটির বদলে একটি একটি করে কচুরি দিতে সানন্দে রাজি হলেন। বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, আমরা সমঝদার। প্রথম কচুরিটি আস্বাদন করতে করতে দ্বিতীয়টি যে অল্প ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাতে গানের মাঝখানে স্কেল পরিবর্তনের মতো রসভঙ্গ হয়ে স্বাদের সুর তেমনি সামান্য কেটে যায়। আচার অবেহলায় এককোণে পড়ে থাকল, তরকারিও আর নিতে হল না—তরকারি যেন বশংবদ ক্রীতদাসের মতো, কচুরির নির্ভেজাল স্বাদ আমাদের হৃদয়ে পৌঁছে যেতে থাকল। ক'টা কচুরির পরে নিরস্ত হয়েছিলাম মনে নেই। কচুরিতে কি সামান্য কালোজিরার ছিটা ছিল? মনে নেই। মাত্র দু জন যন্ত্রী যে এমন সিম্ফনি বাজাতে পারেন, (কারণ, শুনেছি ময়দা ঠিকমতো মাখা এবং ঠিকমতো বেলা-ও স্বাদ সৃষ্টি করে) সেদিন সকালে কুচা ঘাসিরামে তার অভিজ্ঞতা হল।

এই ঘটনা তিন চার বছর আগেকার। দোকানটি এখনও আছে কি না জানি না। তবু, একবার না গেলে পস্তাবেন। তার চেয়ে না পেয়ে পস্তানো ভাল।

ঢুকছে, আর বেরুচ্ছে না

নতুন বিদেশি রাষ্ট্রদূতের দিল্লি পৌঁছবার পর যেমন অন্যতম কর্তব্য রাজঘাটে মাল্যদান, তেমনি দিল্লিতে আগত অন্যপ্রান্তের রসিকদের একটা আবশ্যিক কাজ ছিল, প্রথম সুযোগে মোতিমহলে যাওয়া। মোতিমহল তাজমহলের কেউ নয়; দিল্লির এবং সম্ভবত স্বাধীন ভারতবর্ষের আদি তন্দুরি রেস্টুর‍্যান্ট। মোতিমহলের মতো এমন রসিকজন-অভিনন্দিত রেস্টুর‍্যান্ট ভারতবর্ষে কয়েকটি মাত্র আছে। একটির কথা আমার এখনও মনে আসছে। বাঙ্গালোরের এম টি আর, অর্থাৎ মাবল্লী টিফিন রুম। আসলে বাঙ্গালোর ঠিক দিল্লির মতো আমাদের ব্যবসায়ের তীর্থ নয়, বাৎসরিক পরিযাণের পথেও পড়ে না। তাই এম টি আর এর নাম অনেকের কাছেই নতুন ঠেকতে পারে। কিন্তু ভোজনশালার সুনাম উদ্ভিন্ন-যৌবনের মতো, গুণীজনের নজর এড়ায় না।

মোতিমহলের একটা প্রাথমিক সুবিধা ছিল। তার সৃষ্টি প্রায় উদ্ভাবনের পর্যয়ে পড়ে যা অদীক্ষিতের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তার নতুনত্ব আমাদের অচিরে মোহিত করেছিল। এম টি আর-এর কুশলতা অন্য শ্রেণীর। যে বস্তুর সঙ্গে আমাদের বহুদিনের পরিচয়, তাকে যে এমন স্বাদে গন্ধে স্পর্শে অভাবনীয় করা যায়, এম টি আর-এ গিয়ে নিজে আস্বাদন না করলে বিশ্বাস করা কঠিন। বছর দশেক আগে এম টি আর-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম প্রেমের মতো রোমাঞ্চকর, অথচ হিন্দু বিবাহের মতো জীবন-ব্যাপী। সেই রোমাঞ্চ আর কাটতে চায় না। বাঙ্গালোরে গেলে এম টি আর-এ একবার না যাওয়া পর্যন্ত কেমন অস্থিরতায় ভুগি।

পরে জেনেছি আমার মতো আরও অনেক অতিথি বাঙ্গালোরে প্রথম কর্তব্যের তালিকায় এম টি আর লিখে রাখেন। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয়, সবাই। এখানে

খাদ্য-তালিকা সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া আপনি যদি মনে মনে ঠিক করে রাখেন যে আজ আপনি ইডলি সম্বার দিয়ে প্রাতরাশ করবেন, আপনি নিরাশ হতে পারেন কারণ, ঐ সংক্ষিপ্ত তালিকার সব পদও সব দিন প্রস্তুত করা হয় না। আপনি ইডলি সম্বার চাইলেই তো হবে না। সেদিন পাওয়া যাবে হয়তো ইডলি ও চাটনি। আবার যেদিন সম্বার থাকবে, চাটনি নাও থাকতে পারে।

ভোজনশালা খোলার সময় বিধিবদ্ধ। সকালে সাতটা থেকে এগারটা, বিকাল তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা বা আটটা দ্বিপ্রহরের বা রাত্রের ভোজন এখানে সম্ভব নয়। নামেই প্রকাশ, এটা টিফিন রুম, টিফিনের জন্য। বাঙ্গালোর শহরের কেন্দ্রে বিখ্যাত লালবাগ উদ্যানের খুব কাছেই এম টি আর। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ছিল। বয়সের সঙ্গে তার খ্যাতিও সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শোনা যায়, এমার্জেন্সির সময় কিছুকাল এম টি আর বন্ধ ছিল। তখন সব জিনিসের দাম বেঁধে দেবার ঘটা চলেছে। বাঙ্গালোর শহরে ইডলি আর দোসার যে দাম বেঁধে দেওয়া হল, এম টি আর-এর মালিকেরা বললেন, ওই দামে বিশুদ্ধ উপকরণে প্রস্তুত স্বাস্থ্যকর ভোজ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। তাঁরা খাবারের মান নামিয়ে দামের উপযুক্ত করতে নারাজ। যতদিন না বিশুদ্ধ খাবার তৈরি করবার মতো দাম নির্ধারিত হচ্ছে, তাঁরা ভোজনশালা বন্ধ রাখবেন।

বস্তুত, এই ভোজনশালার অহংকারের বিষয় হল, তাঁদের উপকরণ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের, সেখানে কোনও ফাঁকি নেই, কোনও আপস নেই। রসিকজনেরা অবশ্য বলেন যে উপকরণ বিশুদ্ধ হলেই যদি আহার্য সুস্বাদ হত, তাহলে শিল্পীর কী প্রয়োজন ছিল। একদা গ্রামে দুধ, ঘি, চাল, গুড় ভেজাল ছাড়াই পাওয়া যেত। বলা ঠিক হবে কি গ্রামের ভোজ্য স্বাদের সপ্তম-স্বর্গে পৌঁছেছিল? শরিকেরা বিশুদ্ধ শিল্পে বিশ্বাসী, উপকরণ তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পায় না।

শহরের কেন্দ্র হলেও এম টি আর-এ যাওয়া সহজ নয়। যে কোনও ট্যাক্সি বা স্কুটার আপনাকে সটান এম টি আর-এ পৌঁছে দেবে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারপর? আমার নিজের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদা প্রাতরাশের সময় এম টি আর-এ পৌঁছে দেখি দোকানের দরজা বন্ধ। সামনে গুটিকয় মানুষ কীসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় বাস স্ট্যান্ড। ফিরেই আসছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হল। সেখান থেকে একজনের ইঙ্গিতে তিনজন মানুষ ভিতরে চলে গেলেন। দ্বার আবার রুদ্ধ হল। উপস্থিত ব্যক্তিরা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আসন যেমন যেমন খালি হবে, অতিথিদের ভিতরে ডাকার আহ্বান আসবে। আমার আহ্বান আসবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রত্যেকবারেই হয়।

ভিতরে প্রবেশ করে একটি অপরিসর ঘরে বসতে হল। জায়গাটি যে শুধু অপেক্ষা করবার জন্য, ভোজনের জন্য নয়—সেই কথা বড় বড় অক্ষরে সামনেই লেখা আছে। দোতলা, স্বতন্ত্র বাড়ি। ওপরে, নীচে মিলিয়ে শতাধিক আসন দুটি প্রশস্ত ঘরে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ওপর থেকে ডাক এল। পরিচ্ছন্ন আলোকিত ঘর। ঝকঝকে টেবিল চেয়ার। খাবার আসতেও অনেক্ত সময় লেগেছিল। যখন এল, তখন মর্মে মর্মে অনুভব করলাম, কীসের জন্য এই অপেক্ষা।

এদের লোভনীয় পদ রাওয়া দোসা, অর্থাৎ সুজির দোসা। চাটনি সহযোগে। যদি চাটনির দিন হয়, ইডলি আদেশ করবেন না। সম্বার সহযোগে না হলে ইডলির যেন উত্তরণ হয় না। অন্য দোসাও পাওয়া যাবে। কিন্তু পেপার দোসা নামে যে পাতলা মুচমুচে দোসা আজকাল চল হয়েছে, তা এঁদের কাছে ব্রাত্য। এখানে দোসা একটু স্ফীত, ঘৃতের সুগন্ধে ভরা। তাও যথেষ্ট নয়। মনে করে একটু ক্ষুদ্র স্টিলের বাটিতে বিশুদ্ধ ঘৃত খানিকটা পরিবেশিত হয়, দোসার ওপর ঢেলে সুগন্ধকে আরও মোহময় করবার জন্য। উপমাও পাবেন—প্রচুর বাদাম-শোভিত। মশলাও বেশি এবং সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের।

বাদাম দিয়ে এঁরা একটি মিষ্টান্নও তৈরি করেন, তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। দক্ষিণ ভারতে মিষ্টান্ন হয় না, এই পদটি তার মূর্তিমান প্রতিবাদ। স্বাদে গন্ধে এই অপরূপ পদার্থটি মুহূর্তে আপনাকে এম টি আর-এর গুণমুগ্ধ করবে।

ওঠবার আগে, এঁদের দুটি ক্ষুদ্র মুদ্রিত পুস্তিকা চাইতে ভুলবেন না। একটিতে এঁদের যাবতীয় আহার্যের উপকরণের ও গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্যটি অতিথিদের জন্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ। জোরে কথা বলবেন না, টেবিলে পা তুলে বসা ভদ্রজনোচিত নয়, গেলাসে হাত ডোবান গর্হিত ইত্যাদি।

টিপস দেওয়া বারণ। এমন সুস্বাদু অভিজ্ঞতার পর কাউকে ধন্যবাদ জানাতে না পেরে একটু অস্বস্তি হবে। বেরুবার মুখে কাউকে বলে আসবেন, তারও উপায় নেই। কারণ, আপনাকে বেরুতে হবে পিছনের দরজা দিয়ে। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন প্রবেশ দ্বার, বা ভোজনকক্ষ থেকে কেউ বেরুচ্ছে না, অথচ আসন খালি হচ্ছিল কী করে।

বুখারায়

দিল্লির মহার্ঘ পাঁচতারা হোটেল তালিকার শীর্ষে স্থান মৌর্য হোটেলের। শহরের কেন্দ্র থেকে একটু বাইরে, এয়ারপোর্ট যাবার পথে। প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে তার বিশাল অট্টালিকা বৌদ্ধ স্তূপের আমলে তৈরি। ভেতরে কয়েকটি মূল্যবান এবং মনোহর ভোজনশালা। পাঁচতারার উত্তরণ করতে হলে হোটেলে চারটি বা পাঁচটি ভোজনশালা হল মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। তার মধ্যে একটির নাম বুখারা। সোবিয়েত রাশিয়ার উজবেক রাজ্যের শহরের নামাঙ্কিত। কেন, ঠিক বলতে পারব না। মোটামুটি জানি, তন্দুরে রান্নার উদ্ভব এবং প্রচলন মধ্য এশিয়ায়। বুখারা নগরই তন্দুরের জন্মস্থান কি না খবর পাইনি। মৌর্যের বুখারায় গেলে আপনার বিশ্বাস হবে সেটিই বুঝি তন্দুরি রন্ধনশিল্পের জন্মক্ষেত্র। বস্তুত, সারা ভারতবর্ষে বুখারার সমকক্ষ তন্দুরি রান্না অল্পই আছে। গোনাবার জন্য আঙুলের দরকার হয় না।

ভোজনশালাটির অন্তসজ্জাও বিশেষ। মেঝেতে গালিচা নেই। দেওয়াল পাথরের, নানা আকারের অমসৃণ পাথর, যার কোনও জ্যামিতিক সামঞ্জস্য নেই। দু-এক জায়গায় মূল্যবান গালিচা ঝোলানো আছে। কাঠের ছাদ। টেবিল ভারী কাঠের কাণ্ড কুঁদে তৈরি। চেয়ারও তাই, যেন কেউ একটা কাঠের গুড়ির একাংশ বসিয়ে দিয়েছে। শুষ্ক পর্বত-সংকুল সীমান্তের চেহারাটা ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিচারকের পরিধানে কাবুলি শিলাওয়ার ও আজানুলম্বিত কামিজ এবং মখমলের ফতুয়া। কক্ষটি আপনার সুখের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। পিছনের দেওয়ালটি বিশাল স্বচ্ছ কাচের। সেই কাচের ওপারে মাথায় বিলিতি কায়দায় ফানুসের মতো টুপি পরে পাচকদল। খাদ্য আপনার সামনেই প্রকাণ্ড তন্দুরে প্রস্তুত হচ্ছে, শুধু শব্দ ও গন্ধ আপনাকে সহ্য করতে হচ্ছে না,

কাচের আড়ালের জন্য।

কাঠের গুঁড়ির ওপর বসতে আপনার অস্বস্তি হবে, যদিও মধ্যবর্তী একফালি গদি থাকবে। খাবার একবার এসে পৌঁছলে আর আপনার অন্য দিকে মন থাকবে না। তবে যাবার আগে ব্যবস্থা করে যাওয়া প্রয়োজন, নইলে স্থান পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পরিবেশন মোটামুটি দ্রুত। আসন পাবার পর সামান্যই সময় নষ্ট হবে। বলে রাখা ভাল হোটেলের মর্যাদার সঙ্গে এক কদমে পা ফেলার আগ্রহেই, এখানে খাদ্যাদির বেশি দাম উৎসাহ দমিয়ে দেয়। তবুও, প্রথমেই আপনাকে এক পাত্র শিক-কবাব আদেশ করতে হবে। উত্তর কিমা করা ছাগমাংস, দধি-সুরভিত, শূলপক্ক। কিন্তু মাখনের মতো কোমল। পুদিনা, এলাচ, মাংস, দধি ও ধোঁয়ার মিশ্র গন্ধ শিক-কবাবের স্বাদ প্রখর করে। অনেকটা কাকোরি কবাবের ধরন। পাথরের মতো থালার খাবার আসবে। পানীয় জলের গেলাসটি তামার। এখানে শুধু তন্দুরে প্রস্তুত আহার্যই পাওয়া যায়। সুতরাং রসাদার কোনও কিছু আশা করবেন না। এক ডাল ছাড়া। পঞ্জাবি কালিদাল যাকে বলে তাই। মাপে অনেকখানি, দামেও তাই, ১৫ টাকা। একটা তন্দুরি রোটি বা নানও নিতে হয়। সেও পাঁচ টাকা। কবাব আপনার নিশ্চয় অমৃতময় মনে হয়েছে, একটা হরা চাটনি সহযোগে— আমার যেমন প্রতিবারই মনে হয়। তা হলে এবার কবাবের দাম বলি, ২৮ টাকা। অনেকে কস্তুরী কবাব পছন্দ করেন। সেই পদটি মুরগির শিক-কবাব। সুস্বাদু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় মেষ বা ছাগ মাংসের শূলপক্ক সুগন্ধ কস্তুরী কবাবে অনুপস্থিত। কস্তুরী কবাব চার খণ্ডে এক পাত্র ৩৪ টাকা। এঁদের পুদিনা পরটা আমার অতি আদরের জিনিস। নান বা রোটি না নিয়ে একটা পুদিনা পরটা নিতে পারেন। অতি উত্তম খাদ্য। পরটায় পুদিনার সুগন্ধ যে তাকে এত মোহময় করতে পারে, না আস্বাদ করলে বিশ্বাস হবে না। মুচমুচে করে ভাজা হলে, মাংস ছাড়াও খেতে ভাল লাগবে। ৮ টাকা।

বুখারাতে আর একটি আমার পরম প্রিয় পদ আছে। বরা কবাব, ২৮ টাকা। আট খণ্ড, মাংস, সুগন্ধি জারক রসে কোমল হয়ে তন্দুরে সিদ্ধ না জ্বালানো, কী বলব? এখানের বরা কবাবের সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র দিল্লির করিমের বরা কবাবের। আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু ওই টুলের মতো বৃক্ষ কাণ্ডের ওপর বসে, পাথরের থালায় শুকনো পুদিনা পরোটার সঙ্গে বরা কবাব খাওয়ার মধ্যে একটা আদিম আনন্দ আছে। আপনার ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যাবে, কাবুলে আছেন, না পেশোয়ারে, নাকি বুখারা, কি কান্দাহারে। যাঁরা অস্থি থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খাওয়া নেহাত আরণ্য রীতি মনে করেন, তাঁরা বরা কবাবের পরিমার্জিত সংস্করণ পেশোয়ারি কবাব আদেশ করতে পারেন। রন্ধন-পদ্ধতি এক, শুধু মাংস খণ্ডগুলি অস্থিশূন্য। আপনাকে অভুক্তের মতো আচরণ করতে হবে না। তবে মনে রাখবেন, হাত দিয়েই খেতে হবে। কারণ, বুখারাতে ছুরি কাঁটা প্রভৃতি পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি ব্যবহার নেই। পেশোয়ারি কবাব আট খণ্ডের এক পাত্রের দাম ৩১ টাকা। বড় পরিবার নিয়ে যদি কেউ গিয়ে থাকেন সেদিন, হয়তো আলাদা আলাদা প্রত্যেকের জন্য নান বা রুটি না নিয়ে একটা নান বুখারা আদেশ করেছেন। দৃশ্যটা আপনার বড় ভাল লাগবে। এক মিটার দীর্ঘ একটি নান। পরিবারের সবাই যে যার

সামনের অংশ ছিঁড়ে আহার করছেন। দাম যদিও ৩০ টাকা। কিন্তু অনেকে একসঙ্গে গেলে সাশ্রয় হয়।

বুখারায় পদের সংখ্যা বেশি নয়। একটা কাঠের টুকরোর দু-পিঠে লেখা। আমি অন্যান্য পদ বেশি আস্বাদ করিনি। করবার দরকারও নেই। যে ক'টির নাম বলেছি তারাই কাগজের ভাষায় পরম সন্তোষজনক। মিষ্টান্নের তিনটি পদ আছে মাত্র। তার মধ্যে শকোরি রাবড়ি এবং গুলাবজামুন আস্বাদ করবার আমার কোনওদিন আগ্রহ হয়নি। পেস্তা কুলফি এ জন্য ভোজন করেছিলাম। বৃহৎ আকারের কুলফি, পেস্তায় রঙিন এবং সুরভিত। অপার সুস্বাদু ছিল, কিন্তু দাম দেখে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম, ১৯ টাকা। বার বার মনে হতে লাগল, এখান থেকে বেরিয়ে পাঁচকুঁইয়া রোডের আনারকলিতে তিন বা চার টাকায় কুলফি কিছুমাত্র কম আনন্দ দিত না। আকারে একটু ছোট হয়তো, কিন্তু স্বাদে নয়।

আসলে,আমি অনেক বিবেচনা করে দেখেছি এই সব ভাল ভাল মূল্যবান ভোজনশালায় কারও অতিথি হয়ে গেলে সব থেকে আনন্দের হয়। খাদ্যতালিকায় দাম পড়ে চমকাতে হয় না। নির্বিঘ্নে সুখাদ্যের আস্বাদন সম্পন্ন হয়। মনে মনে সুখের রেশ বইতে থাকে। পারলে, তাই করবেন।

সাইপ্রাস

পৃথিবীর মানচিত্রে সাইপ্রাস নগণ্য স্থান নিয়েছে। খাদ্য-রসিকদের তালিকাতেও তার কোনও বিশেষ স্থান আছে জানতাম না। দিল্লির পাঁচতারা অশোক হোটেল ট্যাভার্না সাইপ্রাস নাম দিয়ে সাইপ্রাসের ভোজ্যদ্রব্যের যে ভোজনশালাটি খুলেছেন তারও উৎপত্তি জানা নেই। কিন্তু সরাইখানার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাভার্না সাইপ্রাস রসিকজনের সমাদর পেয়েছে। বলা অবশ্য কঠিন, তার কতখানি ভোজ্যের উৎকর্ষের জন্য, অভিনবত্বের জন্য।

ট্যাভার্না সাইপ্রাস বা সংক্ষেপে সাইপ্রাস সত্যিই অভিনব ভোজনশালা। পাঁচতারা বিলাস-বহুল হোটেলে এই ভোজনশালার জন্য টালির চালের আবহ তৈরি করতে হয়েছে। তৈরি করেছেন ধুরন্ধর শিল্পী হুসেন। মেডিটারনিয়নের সূর্যস্নাত দ্বীপগুলির মধ্যে সাইপ্রাস অন্যতম। ইওরোপের গ্রিসের ৭৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। পূর্বদিকে সিরিয়া থেকে ৬০ কিলোমিটার, উত্তরে টাকি ৬৫। ক্ষুদ্র দ্বীপটি বন্ধুর, অল্প পরিসর দেশের মাঝখান দিয়ে দুটি পর্বতমালা। হুসেন সেই রুক্ষ আবহাওয়া আনবার চেষ্টা করেছেন। মোটা কাঠের পালিশ-ছাড়া আসবাব, লণ্ঠন ধরনের আলো। আবহ সম্পূর্ণ করবার জন্য কালো পোশাক-পরা একজন গীটার-বাদকও থাকেন।

সাইপ্রাসের খাদ্য তালিকা দীর্ঘ। তালিকা থেকে অপরিচিত পদ নির্বাচন করাও মুশকিল। সহজ কাজ হল মেজডেজ আদেশ করা। মেজডেজ অর্থাৎ মহাভোজ। বিশ পঁচিশটি পদ পরখ করবার সুযোগ পাবেন। তার মধ্যে কয়েকটি মনে রাখবার মতো। কিন্তু প্রথমে একপাত্র শেরি পান করা সঙ্গত হবে। সাইপ্রাসবাসীরা বলেন তাঁদের দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত শেরিতে পাহাড়ে জায়গায় জাত বলে একটু কষায় ভাব থাকে। এই শেরির

বিশেষত্ব সেই কথায় স্বাদের আভাস।

সাইপ্রাসের মহাভোজ চার ভাগে ভাগ করা। সতর্ক থাকবেন, কোনও পদ স্বাদু হলেও বেশি আহার করবেন না। শেষে, অন্য অনেক পদ অনাস্বাদিত থেকে যাবে। ফরাসিতে যাকে বলে অরদভ্র্, সেই শ্রেণীর খাদ্য প্রথম ভাগে। তখনও আপনি শেরির পাত্র নিঃশেষ করেননি, আলাপচারী তখনও মন্থর, ক্ষুধার অনুভবও নেই, সেই সময়ের জন্য এই ভাগের আয়োজন, ওরেলিকিয়ের। ছোট ছোট পাত্রে সর্বসমেত আটটি পদ আসবে। আপনি কোনটির প্রতি দাক্ষিণ্য করবেন, কারও সঙ্গে শুধু পরিচয় স্বীকার করবেন, কেউ অবহেলিত থাকবে, ঘনিষ্ঠতা কারও সঙ্গে হবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। যাঁরা সার্ডিল মৎস্য পছন্দ করেন, তাঁরা অবশ্য প্রথমে সার্ডিলের স্বাদ নেবেন। আমার পক্ষপাতের বিষয় হল তালাত্তোরি। দই, শশা এবং রসুনের এক আশ্চর্য সমন্বয়। কোটোপুলুস পাবেন— চিকেন স্যালাড, পরিচিত। অপরিচিতা, পরচিত্তহারিণী পদ হল রিজি স্যালাড এবং মিলিটিওয়ানো। প্রথমোক্ত, ভাতের স্যালাড, সঙ্গে হ্যাম এবং সিমলামরিচ। দ্বিতীয়টির তুলনা হয় না, ছানা এবং বেগুনের মিশ্রণে সে পদটি প্রস্তুত হয়, দুজনকে আলাদা করে অনুভব করা যায়, আবার দুয়ে মিলে এক হয়ে অন্য আর এক স্বাদ। আরও দু-এক প্রকার স্যালাড সাজিয়ে দিয়েছে দেখবেন। তাদের দিকে নজর না দেওয়াই ভাল। আপনাকে আরও সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন, যে বড় পাঁউরুটির খণ্ডটি আপনাকে দিয়ে গেছে পরিচারক, তাকে শতহস্তেন পরিত্যাগ করুন। ক্ষুধা-হন্তারক এই পরম জাগতিক পদার্থটি আপনাকে বহু রস-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

এবারে দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব বা ভোজনের প্রধান পদগুলির জন্য প্রস্তুতি। দ্বিতীয় পর্বের নাম জিমারিকা। এই পর্বে পরিচিত পদ ছিল টমাটোর খোলে কিমা। আর ম্যাকারোনি, যদিও বুড়ো সজনেডাঁটার মতো পুষ্ট। সুখকর ছিল মাংস এবং ভাতের গোলক। নাম মনে নেই কিন্তু অভিনবত্বে যেমন, স্বাদেও কম ছিল না। যে পদটি এই পর্বে আপনাকে সম্মোহিত করবে, তার নাম কুপেপিয়া। আবার কিমা, পাতলা বাঁধাকফির পাতায় জড়ানো। নিশির ডাকের মতো অম্লের স্বাদ। সঙ্গী আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এই দেবভোগ্য পদটি নাকি আরও হৃদয়-হরণ হয় বাঁধাকফির পাতা নয়, সাইপ্রাসের আঙুরের পাতায় মুড়ে রন্ধন করলে। বিকল্প কখনও আসলের সমান হতে পারে না, তবু আমি কুপেপিয়াতে আবার মগ্ন হলাম।

এতক্ষণে সাইপ্রাসের মদিরা এসে গেছে। গুণীজনেরা সাইপ্রাসের ড্রাই-হোয়াইট ওয়াইন পছন্দ করেন, হিমশীতল হওয়া চাই। মুহূর্তে শরীর-মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। আলাপচারী গুঞ্জনের স্তরের ওপরে উঠেছে, টেবিলে টেবিলে ক্ষণে ক্ষণে হাসির মঞ্জীর বাজছে। গীটার বাদককে আর মনে পড়ছে না। তৃতীয় পর্ব ক্রিয়েটা। আপনার নির্বাচনের জন্য আট পদের তালিকা। তার মধ্যে সঙ্গীর সাহায্যে চারটি পদ নির্বাচন করলাম। অত সন্তর্পণে আহার করেও কেমন স্থানাভাব মনে হচ্ছিল, কিন্তু ক্লেফটিকো আস্বাদন-মাত্র তাকে সাদর আহ্বান করলাম। সুনির্বাচিত ছাগ অথবা মেষমাংসের খণ্ড রাঙতায় মুড়ে অল্প আঁচে প্রস্তুত। পদটিতে এক অপরূপ সুরভি পাওয়া যায়। স্বাদের কথা বর্ণনা ছিল পোর্ক স্টু। তারাও আপনার মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু তিলোত্তমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর

কোন নগণ্যা আপনার নজরে ধরবে। আমারও তাই হয়েছিল, নইলে পোর্ক-স্টু নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণীর ছিল।

এতক্ষণে কলরব স্তিমিত হয়ে এসেছে। তৃপ্তির শান্তির মধ্যে আবার গিটার শোনা যাচ্ছে। এবারে শেষ এবং চতুর্থ পর্ব গ্লাইকা, অর্থাৎ মিষ্টান্ন। তিন প্রকার মিষ্টান্নের স্বাদ নিয়েছিলাম, তিনটিই শিল্পকর্ম। ডাকটিলা, সরু জিভে গজার ধরন, বাদামের সামান্য পুর, দারচিনির সুগন্ধ, রসযুক্ত। পুরেকিয়াও একই ধরনের, শুধু বাদামের পুরের স্থানে ছানার পুর। ঈষৎ মুচমুচে এই দুটি পদই মনোহারী। শেষ মিষ্টান্নের পদটি চিত্তচমৎকার। নাম, আনেরি মা মেলি। অনুভব করলাম ছানা দিয়ে প্রস্তুত আর দারচিনির সুগন্ধের আচ্ছাদন।

যদিও লিকিওর না সেবন করেন, কফির সময় হল। কিপ্রিয়াকস বা সাইপ্রাসের বিশেষ কফি প্রেমের মতো প্রগাঢ় অথচ ঈর্ষাপরা রমণীর মতো তিক্ত। প্রথম স্বাদে মনে হয়েছিল বুঝি আমাকে বিষপ্রয়োগ করা হচ্ছে। পরে মনে হল দাম না দেওয়া পর্যন্ত এমন দুঃসাহস কেউ করবে না। অল্প অল্প চুমুকে, সমস্ত মুখাভ্যন্তরে প্রসার করে দিয়ে সেই কফির মাহাত্ম্য অনুভব করেছিলাম।

কত দাম দিয়েছিলাম জিজ্ঞাসা করবেন না। শুধু শুধু টাকার কথা তুলে এমন একটা সুখকর অভিজ্ঞতা তিক্ত না করাই সমীচীন হবে।
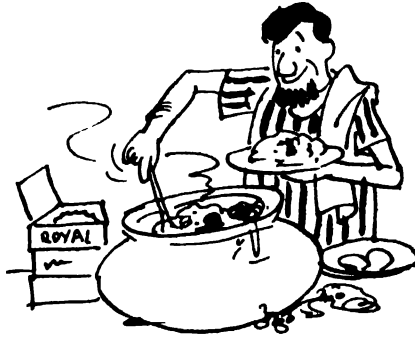
নবাবি কবাব

সত্তর বছর আগে হাজী করিমুদ্দিন সাহেব তাঁর দস্তরখান বিছিয়েছিলেন লালকেল্লার অদূরে দিল্লির বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের ছায়ায়। শোনা যায়, তৎক্ষণেই রসিকজনেরা তাঁর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। নিজের নামেই ভোজনশালার নামকরণ করেছিলেন: করিম। সেই ভোজনশালা বিশ বছর আগে যখন প্রথম দেখি তখন দোকানের কোনও শোভা ছিল না। সাইনবোর্ডও অনুপস্থিত। রূপে ভোলাবার মানুষ নন হাজী করিমুদ্দিনের বংশ, হাত দিয়ে দ্বার খোলানোও তাঁদের প্রথা নয়। খাবারের গুণ, তার সৌরভ রাত কি রানির মাদকতার মতো বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। গিয়ে দেখি ঘিঞ্জি রাস্তার ওপর, প্রবল কোলাহলের মধ্যে, অপরিসর একটি ভোজনকক্ষে আহারের আয়োজন। নাম শোনা ছিল বলেই বসেছিলাম। না হলে তদ্দণ্ডেই উঠে আসতাম। পরের অভিজ্ঞতা অক্ষয় হয়ে স্মৃতি ও রসনাকে রোমাঞ্চিত রেখেছে। প্রচুর জনসমাগম ছিল যদিও, স্থানটি স্পষ্টত অর্জুনদের জন্য।

হয়তো বা যুধিষ্ঠিরদের কথা ভেবেই করিমুদ্দিন বংশের চতুর্থ পুরুষ এই সেদিন, পাঁচশত বছর আগে বাদশাহি দিল্লির বাইরে হঠাৎ-নবাব দক্ষিণ দিল্লির ইস্ট নাজিমুদ্দিনে শাহি দস্তরখান প্রসারিত করেছেন। অর্থাৎ পূর্ব নিজামুদ্দিনে এঁদের প্রথম শাখা খোলা হল। আধুনিক ভোজনশালা, কোনও কিছুর অভাব নেই। এয়ার কন্ডিশানিং, মেঝেতে কার্পেট, উর্দিপরা বেয়ারা। প্রথমে একটি তলায় ছিল। এখন নীচের আর একতলা নেওয়া হয়েছে। তবু ডিনারের সময় টেবিল পেতে দেরি হতে পারে। পাড়াটা কিন্তু জুম্মা মসজিদ অঞ্চলের কথা মনে করিয়ে দেবে। ভিড়, অগোছাল দোকানপাট। অলস, বেকার লোকের জটলা। একটু অস্বস্তিই হয়, বিশেষ করে রাত্রি বেশি হলে।

প্রথম খোলবার পর ভোজন-কক্ষের চার দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা থাকত, নিয়ামৎ কদা অর্থাৎ দুর্লভ খাদ্যের আবাস। লেখাগুলো এখন নেই। বোধ করি মালিকেরা বুঝতে পেরেছেন, তাদের খাবারের জন্য চালিয়াৎ দক্ষিণ দিল্লিতেও বিজ্ঞাপনের দরকার হবে না। তবে কথাগুলো সত্যি। এদের খাবার যে দুর্লভ তাতে সন্দেহ নেই। করিমের রন্ধন প্রণালী নাকি স্বয়ং শাজাহানের রান্নাশাল থেকে পাওয়া গিয়েছিল। শাজাহান শৌখিন বাদশাহ ছিলেন। আহারাদির শখ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মোঘলাই রান্নার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, করিম দাবি করেন সেই ঐতিহ্যের সবটাই তাঁদের উত্তরাধিকার। শাজাহানী রন্ধন প্রণালীর মূল উপকরণ ছিল, মেষ বা ছাগ মাংস, দই এবং বিশুদ্ধ ঘৃত। শেষোক্ত বস্তুটি এখন পাওয়া যায় কি না, পাওয়া গেলেও প্রযুক্ত হয় কি না, অনুসন্ধানের ব্যাপার। কিন্তু প্রথমটির জন্য করিম বিখ্যাত। অর্থাৎ ছাগ-মাংসের পদগুলি এখানে বিশেষ।

কিছু দিন পূর্বেও আহার্যের দাম এখানে কম ছিল। ফলে তুষ্টি একেবারে তুঙ্গে উঠত। তিন-চারজন গেলে, মাথা পিছু সাত-আট টাকার মধ্যে ভরপেট স্মৃতিসুখকর ভোজন হত। এখন মুদ্রাস্ফীতির অত্যাচারে, যতই কেননা বলি এটা বিশ্বজনীন ঘটনা, করিমেও দাম বেশ বেড়েছে। তবে এখনও সহ্যাতিরিক্ত নয়। আরও সুখের কথা, খাবার মাপে হ্রাস পায়নি, স্বাদও অবিনশ্বর আছে।

জুম্মা মসজিদের করিমে দাম এখনও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আপনি যদি আরামে সুখস্বাদ আরও প্রখর করতে চান, চলুন পূর্ব নিজামুদ্দিনের করিমে। প্রথমেই আদেশ করতে পারেন শিক-কবাব। চার খণ্ড, আট টাকা। সেদিনও পাঁচ টাকা ছিল। আক্ষেপ করে কী হবে? বরং সুস্বাদে নিবিষ্ট হন। এই কবাবের জুড়ি পেয়েছিলাম মিরাটের নওচন্ডি মেলায়। সেই গুণীর কথা আর একদিন লিখব। অমৃতোপম এই কবাব ঝাল-ঝাল পুদিনার চাটনি সহযোগে আপনাকে অপার আনন্দ দেবে। এর পর ইস্টু খাবার কথা। অন্তত আমি বরাবর তাই আদেশ করেছি। বছর খানেক করিমে না খাবার পর একবার গিয়ে দেখি ভোজন তালিকায় ইস্টু নেই। আমার মনে হল পৃথিবী কি সত্যিই রসাতলে গেল। বিলিতি স্টুর কেবল নামটিই ধার করে দধি ও লঙ্কা সহযোগে মাংসের যে সৃষ্টি এরা পরিবেশন করেন তা এক কথায় অতুলনীয়। সেই পদার্থ বাদ গেছে ভোজ্যতালিকা থেকে। কোন দিন শুনব রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ লেখা হয়েছে। একটু খোঁজ-খবর করতে জানা গেল, করিমুদ্দিনের আধুনিক বংশধরেরা পদগুলির নামের চটক বাড়াতে চান, তাই সব নামই একটু মাজাঘষা করা হয়েছে। ইস্টুর বর্তমান নাম হয়েছে দিলবাহার দোপিয়াজা। চার-পাঁচখণ্ড মাংস রক্তিম ঝোলে আবৃত। এই পদটি করিমের বিশেষ। আর কোথাও এমন সুস্বাদু হালকা মাংসের ঝোল পরিবেশিত হয় না। দশ টাকা দাম ছিল, এখন হয়েছে চোদ্দ টাকা। খান দুই করে রুমালি রুটি নিলে দু জনের খাওয়া পূর্ণ হবে ওই দুটি পদে। যদি আরও কিছু আহারের ইচ্ছা থাকে, দু পাত্র ক্ষীর বেনজির নিতে পারেন—তিন টাকা করে।

যদি দ্বিতীয়বার করিমে যান, না গিয়ে পারবেন না, শিক-কবাবের বদলে তন্দুরি বরা আদেশ করতে পারেন। ছ-সাতখণ্ড রসাল ছাগমাংস দধিতে জারিত হয়ে তন্দুরে সুপক্ক।

দই এবং তন্দুরের মিশ্র সুগন্ধ এবং কোমল মাংসের স্পর্শ উভয়ে মিলে আপনার রসনাকে পরম তৃপ্তির স্বাদ দেবে। আমার ধারণা, ভারতবর্ষে আর কোথাও বরা এত মোহনীয় হয় না। এখানে স্যালাড চাইবেন না, আলাদা তিনটাকা দাম নেয়। চাটনি অবশ্যই পাবেন, বরার অনুপান। দ্বিতীয় পদ আবার সেই দিলবাহার দোপিয়াজা। একটা আক্ষেপ থেকে যাবে, একসঙ্গে তিনটি পদ খাবার ক্ষমতা কেন থাকে না। যদি চার-পাঁচজনে যান তা হলে ওই তিনটি পদ ছাড়া আরও একটি যোগ করতে পারেন। চিকেন বিরিয়ানি—সতেরো টাকা। একটা রায়তাও নিতে পারেন, ৩ টাকা। আমি বহু প্রণয়ে বিশ্বাসী নই। বহু দিন ধরে করিমের আতিথ্য পাবার পরও আমার অনুরাগ ওই তিনটি পদে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

শেষ পদ একটা শাহি টুকরা নিতে পারেন। একপাত্র দুজনের জন্য যথেষ্ট। ৫ টাকা ফেরার পথে আবার সেই জনাকীর্ণ গলি, ঈষৎ নোংরাও । কিন্তু কিছুই আপনার নজরে পড়বে না। কারণ আপনি তখন সদ্য অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে মগ্ন।

পুরনো জওহর

অনেক বছর পর সেদিন দিল্লির জওহর রেস্টুর‍্যান্টে যাবার সুযোগ হল। ইদানীং দিল্লি গেলে নতুন দিল্লির দক্ষিণ উপান্তে থাকি, পুরনো দিল্লির কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, তাই জওহর, কি মোতিমহল, বা খাইবারে আর যাওয়া হয় না। একদা দিল্লি দরওয়াজার উত্তরের এই ভোজনশালা তিনটি আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। সেই জাদুর জাল কাটিয়ে মাঝে মাঝে শুধু পরটা গলিতে যাওয়া হত। সে আর এক অন্য জগৎ। দিল্লি সাত সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষী। আমি কেমন করে আশা করেছিলাম যে আমার প্রিয় ভোজনশালাগুলি অক্ষয় হয়ে থাকবে? তবে আজকাল নতুন ফ্যাশনের আগ্রাসনের সবটাই পড়ে দক্ষিণ দিল্লিতে, দিল্লির অধুনা-সমৃদ্ধ অঞ্চলে। চাঁদনি চৌক এখনও ফ্যাশনের প্রবাহ অগ্রাহ্য করে লালকেল্লার দিকে তেমনি তাকিয়ে আছে। জামা মসজিদ অঞ্চলেও তেমনি, বিচিত্র প্রাণচঞ্চল, সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনচর্যায় বর্ণময়। সেদিনও গিয়ে তাই দেখলাম। নিয়ন আলোর জেল্লা আরও বেড়েছে সন্দেহ নেই, সাইন বোর্ডও অনেক নতুন এবং সদ্য রং করা। কিছু নতুন বাড়িও পুরনো বাড়ির কবরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

জওহর রেস্টুর‍্যান্ট জামা মসজিদের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বিপরীতের গলিতে। প্রায় গলির মুখেই বলা চলে। অত রাত্রে গিয়েও দেখি লোকে লোকারণ্য। সাইকেল রিকশার ঘন্টি, স্কুটারের হর্ন, ফিরিওলার চিৎকার, পথচারীর উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তা, ডালার ওপর সাজান মিষ্টান্ন, ফল, পিঁয়াজ, রসুনের গন্ধ—সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য, বর্ণময়, সুরভিত কলতান। আমি অর্জুন শ্রেণীর মানুষ। ধুলোর, আবর্জনার, দারিদ্র্যের গন্ধ সহজে আমার নাসিকা স্পর্শ করে না।* মোড় ঘুরেই পরিচিত ভোজনশালা দেখতে পেলাম।

আসলে ভোজনশালাটি দুই অংশে। আগে নিউ জওহর, তারপরে, জওহর রেস্টুর্যান্ট। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বে প্রথমে জওহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারপর, সেও ত্রিশ বছর হবে, স্থানাভাব হওয়াতে পাশের বাড়িতে নিউ জওহরের পত্তন হয়। নিউ জওহরে তুলনায় জায়গা বেশি ছিল। কাজেই অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক, টেবিলগুলি গায়ে গায়ে নয়, আলোও বেশি। আমি বরাবরই নিউ জওহরের ভক্ত। জওহরে দু-চারজন গ্রাহক দেখি, নিশ্চয় খুব পুরাতন হবেন, দোকানের মতোই প্রাচীন, ম্রিয়মান চেহারা, নতুন কেউ ঢুকলে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন, যেন অনধিকার প্রবেশের নিঃশব্দ অভিযোগ করছেন। নিউ জওহরে অনেক স্বস্তি পাই। আজ পর্যন্ত কখনও অপেক্ষা করতে হয়নি। পৌঁছলেই আসন পাওয়া যায়।

আজও পেলাম। পাথরের টেবিল, কাঠের চেয়ার। পরিবর্তনের মধ্যে দেখলাম গোটা কয় ফ্যামিলি কেবিন হয়েছে। আমরা তারই একটার আতিথ্য নিয়েছিলাম। পরিচারক পৌঁছতে আমার পরম প্রিয় পদ চুজা মশালা আদেশ করতে যাচ্ছিলাম, তার পূর্বেই সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন আজ কী পাওয়া যাবে। আশ্চর্য, পরিচারক তৎক্ষণাৎ একটা খাদ্যতালিকা পেশ করল। গোটা কুড়ি পদ। সভয় লক্ষ্য করলাম চুজার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তবে কি জওহরও মুম্বইয়ের জর্জের মতো আধুনিকতার কাছে দাসখত লিখিয়েছে? বড় ধাক্কা খেলাম। প্রশ্ন করতে পরিচারক বলল, ওই চিকেনই সেই চুজা। সে কথা আমি জানি। ফারসি থেকে আহৃত শব্দটির অর্থ মুরগিশাবক। বাচ্চা মুরগি। উর্দু ও পঞ্জাবি ভাষাতে এই শব্দের ব্যবহার। চিকেন মশালা মানে চুজা মশালা—একটু কষ্টকল্পিত হল। কারণ চুজা মুরগির বয়স বলে দেয়। অন্যপক্ষে, সাধারণ অর্থে, সব বয়সের কুক্কুটই মুরগি। তাছাড়া, যদি ধরেও নেওয়া যায় পরিচিত চুজা মশালার এখন নাম হয়েছে চিকেন মশালা, সেই একই পদ নাম বদলে স্বাদে কখনও ঠিক থাকতে পারে? চাচার দোকানে যদি চিকেন কাটলেটের নাম ফাউল কাটলেট না হত, তাহলে অমন স্বর্গীয় স্বাদ হতে পারত?

পরিচারকের ভরসায় বিশ্বাস করে এক প্লেট চিকেন মশালা এবং এক প্লেট চিকেন ইস্টু আদেশ করলাম। দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। এক প্লেট মানে একটি অখন্ড মুরগি শাবক। এখানে এটাই পরিবেশনের ধারা। এখন দিন-কাল ভাল নয়, তাই দেখলাম হাফ প্লেটেরও ব্যবস্থা রয়েছে—অর্ধেক বাচ্চা মুরগি। হাফ প্লেট চুজা ইস্টুর দাম ১২ টাকা। হাফ প্লেট চুজা মশালা ১১ টাকা। সঙ্গে তন্দুরি অথবা রুমালি রোটি, একেবারে তাওয়া থেকে, অতি তপ্ত, ৫০ পয়সা।

ইস্টু আর মশালা রঙে, রসে দুই ভিন্ন জগতের। ইস্টুতে ধূসর রঙের হাল্‌কা ঝোলে একটি অখণ্ড ক্ষুদ্র মুরগি। মশালার মধ্যে দেখা যাচ্ছে গুটিকয় গোলমরিচ। স্বাদেও গোলমরিচের সামান্য স্পর্শ পাওয়া যাবে। এছাড়া মশলার মিশ্র সৌরভে আলাদা করে বলা মুশকিল আদা না পিঁয়াজ না রসুন, কীসের প্রাধান্য। অলঙ্কারের ভাষায় বলা যায় পদটি কেমন নম্র, নত বা কোমল। তবে কোমল বটে মুরগির বাচ্চা, অঙ্গুলিস্পর্শেই ক্ষীণ অস্থিগুলি থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে।

অলঙ্কারের ভাষায় বলতে গেলে চুজা মশালা যেন যৌবনোদ্ধতা সুন্দরী। কী তার রঙ

আর কী তার স্বাদ। গাঢ় রক্তগোলাপের বর্ণ আর সেই ঝোলে ঈষৎ হাল্‌কা লাল রঙের দীর্ঘ কতিপয় ভাজা লঙ্কা। ওপরের অংশে ঘি বা তেল বা চর্বির পাতলা ওড়না। এখানেও কটি গোলমরিচ পাওয়া যাবে। মশালা স্বাদে একটু প্রখর, কিন্তু মশলার আধিক্য নেই। পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা। আমার মনে হয়েছিল চুজা মশালা একেবারে অপরিবর্তিত আছে, সেই প্রথম পরিচয়ে যেমন পেয়েছিলাম। চুজা ইস্টু স্মৃতির সেই তুঙ্গে পৌঁছে দিতে পারল না। আমার আরোহণের অক্ষমতা কিনা কে বলবে।

ফোলা ফোলা ছোট বৃত্তাকার আটার নান (অথবা ময়দা এবং আটা মেশান) সহযোগে আমার ইস্টু গ্রহণ করতে ভাল লাগে। কেমন যেন দুটি পদে চরিত্রের মিল আছে। আর, মশালার সঙ্গে তন্দুরি রোটি, নরম নয়, একটু বা কুড়মুড়ে। উভয়ের সঙ্গেই দই মেশান পিঁয়াজের সালাদ গ্রহণ করবেন। এই সুস্বাদ সালাদ এক বা দেড় টাকা দাম, না চাইলেও পাবেন, ইস্টু এবং মশালার সঙ্গে ভাল ঐকতান করে। কাঁচা পিঁয়াজ নিতে পারেন। ইস্টুর সঙ্গে জমবে না। মশালার সঙ্গে উপাদেয়।

কলম্বাস, শুনেছি, আমেরিকা আবিষ্কার করে নিরস্ত হননি। তিনি নাকি আবার বারবার নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলেন। যাঁরা কলম্বাসের বংশধর, চুজার রূপ রস গন্ধময় নতুন জগৎ আবিষ্কার করার পরও যাঁদের আবিষ্কারের নেশা কাটে না, তাঁরা একদিন মটন রোগন যোশ নিতে পারেন। সুনির্বাচিত কটি সুপুষ্ট মাংসখন্ড জলহীন, উপাদেয় ঝোলে। রোগন যোশ নাকি সাজাহানের প্রবর্তন, যার রন্ধনরীতিতে জলের বদলে দধির বিধান। এখানে রোগন যোসে সিমলা মরিচের অস্পষ্ট রুচিকর সুগন্ধ পাবেন। অনুপান তন্দুরি রোটি ও কাঁচা পিঁয়াজ। একপাত্র রোগন যোশ ১২ টাকা। আপনার রুচি মনোমতো না হলে মটন বিরিয়ানি নিতে পারেন, ১০ টাকা।

শুনেছি এখানে ফিরনি উত্তম প্রস্তুত হয়। আর এঁদের বিশেষত্ব নাকি এগ হালুয়া। আমি পরীক্ষা করিনি। করবার ইচ্ছাও নেই। চুজা আবিষ্কারের মোক্ষ লাভের পর আর তুচ্ছ জাগতিক পদার্থে কোনও আসক্তি থাকে না। বড়জোর একটা পান চলতে পারে, দরিয়াগঞ্জের প্রিন্স পান হাউসের কলকাত্তা মিঠা। সে পানের কথা আর একদিন বলব।
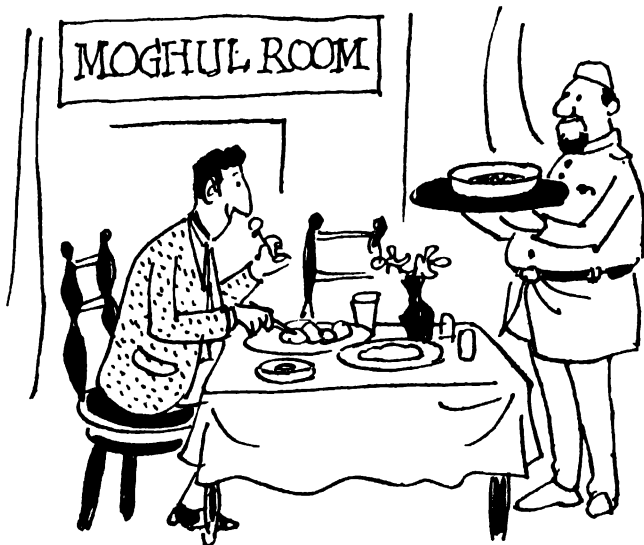
কাশ্মীরি সম্রাট

এশিয়াডের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে দিল্লির রূপসজ্জার জন্য হাজার দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। সেই ব্যয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যাবে নতুন স্টেডিয়ামগুলিতে, শহরের অনেকগুলি উড়াল পুলে এবং দশ বারোটি নতুন হোটেলে। হোটেলগুলির মধ্যে অনেকগুলি পাঁচতারা শ্রেণীর। তারা এখনও এশিয়াডের পাঁচ মাস পরেও, সম্পূর্ণ হয়নি। যে সব হোটেলে চার পাঁচটি ভোজনশালা থাকার কথা, তার মধ্যে এখন মাত্র একটি দুটি অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়েছে। এমনি এক পাঁচতারা হোটেলের নাম সম্রাট হোটেল। অশোক হোটেলের সংলগ্ন ভূমির ওপর প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সেখানে শ্বেত মর্মরের ঘটা অতিথির বিস্ময় উৎপাদন করে। সেই হোটেলে দুটি ভোজনশালা এখন অতিথিদের আপ্যায়ন করছে। একটির নাম বারাদরি, অর্থাৎ বারদুয়ারি। সাধারণের সরাইখানাকে বারাদরি বলা হয়।

বারাদরি কিন্তু সাধারণ যাত্রীর জন্য নয়। ভোজনশালাটি মহার্ঘ্য। সম্রাট হোটেলের মর্মরমণ্ডিত বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষ পার হয়ে, একসারি মর্মর সোপান-শ্রেণী অবতরণ করে নীচের মহলে বারাদরিতে পৌঁছতে হয়। ভোজনশালা নতুন, সবাই এখনও তার খবর রাখে না। তার ওপর এতগুলি নতুন হোটেলে এতগুলি নতুন ভোজনশালার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে যে দিল্লির মনোরম শীতের বসন্তেও লোক সমাগম বেশি নেই। অতিথি বেশি নয় বলেই ভোজনশালাটির সাজসজ্জা আরও দীপ্ত মনে হয়। গৃহতলে লাল, পুরু গালিচা, লাল কাপড় চড়ানো নরম চেয়ার, প্রশস্ত কক্ষ। দেওয়ালগুলি অকলঙ্ক সাদা, বারো দরজার বদলে বারোটি মুঘল শৈলীর খিলান, কৃশ স্তম্ভগুলিও মুঘল স্থাপত্য মনে করিয়ে দেয়। খিলানের নিম্নাংশ উজ্জ্বল সোনালি রং করা। ছাদে টুকরো টুকরো আরশি

লাগানো। সেখান থেকে সুদৃশ্য আলোকোজ্জ্বল ঝাড় প্রলম্বিত। ভারী শান্ত, মনোহারী পরিবেশ। পরিচারকগুলিও নম্র এবং তৎপর।

বারাদরি ভারতীয় ভোজ্যের জন্য। আজকাল ভারতীয় ভোজ্য শুনলে একটু দ্বিধা হয়। ভারতীয় ভোজ্য যদি মিষ্টান্নের শ্রেণীর হয়, তা হলে পাওয়া যাবে অক্ষম বাংলা মিষ্টি। জলখাবার হলে, দক্ষিণী দোসা, ইডলি। আর মধ্যাহ্ন বা রাত্রের ভোজন হলে ভাঙা পঞ্জাবি, সব সোশালিস্ট রান্না, যার সর্বত্র পিঁয়াজ এবং টমাটো, যেখানে সব পদের এক স্বাদ। খাদ্যতালিকা দীর্ঘ। দেখলাম নানাবিধ পদের প্রলোভন আছে, সব পদ অসহায় পঞ্জাবি রান্না না হতেও পারে। বাংলা চিংড়ির মালাইকারীও ছিল। নিঃসন্দেহে, পঞ্জাবি, সাম্যবাদের পিঁয়াজ টমাটোর আক্রমণ মুক্ত হত। খাদ্য তালিকা পর্যবেক্ষণ করে দেখি কাশ্মীরি ভোজ্যের একটা পরিচ্ছেদ আছে। আমি সাগ্রহে সেদিকে মন দিলাম।

কাশ্মীরি ভোজ্যের প্রতি আমার একটা সহজ আকর্ষণ আছে। প্রলোভনও বলতে দ্বিধা নেই। কাশ্মীরি রন্ধনধারা সর্বাংশে পঞ্জাবি প্রভাব-মুক্ত। সে ধারায় পিঁয়াজ টমাটোর স্থান মঞ্চে মৃত সৈনিকের মতো। প্রথমে আদেশ করেছিলাম কবাব নজাকত, সোজা বাংলায় শিক কবাব। সে কবাব অল কৌসবের বা করিমের নবনী কোমল কবাবের মতো নয়। নরম, কিন্তু কবাবের উপকরণ যে মাংস সেটা জিহ্বা এবং দাঁত স্পষ্ট অনুভব করে। রুমালি রোটি না পাওয়ায় খেদ একটু থাকল, কিন্তু নরম রুমালির বিপরীত মেরুর উত্তম সেঁকা কড়কড়ে তন্দুরি রোটি বেশ আনন্দ দিয়েছিল। চারখণ্ড পুষ্ট, দীর্ঘ কবাবের দাম ২০ টাকা।

কাশ্মীরি রন্ধনের অভিজাত সদস্য তবক মাজ। সিনার মাংস মুচমুচে করে ভাজা। কোন জারকে সিঞ্চিত হয়ে মাংস এত নরম হয় যে সামান্য প্রলেপযুক্ত হয়ে ভাজলেই মুহূর্তে খাবার যোগ্য, জানি না। কিন্তু এখানে তবক মাজ একটু নিরাশ করল। সম্ভবত যে মেষটি তার মাংস দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করছিল, তার শৈশব অতিক্রান্ত ছিল। সিনার মাংস স্নেহপদার্থশূন্য হলে অধিক স্বাদিষ্ঠ হয়। সেদিন মাংসে মেদের আধিক্য ছিল বলে তেমন রসনালোভন হয়নি।

অতঃপর আদেশ করেছিলাম গোস্ত ইয়াখনি। সুনির্বাচিত ক'টি মাংসখণ্ড নির্মল শ্বেতাভ ঝোলে নিমজ্জিত। শুনেছি ইয়াখনি বড় শুদ্ধ পদ, পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নেই, মূল উপকরণ দই। উপকরণ যাই হোক ইয়াখনি ভোজন সুখের তুঙ্গে পৌঁছে দিল। হয়তো জাফরানের আভাস ছিল, এবং মাখন গালানোর সময় যেমন সুগন্ধ পাওয়া যায় তার রেশ। কিন্তু তখন অত খুঁটিনাটি ভাবার সময় ছিল না, ইচ্ছাও নয়। একপাত্রের দাম ২০ টাকা।

আর কিছু আস্বাদনের সামর্থ্য ছিল না। তাই গুস্তবা আর পরীক্ষা করা হল না। গুস্তবা চর্মচক্ষে কিমার গোলক। কিমাকে নাকি সারাদিন থুড়ে অথবা পিটিয়ে অত্যন্ত মিহি করে পেষা হয়। তারপর অভাবনীয় ঝোলে ডুবিয়ে উপস্থিত করা হয়। সেই ঝোলও দুধ বা দই দিয়ে তৈরি হয়। দিল্লিতে গুস্তবার প্রধান এবং উত্তম শিল্পী ওবেরয় হোটেল। ওবেরয়ের ভারতীয় ভোজনশালা মোঘল রুমে কাশ্মীরি থালি পাওয়া যায়। থালি অর্থে, ছ'রকমের মাংসের পদ, সাদা ভাত, সবজি বলতে, আপনার ভাগ্য ভাল হলে হাক শাক। ছয় পদের মধ্যে দিন সুপ্রসন্ন থাকলে গুস্তবা পেয়ে যাবেন। না হলে রিস্তা পাবেন। সেও

মাংসের গোলক। কিন্তু তার স্বাদ অন্য। ঝোল সাদা নয়, লালচে। মূল একই পদার্থ, কুশলী শিল্পীর হাতে এমন বিচিত্র মনোহর রূপে প্রকাশিত হয়, আস্বাদ না নিলে অনুভব করা অসম্ভব। আর, হাক শাক। এ নাকি কাশ্মীরের বিশেষ কোনও শাকের পাতা। পালং এর ধরনের, কিন্তু স্বাদে শুধু ভিন্ন নয়, অনন্য। ভাজা লাল লঙ্কার প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝ, অস্পষ্ট, সরষে তেলের গন্ধ, সামান্য শাককেও অপরূপের রাজ্যে পৌঁছে দেয়। হাক সব দিন পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে গেলে অবশ্যই হাকের সঙ্গে পরিচয় করবেন।

দিল্লিতে আর একটি ভোজনশালায় কাশ্মীরি খাদ্য পাওয়া যায়, রণজিৎ হোটেলের সন্তুর ভোজনশালাতে। অসুবিধা, সেখানে মুঘল রুমের মতো এক থালায় বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না। পদগুলির অর্ডার পৃথকভাবে দিতে হয়। একাসনে অনেক কিছুর স্বাদ নেওয়া হয় না। সন্তুরও আপনাকে আনন্দ দেবে। বিশেষ করে সন্তুরের গৃহসজ্জা ভারী অভিনব। মনে হবে ডাল লেকে কোনও হাউসবোটের ওপর বসে আছেন। পালিশ না করে আখরোট কাঠের কাজ সর্বত্র, দেওয়ালে, আসবাবে। বড় পরিচ্ছন্ন স্থান। মনে হবে যেন এই মাত্র আপনার জন্য তৈরি হয়ে সবে দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সম্রাটে শেষে কুলফি আদেশ করেছিলাম। আমারই ভুল হয়েছিল। কুলফি এঁদের লাইন নয়। ওই আট টাকাতেই এক পাত্র শাহি টুকরা নবাবি পাওয়া যেত। ঘন ক্ষীরে অশ্লিষ্ট হয়ে ঘৃত পক্ক পাঁউরুটির খণ্ড আপনাকে অন্য জগতে পৌঁছে দেবে। দেবার কথাই, নইলে কী আর সম্রাটের খাবার উপযুক্ত হত।
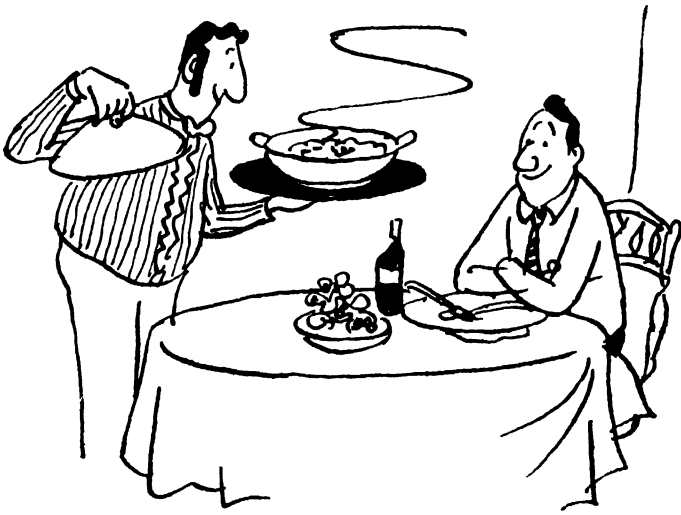
বোম্বাই জর্জ

অনেক বছর ধরে আমার যাতায়াত মুম্বাই শহরে,—সেই সময় থেকে, যখন মুম্বাই শহরে ভাল রেস্টুর‍্যান্টের সংখ্যা কলকাতার থেকে অনেক কম, যখন মুম্বই রাত আটটাতে স্তব্ধ হয়ে যায়, চৌপাটি নটার আগেই জনশূন্য— তখনও জর্জ রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকত। আমরা অবশ্য সাধারণত দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য জর্জে যেতাম। আমাদের আদেশে কোনও পরিবর্তন হত না, মটন শোর্বা উইথ ড্রেস এবং চিকেন বিরিয়ানি। মাঝে কিছুদিন জর্জে যাওয়া হয়নি। তারপর, বছরখানেক আগে একবার গিয়ে যথারীতি আমার আদেশ ঘোষণা করলাম। মটন শোর্বা উইথ ড্রেস এবং চিকেন বিরিয়ানি। পরিচারক আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, যেন আমি কোনও অজানা ভাষায় কথা বলেছি। আমি ভারী বিরক্ত হলাম। এ কোথাকার নবীন বেয়ারা, যে জর্জের অতি সুখ্যাত সৃষ্টির নাম বুঝতে পারে না, যে সৃষ্টির জন্য জর্জের নাম রসিকমাত্রেই জানেন। টেবিলে কাচের নীচে চার চেয়ারের মুখোমুখি চারটে মুদ্রিত বিশাল মেনু থাকে। সেখানে শোর্বা দেখিয়ে দিতে গিয়ে এবার আমিই অবাক। শোর্বা নেই। শুনেছি রাম ছাড়াও নাকি রামায়ণ হতে পারে। শ্রীলঙ্কার রামকাহিনীতে নাকি রামের ভূমিকা পার্শ্বচরিত্রের। জর্জেও কি তাই হয়েছে, শোর্বা চলে গিয়েছে উইংসের অন্তরালে? বেয়ারা ইতিমধ্যে অন্য নানাবিধ উপদেশ দিয়ে আমার বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করছে। শোর্বা বলে কিছু নেই, আপনি বোধহয় কোর্মা চাইছেন। অথবা সাল্লিকে শোর্বা বলছেন না তো আপনি? সাল্লি মানে সরু করে কাটা আলুভাজা। কী করে সেদিন ধরণী দ্বিধা হবার আগে উদ্ধার পেয়েছিলাম, কেমন করে শেষ পর্যন্ত শোর্বা পাওয়া গিয়েছিল, সে কাহিনী এখানের জন্য নয়। জানতে পেরেছিলাম, জর্জের আকর্ষণ একটু বাড়ানো

দরকার হয়েছিল। প্রতিযোগিতা প্রবল। তাই প্রাথমিক প্রসাধন হিসাবে, কিছু পদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। শোর্বা এখন আব গোস্ত।

মুম্বইয়ের ব্যস্ততম অঞ্চল অ্যাপোলো স্ট্রিটের ওপর, স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে,' স্টেট ব্যাঙ্কের বিপরীতে জর্জ রেস্টুর‍্যান্ট ও স্টোরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯১২ সালে,—সত্তর বছর আগে। ইরানি দোকান। এককালে ইরানি দোকান মুম্বইয়ের চরিত্র-লক্ষণ ছিল। আমেরিকায় যেমন ছিল ড্রাগ স্টোর, একই দোকানে টুকিটাকি দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী পাওয়া যায়, আবার একপাশে ভোজনের জায়গা আছে। খাদ্য-তালিকা ছোট। তবে চটপট আহার্যের পরিবেশন হয়। বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত মুম্বইয়ের বড় রাস্তার মোড়ে ইরানি রেস্টুর‍্যান্টের অব্যর্থ অবস্থান ছিল। দু-একজনের ভোজ্যের খ্যাতিও হয়েছিল, যেমন জর্জ বা পার্কস। এখন ইরানি দোকান ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে, সে জায়গায় নতুন শৌখীন রেস্টুর‍্যান্ট বা মূল্যবান দোকান বসছে। জর্জের স্টোর অংশ ছোট হয়ে গিয়েছে, সামান্য জিনিসই পাওয়া যায়, সাবান বিস্কুট ইত্যাদি। জর্জ দোতলা। নীচের তলায় সংকুচিত স্টোর ও পঞ্চাশ ষাটজন অতিথির বসবার ব্যবস্থা। ওপরের তলায় নব্বইজন বসতে পারেন। এ ছাড়া কয়েকটি পর্দা-ঢাকা 'ফ্যামিলি রুম' আছে।

সম্প্রতি দেখেছি, জর্জের খাদ্যতালিকায় কিছু ইরানি পদের যোগ হয়েছে। এমনিতেই তালিকাটি বেশ বড়, শতাধিক পদ আছে। আপনার ইরানি পদ খাবার দরকার কী এখানে, যদি আপনি কপার চিমনিতে গিয়ে থাকেন? কপার চিমনির মতো চেলো কবাব, খোদ ইরানেও হয় কি না আমার জানা নেই। আমি অবশ্য মাঝে একবার জর্জে ইরানি একটি পদ আস্বাদ করেছি। আহারের ব্যাপারে মাঝে মাঝে এই রকম অন্ধকারে অভিযান করা দরকার হয়। এ লাইনের গুণীরা সবাই নীরবে সাধনা করেন, প্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ, না হলে কোথায় কোন ওস্তাদ নতুন রাগিণী রচনা করেছেন জানবেন কী করে? তাই অভিযানের প্রয়োজন। আমিও তেমনি অজানা পদ ইরানিয়ান চেলো গোস্ত আদেশ করেছিলাম। চেলো কবাবের ধরনের, মাংসখণ্ডগুলি অন্য প্রণালীতে প্রস্তুত মনে হল। খুব আনন্দ পেলাম না। কপার চিমনির অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো আনন্দ পেতাম। এখন স্মৃতি বড় যন্ত্রণা দিতে লাগল।

টেবিলে কাচের নীচে খাদ্যতালিকা থাকায় আপনাকে পরিচারকের সুনজরের অপেক্ষা করতে হয় না। এখানে পরিবেশনও বেশ দ্রুত। আপনার খাদ্যতালিকা পড়বার প্রয়োজন নেই। প্রথমে আদেশ করুন মটন আব গোস্ত। ৫.৫০ টাকা। একটি বড় চিনামাটির বাটি-ভরতি স্বচ্ছ ঝোলে একটি বড় মাংসখণ্ড, একটি আলু এবং একটি বা দুটি বড় পিঁয়াজ। প্রথম দর্শনে আপনি একটু বিচলিত হবেন, কারণ আপনি ভাবতেই পারছেন না ওই হালকা হলুদ রঙের ঝোলে কোনও সুস্বাদ থাকতে পারে। মুখে দিলেই রসনা আনন্দের লহরী বইয়ে দেবে—যেমন মাঝে মাঝে হঠাৎ নিরাভরণ, প্রসাধনহীন সুন্দরীকে দেখে চিত্ত ভরে ওঠে। আবের মাংসখণ্ড অতি সুসিদ্ধ। কেন জানি না, গুটি কয় বড় বড় ছোলাও আবে থাকে। তারা সবজি না, মশলা—সে রহস্য আজও ভেদ করিনি। করবার সময় কোথায়? রসিয়ে রসিয়ে আবের ঝোল খেতে খেতে আপনার মন এতই একাগ্র থাকবে যে অন্য কোনও কথা মনে পড়বে না। আর খাবার জন্য এক প্লেট পাঁউরুটি নিতে

পারেন। তবে এরপর তো আসছে আপনার চিকেন বিরিয়ানি—হাফ প্লেট সাড়ে পাঁচ টাকা। এক মাঝারি আকারের কুক্কুটখণ্ড এক প্লেট ঈষৎ পীতাভ ভাতে নিমজ্জিত। জর্জে বিরিয়ানিতে জাফরানের অতিরিক্ত আর একটা সুগন্ধ পাবেন। চালগুলি সুসিদ্ধ, কিন্তু প্রত্যেকটি পৃথক। সৌরভ ছাড়া, স্বাদেও অপূর্ব। পরে অবশ্য আবিষ্কার করেছি মটন বিরিয়ানি যত সুখস্বাদ হয় চিকেন বিরিয়ানি তেমন হয় না। মুরগি ভাতে নিমজ্জিত হয়েও কেমন নির্লিপ্ত প্রতিবেশীর মতো থাকে, ভাতের স্বাদে তার কোনও প্রভাব পড়ে না। অপর পক্ষে, মটন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশীর মতো, দিয়েছি যত পেয়েছি তার বেশি। অর্থাৎ ভাত ও মাংস উভয়েই পরস্পরের সান্নিধ্যে আরও সুস্বাদ হয়। জর্জের নতুন সংযোজন মোঘলাই মাটন খিচড়া, লোকমুখে শুনেছি, বেশ ভাল। আমার আস্বাদনের সুযোগ হয়নি, এখনও। দাম ৫.৫০ টাকা। কখনও যদি আরও কিছু ভোজনের অভিলাষ হয়, চিকেন চপ ফ্রায়েড উইথ ঘি—৬.৭০ টাকা খেয়ে দেখবেন। সম্মোহিত হবেন না অবশ্য, কিন্তু পদটি আপনার মনোমতো হবে। মটনের যেমন জাফরান, মুরগির সঙ্গে ঘৃতের একটা প্রাণের যোগ আছে। ঘৃতপক্ক মুরগির কাটলেট কলকাতার মতো আশা করবেন না। মাংস থোড়া নয়, কোনও ভেজালও নেই।

শেষ পদ মিষ্টি দই দেখে আকুল হবেন না। মুম্বইয়ের পার্শিরা যদিও মিষ্টি দই পছন্দ করে, মুম্বইতে নানাস্থানে সুস্বাদ মিষ্টি দই পাওয়া যায়, জর্জের মিষ্টি দই মানে, সাদা দই-এর ওপর দুচামচ চিনি দেওয়া। নেহাতই মিষ্টান্নের বাসনা হলে একপাত্র ফিরনি নিতে পারেন। চলনসই। ৩.৫০ টাকা। ইদানীং আধুনিকতার দাপটে আমাদের অনেক পুরনো জিনিস ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। জর্জও একটু ম্রিয়মান দেখলাম। দোতলায় টেলিভিশন সেট বসেছে, নতুন নতুন পদ সংযোজন হয়েছে, তবু। শুনলাম দিল্লি দরবার নাকি বড় প্রতিযোগিতা করছে। রসিকেরা এখন নাকি দিল্লি দরবারের পক্ষে। শুনে বড় কষ্ট হল। মুম্বই বলেই রসিকেরা এত চপলমতি।

প্যারাডাইস হ্যামবার্গার

বহুকাল পরে দেশে ফিরে স্মৃতিমন্ডিত বান্ধবীর রূপান্তর দেখে প্রবাসী যেমন চমকে যান, কয়েক বছর পরে মুম্বইয়ের প্যারাডাইস কাফেতে গিয়ে আমার সেই ধরনের অনুভূতি হয়েছিল। অবশ্য পুরান বান্ধবীর মতো বয়সের ভারে জর্জরিত হয়নি প্যারাডাইস কাফে, মনে হল না তার জৌলুস কিছুমাত্র ম্লান হয়েছে। সেই প্রথম পরিচয়ে যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আছে। আলোকিত, ঝকঝকে, পরিপাটি টেবিল চেয়ার, পরিচারকগুলি সভ্য এবং পরিচ্ছন্ন। নিরাশ করেছিল খাদ্যাদির দাম এবং কয়েকটি পদের বিশেষত্বহীন স্বাদ। সুখস্মৃতি প্রচন্ড আঘাত পেল। একদা এই ক্ষুদ্র ভোজনশালাটির (ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন অতিথির জন্য আসন আছে) সুখাদ্যের খ্যাতি ছিল। গুণগ্রাহী রসিকদের ভিড়ে দ্বিপ্রহরে এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে স্থান পাওয়া সহজ ছিল না।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সুখাদ্যের আসরে প্যারাডাইস কাফের উল্লেখ কেন? বর্ষিয়সী প্রাক্তন বান্ধবীর চকিত গ্রীবা ভঙ্গিমায়, কিংবা চোখের তির্যক চাউনিতে সহসা পুরান মায়াময় দিনগুলি যেমন অনিবার্যভাবে ফিরে আসে, প্যারাডাইস কাফেতে এখনও কতগুলি পদ আপনার পুরান স্মৃতিকে তেমনি উজ্জ্বল বর্ণময় করে দেয়।

প্যারাডাইস কাফে দক্ষিণ মুম্বইয়ের জনপ্রিয় দোকানবাজারের এলাকা—শপিং সেন্টার—কোলাবা কজওয়ের দক্ষিণভাগে। প্রায় বিপরীতে মুম্বইয়ের অন্যতম চাটের দোকান, কৈলাস-পর্বত। এই অঞ্চল আপিস পাড়ার সীমান্তে। তবু এখনও বেশ অতিথি সমাগম হয় প্যারাডাইস কাফেতে। এখানে বড় একটা ফালতু, একদিনের অতিথি আসে না। পুরনো সমঝদার, যাঁরা মজে আছেন, তাঁরাই আসেন। পুরাতন মালিক, যিনি প্যারাডাইসের খ্যাতির প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আর নেই। দেশান্তরে চলে গিয়ে যেন অজানা

অন্য রসিকদের মনোহরণ করছেন। পুরনো একসেলসিয়র সিনেমার সঙ্গের কাফেটি তিনিই পরিচালনা করতেন। একসেলসিয়রের বীফস্টেকের সঙ্গে মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলের স্টেক একাসনে বসার যোগ্য ছিল না। পাঠক চালিয়াতি মার্জনা করলে বলতে পারি, টোকিওর বিশ্বখ্যাত অনেক ভোজনশালার কোবে বীফস্টেকের সমকক্ষ ছিল একসেলসিয়রের স্টেক উইথ গার্লিক সস। এখনও সেই পদটি পাওয়া যায় প্যারাডাইস কাফেতে, ২২ টাকা। গার্লিক সস বাদ দিলে ১৮ টাকা।

এবারে প্রথম আদেশ করেছিলাম আমার প্রিয় স্কচ ব্রথ। বড় এক পাত্র তপ্ত সুপ। মাংস এবং মাখনের মিশ্র সৌরভ, হয়ত সেলেরিরও ঘ্রাণ ছিল। প্রায় সাদা সুপের ওপর গলিত মাখনের ছোট ছোট স্বর্ণবিন্দু। ভেতরে নরম কয়েক খন্ড মাংস। একটু লেবুর আভাস। অতুলনীয়। দাম ৬ টাকা। সেদিন এরপর চিকেন স্টেক নিয়েছিলাম। আসলে উদ্দেশ্য ছিল সিজলিং স্টেকের, কিন্তু বিশেষণটা উল্লেখ করা হয়নি। যে পদটি এল সেটি রূপে মোহময় হলেও, প্রায় নির্গুণ। কয়েক স্লাইস রোস্ট বা গ্রিল্‌ড্ মুরগি, স্বর্ণাভ টমাটো সসে আবৃত, লম্বা ফালি মুচমুচি আলুভাজা এবং এক চামচ রাশিয়ান স্যালাড। ১২ টাকা। বরং, তুলনায় চিকেন ক্রাঞ্চি, ১০ টাকা, অধিক স্বাদিষ্ঠ। মশলাশূন্য, না-থোড়া চিকেন কাটলেটের মতো, ওপরে ডিম ও বিস্কুট গুঁড়ার আস্তরণ। খানিকটা মাখনযুক্ত আলুসেদ্ধ, যাকে ম্যাশট পটেটো বলে, একটি সবজির পুরে ভরা সিমলা মরিচ, তার ওপরের ঢাকাটা পিষ্ট পুদিনা ও ধনেপাতা দিয়ে তৈরি। খানিকটা রাশিয়ান সালাড। পদটি সুগঠনা নর্তকীর মতো টেবিলে এসে পৌঁছল।

হংকং রাইস একপাত্র পরীক্ষা করতে পারেন। উত্তম সন্দেহ নেই। চিনা ফ্রায়েড রাইস টমাটো সস সহযোগে। আর একটি পদ শুনেছি অনেকের মনোহরণ করেছে, মেক্সিকান রাইস, ৯ টাকা। আমার পরীক্ষা করার সুবিধা হয়নি। পদটি বেলা পাঁচটার আগে পাবেন না। রাশিয়ান পোলাও পাওয়া যায়, তাও আমার অপরীক্ষিত। এত দেশী-বিদেশী খাবারের মধ্যে দুটি পরিচিত সুখদায়ক পদ অনুপস্থিত ছিল। খাদ্য তালিকা এখন দীর্ঘ, তবু পদ দুটি কেন বাদ গেল জানি না। বর্মীজ প্রণ এবং খাউ সুয়ে। এই দুটি পদ আমার অনেক সন্ধ্যা আনন্দময় করেছে। বর্ণনা করব না, আপনাদের চেয়ে আমার মনোকষ্ট বেশি হবে। দুটিরই আধার চিংড়ি মাছ, মুম্বইতেও মহার্ঘ, তাই বোধ করি।

প্যারাডাইসে বুধবার আর শনিবার পার্সি আহার্য পাওয়া যায়। অবশ্য একটি পদই— ধানশাক। পার্সি ভোজনের কেন্দ্রমণি এই পদটিতে মাংস এবং ডালের একটি অভিনব সমন্বয় হয়। তার সঙ্গে আদিম কোনও বিচিত্র মশলার আঘ্রাণ। বুধবারে গেলে মটন ধানশাক পাবেন। বৃহস্পতিবারে চিকেন ধানশাক। পোলাওতে যেমন, ধানশাকেও আমার মটন অধিক প্রিয়। ধানশাকের সঙ্গে নিরঙ্কার পোলাও সেবন করা বিধি। সঙ্গে একটা দুটো কবাব হলে পার্সি ভোজনের তুঙ্গে পৌঁছবেন। মটন এবং চিকেন উভয় ধানশাকই ১২ টাকা। পার্সিরা রবিবারে বা শনিবারে ধানশাক পছন্দ করেন, কারণ ভোজনের পর ঘণ্টা দুই নিদ্রা দেওয়াই বিধি। বুধবারে কেন ধানশাক পাওয়া যায়, সপ্তাহের অন্যান্য দিন বাদ দিয়ে, কারণটা আমার অজ্ঞাত আছে।

এবারে প্যারাডাইসের আসল পদ দুটির কথা বলি। হ্যামবার্গার ও চিকেন রোল। হ্যামবার্গারের দাম মাত্র ৪ টাকা। দুটি অর্ধগোলক পাউরুটির খন্ডের মধ্যে একটি মাঝারি আকারের রসস্থ কবাব। পাউরুটির ওপরটি ভাজা, ঈষৎ মুচমুচে। ভেতরের অংশ, অল্প আঁচ পেয়েছে নরম। কবাবের সঙ্গে এক খন্ড বৃত্তাকার পিঁয়াজ, একটু বুঝি টমাটো সস, লেবু নাকি নুনের জলে জরান এক টুকরো শশা, আর অতি প্রখর রাই, অর্থাৎ মাস্টার্ডের উপস্থিতি। এই সাধারণ পদটি বহু জায়গায় দ্রুত ভোজনের দাবিতে গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ এই পদটিকে অসামান্যের স্তরে উত্তরণ করতে প্যারাডাইস কাফের সমকক্ষ কেউ আছেন বলে জানি না। কী জাদু আছে কবাবের আকর্ষক সুগন্ধে, অম্ল শশা এবং প্রখর রাই-এর স্বাদে, ভোজন না করলে বোঝাতে পারব না। প্যারাডাইসের চিকেন রোলও অনুরূপ মোহময়। স্বাদের বর্ণনা করব না। আপনার অভিজ্ঞতার জন্য তোলা রইল। আরও একটা আমার পরম প্রিয় পদ ছিল প্যারাডাইসে। টেমটেশন। নামের মতোই লোভনীয় যে পদে মেষমাংস ও মুরগির যুগলবন্দি মৃদঙ্গের স্থানে ডিমের আস্তরণ। দশ টাকা।

মুম্বইতে বাইরে জল পান করা বিধেয় নয়। শীতল সোডা এক বোতল ১.৫০ টাকা। এই ভোজনশালায় মিষ্টান্নের অংশ প্রবল নয়। না হবারই কথা। বড় একটা কেউ এখানে মিষ্টান্ন গ্রহণ করে না। হ্যামবার্গারের স্মৃতি রসনা থেকে মুছে ফেলতে আপনারও মন চাইবে না। যদি নেহাতই অধীর হন, এক গেলাস ফালুদা নিতে পারেন, ৯ টাকা। দুধ ও আইসক্রীম ফেনিয়ে যেমন হিমশীতল মিল্ক শেক তৈরি হয় সেই জাতের, কিন্তু একটু বিচিত্র। এক ধরনের ছোট ছোট পিচ্ছিল বীজ, ইসবগুলের মতো, মিশিয়ে ফালুদার বিচিত্র স্বাদ রচনা করা হয়। আমার মতো স্মৃতির যন্ত্রণায় যাঁরা ক্লিষ্ট নন তাঁরা প্যারাডাইস কাফেতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাবেন।

ক্র্যাব ইন বাটার সস

মুখে মুম্বইয়ের বেনিয়া সভ্যতার যতই নিন্দা করি, মনে মনে ঈর্ষা না করেও পারি না। শহরটা তো সামান্য নয়। ভারতবর্ষের বৃহত্তম বন্দর। সেখানে ধনবানের সংখ্যা ভারতবর্ষে সর্বাধিক। আবার, ঐতিহ্যে কম নয়। কলকাতার থেকে প্রাচীন শহর। ইংরেজদের অধিকারেই ছিল সাড়ে তিনশো বছর। এখানেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতের স্বাধীনতার গোড়াপত্তন হল। তারও আগে ভারতবর্ষের প্রথম রেলগাড়ি চলেছিল ১৮৫২ সালে মুম্বই থেকে তেইশ মাইল দূরে থানে পর্যন্ত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪২-এ মুম্বইয়ে।

আমরা দুটো ফ্লাইওভার করতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছি কলকাতায়। মুম্বই শহরে পরপর অনেকগুলি ফ্লাইওভার সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে তৈরি হয়েছিল। শহরের মাঝখানে দুটি বড় রেলস্টেশন, রেললাইন কোথাও যানবাহন আটকায় না ফ্লাইওভারের জন্য। ট্রামও মুম্বইতে চলেছিল ১৮৭৩ সালে।

সব থেকে আশ্চর্য, এখানে ট্যাক্সি-বাস চালকেরা এখনও পুলিশকে মান্যগণ্য করে। অনেকে বলেন, ১৯৪৬-এ মুম্বই বন্দরে নৌ-বিদ্রোহ না হলে ভারতের স্বাধীনতা আসতে দেরি হত।

আমার সব ঈর্ষা শুধু সেজন্য নয়। সিনেমা-তারকাদের শহর। চার-ছ'মাস পরে যখনই মুম্বই যাই, দোকানে ভোজনশালায় দু-চারজন তারকাকে কাছ থেকে দেখা যায়, যাঁদের মোহে অন্ধ আমরা বাংলা ছবির গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দিয়েছি।

ওই-যে ভোজনশালার কথা বললাম, সেখানেও মুম্বই অগ্রগণ্য। যখনই মুম্বই গিয়েছি,

খবর পেয়েছি নতুন নতুন ভোজনশালার, যারা ভোজনের আনন্দের দিগন্তকে আরও প্রসারিত করেছে। এর পরও ঈর্ষা হবে না?

এখন মুম্বইতে সি-ফুড অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস্যাদির ভোজনশালা সব থেকে জনপ্রিয়। বলা যায়, সি-ফুডের হুজুগ চলেছে মুম্বইতে গত দশ বছর। এই ক'বছরে সি-ফুডের বিশেষজ্ঞ নতুন কয়েকটি ভোজনশালা হয়েছে মুম্বইতে। কে বেশি ভাল, তাই নিয়ে খুব রেষারেষি। কিছুদিন আগে একটি সি-ফুড রেস্টুর‍্যান্টের খ্যাতি শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। এই সব রেস্টুর‍্যান্ট বাইরে থেকে খুব সাদাসিধে। সাজসজ্জায় তেমন ঘটা নেই, পাঁচতারা হোটেলের ভোজনশালার বিপরীত। দামে অবশ্য একটু কম। ভোজনকক্ষেও বিশেষ ঘটাপটা নেই। এরা রূপে ভোলাতে চায় না, ভালবাসায় ভোলাতে চায়।

আমরা যেখানে গিয়েছিলাম, তার নাম তৃষ্ণা রেস্টুর‍্যান্ট। শতাধিক অতিথির আসন আছে। আমরা যখন পৌঁছলাম বেলা একটায়, তখন একটি টেবিলও খালি নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

মুম্বইয়ের কালোঘোড়া অঞ্চলে জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি। গ্যালারির উত্তরের রাস্তার আগে নাম ছিল র‍্যামপার্ট রো। শুনেছি, প্রথম জীবনে অশোককুমার এখানে একটি বাড়িতে থাকতেন। এখন র‍্যামপার্ট রো-এর কী নাম হয়েছে জানি না। পুবদিকে একটু গিয়ে বাঁদিকে যে উত্তরমুখো রাস্তা, সে-পথে তৃষ্ণা রেস্টুর‍্যান্ট। দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। পথচারী কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে। রেস্টুর‍্যান্টের বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমান করতে পারবেন না ভেতরে এমন মহাযজ্ঞ চলেছে। সাধকেরা চিরকালই নির্জনে তপস্যা করেন, সেপাই-সান্ত্রি দাঁড় করিয়ে বাদ্যি-বাজনায় ভক্তদের আকর্ষণ করেন না।

আসন পাবার পর দ্রুত একটা উষ্ণ পানীয় আদেশ করেছিলাম। পরিবেশন খুব ভাল, অযথা সময় নষ্ট করে না। খাদ্য-তালিকা নিয়ে একটু বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তালিকা দীর্ঘ বলে নয়, খাদ্যমূল্যও কিঞ্চিৎ চড়া ছিল। অত অতিথি, কিন্তু খুব শোরগোল নেই, সবাই নিমগ্ন-চিত্তে ভোজনে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ খাদ্য-তালিকা নিরীক্ষণ করে আদেশ ব্যক্ত করলাম। ক্র্যাব ইন বাটার সস। মাখন সহযোগে কাঁকড়া। মাখনযুক্ত হলে কাঁকড়া কোনও পরম স্বাদ পায় বলে জানি না। তবু কেন যে পদটি নির্বাচন করেছিলাম বলতে পারব না। শুনেছি, নিয়তি এভাবেই প্রাণীসমূহকে পরিচালিত করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আদিষ্ট পদ এসে পৌঁছল। একটি বড় প্লেটে আট ইঞ্চি ব্যাসের একটি কাঁকড়া, তার বিশাল দাড়াগুলি সমেত। অতঃপর কীভাবে কাঁকড়াকে পর্যুদস্ত করব তার পরিকল্পনা করছি, এমন সময় জনৈক পরিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁকড়াটি চারভাগ করে দেব কি? বলতে ভুলে গিয়েছি, আমার দুই বন্ধু ও আমি, মোট তিনজন ছিলাম আমরা। সানন্দে পরিচারকের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতেই, তিনি কাঁকড়াসুদ্ধ প্লেটটি অন্যত্র নিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চারভাগে বিভক্ত কাঁকড়াটি পুনরায় টেবিলে স্থাপিত হল। ভাত না ফ্রায়েড রাইস, নাকি রুটি বা পরটা আর কী আদেশ করেছিলাম, এখন আর মনে নেই। ওই কাঁকড়ার স্বাদ পাবার পর অন্য কিছু তুচ্ছ কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে অনেক কিছুই আমার অজানা। তার জন্য আমার কোনও লজ্জা

নেই। কিন্তু ওই স্বর্গীয় কর্কটের সঙ্গে আমার এতকাল পরিচয় হয়নি, এ-কথা ভেবে লজ্জা এবং দুঃখ যুগপৎ আমাকে ক্লিষ্ট করেছিল।

কাঁকড়ার সঙ্গে মাখন এবং রসুনের অসম মিলনে এমন সুন্দরের উৎপত্তি হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কোথাও বোধহয় সামান্য লঙ্কার স্পর্শ ছিল, যদিও কাঁচা বা শুকনো লঙ্কার আভাস ছিল না ভোজ্যের পাত্রে। মাখন এবং রসুন, মাত্র দুটি যন্ত্রে এমন বৃন্দবাদন, যা অপরূপ আনন্দে রসনাকে নিমজ্জিত করে দেয়। তৃষ্ণা রেস্টুর‍্যান্টের আতিথ্য না নিলে এই তথ্য আমার অজ্ঞাত থাকত। সুসিদ্ধ, রস ও গন্ধে স্নিগ্ধ, সামান্য ফিকে সাদা ঝোলে সিক্ত কাঁকড়া ভোজনের সময় খেয়াল হয়নি যে দুটি প্রায় রক্তবর্ণ বিশাল দাড়া অক্ষত পড়ে আছে। ওই বিরাট কাঁকড়ার দাড়াকে শায়েস্তা করব, এমন স্পর্ধা আমাদের কারও নেই।

পথ-হারানো অসহায় বালকের মতো ওই দাড়াদুটির দিকে আমরা চেয়ে থাকলাম। অকস্মাৎ আরেক দেবদূতের আবির্ভাব হল পরিচারকের বেশে। তাঁর দুহাতে হাতুড়ি ও সাঁড়াশি। কোনও কথা না বলে তিনি অস্ত্রাদির সাহায্যে কাঁকড়ার দাড়াদুটিকে ভেঙে দিলেন, ভেতর থেকে ধবধবে সাদা কোনও কোমল পদার্থ আমাদের আহ্বান করতে থাকল। আমরাও সাহসের সঙ্গে দাড়ার খোলের ভেতর থেকে বের করে তার রসাস্বাদন করলাম। কেন যে শাস্ত্রে সাতটা স্বর্গের কথা বলে, সেদিন দ্বিতীয় স্বর্গের স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছিলাম।

ওই অঞ্চলে ডিনারের জন্য বিশেষ কেউ যায় না। লাঞ্চের জন্য একটার কিছু আগে গেলে অথবা দুটোর পর টেবিলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

বিল আসতে কাঁকড়ার দাম দেখে বেশ চমকে উঠেছিলাম মনে আছে। আটশো টাকা। শুনেছি কাঁকড়ার পদের দাম স্থির হয় কাঁকড়ার ওজনের ওপর। কত ওজন হলে আটশো টাকা দাম হয়, জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

মানুষের মন বড় অকৃতজ্ঞ। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, ওই অনুপম তৃপ্তিদায়ক ভোজন সত্ত্বেও দামের কথা এখনও মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

রাজস্থানের আমিষেও চমক

কর্নেল টড এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপায় রাজস্থান আমাদের, বাঙালিদের, কাছে অজানাভূমি নয়। রাজস্থানের সামন্তরাজাদের জয়পরাজয়ের কাহিনী এখন কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবু রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় শুরু হয়েছিল গত চার দশকে যখন পশ্চিমের পর্যটকের ঢল নামল রাজস্থানে। ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত হোটেলের অবস্থান রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে। তা বলে এমন নয় যে সাধ্যায়ত্ত হোটেল নেই। তাদের সংখ্যাও পর্যাপ্ত।

রাজস্থানের দ্রষ্টব্যগুলি এখন আমাদের পরিচিত। কিন্তু রাজস্থানের বিশিষ্ট ভোজ্যগুলি এখনও আমাদের পরিচয়ের পরিধিতে প্রবেশ করেনি। বাঙালিদের ডাল-রুটির প্রতি সহজাত অবজ্ঞা আছে। তার ওপর রাজস্থানের অনেকখানিই মরুভূমি অঞ্চল। শাকসবজি হয় না। এবং সর্বোপরি রাজস্থানের সাধারণ দৈনন্দিন ভোজ্যের মধ্যে মাছ মাংস থাকে না।

এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য রাজস্থানে মাছ অপাঙক্তেয়। সাধারণ দোকানবাজারে মাংসের দেখা মেলে না। দু-দশটি ভোজনশালায় মাসংজাত ব্যঞ্জন পাওয়া গেলেও, তার মান পরীক্ষায় পাস করবার মতো নয়। কিন্তু রাজস্থানের নিরামিষ পদগুলি অতিশয় রুচিকর। তাদের সঙ্গে পরিচয় হলে, আত্মীয়তা হতে দেরি হয় না। আমার যেমন হয়েছে।

রাজস্থানের অতিবিশিষ্ট পদের নাম, ডাল-রুটি-চুরমা। এ নিয়ে রাজস্থানিদের গর্বের শেষ নেই। আমাকে এক বাসিন্দা সতর্ক করে দিয়েছিলেন প্রথমেই, বললেন, ডাল-রুটি-চুরমা দৈনন্দিন খাবার জিনিস নয়। অতিশয় গুরুপাক। এক পোয়া বাটিতে

তিন পোয়া ঘি থাকে। কথাটা গণিতসিদ্ধ না হলেও, কার্যত তাই মনে হয়। প্রচুর এবং প্রচুরতর ঘৃত সংযোগে আটা মেখে ভেতরে পুর দিয়ে কাঠের আগুনে ভেজে বা পুড়িয়ে বাটি প্রস্তুত হয়। ডালেও পাত্র ছাপিয়ে ঘি থাকে। চুরমা যেন শুকনো চাটনির পাউডার। আমার না হলেও চলে। কিন্তু ডাল-বাটি সত্যিই অনুপম। রাজস্থানের বাইরে মধ্যপ্রদেশেও ডাল-বাটির খাতির আছে। আমি যতদূর জানি কলকাতার একটি ভোজনশালায় ডাল-বাটি পাওয়া যায়। সেটি হল গঙ্গৌর—রাসেল স্ট্রিটের ওফর। চরিত্রবান রাজস্থানি ভোজ্যের স্বাদ নিতে হলে গঙ্গৌর প্রায় একমেবাদ্বিতীয়ম। আর একটি স্থানে, সম্ভবত প্রত্যহ নয়, ডাল-বাটি পাওয়া যায়, তার নাম গোকুল, লোয়ার সার্কুলার রোডের প্রায় ওপরে।

গঙ্গৌরে এক থালি রাজস্থানি ভোজ্য আদেশ করলে, প্রধান দেশীয় পদগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে। তবে এক পদ তো রোজ থাকে না, খাদ্যতালিকা বদলায়। আগে জেনে নেওয়াই ভাল, সেদিন কী কী পদ পরিবেশন করা হবে। গাট্টা কা শাগ, অর্থাৎ গাট্টার ব্যঞ্জন সাধারণত রোজই পাওয়া যায়। গাট্টা যেন আমাদের ধোঁকার গ্রাম্য সংস্করণ। কিঞ্চিৎ মোটা দাগের ছবির মতো। ধোঁকার মতো ডালের বরফিগুলি ভাজা হয় না। স্বাদে কিঞ্চিৎ মেঠো। তবে ঘৃত ও লঙ্কার বাহুল্য গুণিজনকে আমোদিত করে।

রাজস্থানি ব্যঞ্জনের মধ্যে আমার প্রিয়তম হল সেংগরি। মরুভূমির দেশ রাজস্থান, সর্বদা তাজা সবজি পাওয়া যায় না। ঘাসের ধরনের সরু সরু কাঠি-কাঠি এই শাক সারা বছর ভোজনের জন্য শুকিয়ে রাখা হয়। আমার মনে হয়েছে, তাজা সেংগরি নিশ্চিত অত স্বাদিষ্ঠ নয়। সেংগরি বুঝি শুষ্ক হলেই রসস্থ হয়। সেংগরির ব্যঞ্জনে লঙ্কার প্রাচুর্য অনেককে ধরাশায়ী করে। বলা হয় লঙ্কার প্রাবল্যে পাকস্থলীকে রক্ষার জন্যই ঘৃতও অনেক বেশি ঢালতে হয়। কিন্তু তারপর যে অলৌকিক পদটি পরিবেশিত হয়, তার মোহ আমি ভুলতে পারি না।

রাজস্থানে একদা প্রধান গন্তব্য ছিল জয়পুর। লাল পাথরের অট্টালিকায় সাজানো শহরটিতে পৌঁছানো সহজ—ট্রেনে ঘণ্টা পাঁচেকের যাত্রা। এখন অবশ্য জয়সলমির বেশি আকর্ষণ করছে পর্যটককে।

যদি জয়পুরে যান, সহজেই আবিষ্কার করবেন যে রাজস্থানি ভোজনধারাকে তুঙ্গে নিয়ে গেছে এই শহর। ছোটবড় সব ভোজনশালাতেই উত্তম রাজস্থানি খাবার পাওয়া যায়। তবে ভোজনশালাদের সম্রাট হল, এল এম বি, অর্থাৎ লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, জহুরিবাজারে। মনে হবে ভোজ্যসামগ্রীর নন্দনকাননে গিয়ে পড়েছেন। দিশাহারা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। থালি নিতে পারেন, আলাদা করে শাকসবজি, রুটি, পুরি, কচুরি নিতে পারেন। সর্ববিষয়ে প্রথম হওয়া ছাত্রের মতো এদের অধিকার সর্ববিভাগে প্রতিষ্ঠিত।

স্বল্পাহার অর্থাৎ জলখাবারে এরা বোধহয় ভারতবর্ষে প্রধান। অবশ্য সবই নিরামিষ। দহিভল্লা বলুন, যে-কোনও চাট বলুন, টকমিষ্টি, সুগন্ধি চাটনির সঙ্গে সুখের স্বর্গে পৌঁছবার পথ।

এল এম বি মিষ্টান্নেও কম যায় না। ছানা, ক্ষীর, খোওয়া, ময়দা, বেসন—সব উপাদানেরই লোভসঞ্চারী সুশোভন মিষ্টান্ন সর্বদা হাজির। এঁদের একটি মিষ্টান্নের নাম

ঘেবর। আমার আপনার কাছে অপরিচিত আগন্তুক, কিন্তু দেখছি শতবর্ষ পূর্বে প্রণীত বিপ্রদাস মুখুজ্জে মশায়ের বইতে ঘেবরের পাকপ্রণালী লেখা আছে। যাই হোক, আমি ময়দার ঘেবরে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বছর পাঁচেক আগে এল এম বি-তে গিয়ে পেলাম ছানার ঘেবর। এই নতুন উদ্ভাবন দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি স্বাদের সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। এককথায়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম।

রাজস্থানিরা রুটির শৌখিন। অর্থাৎ শুষ্ক রুটিকে নিয়ে এঁদের বিলাসিতার শেষ নেই। বিভিন্ন শস্যের রুটি, আটা ময়দা ছাড়া, বিভিন্ন ঋতুতে গ্রহণ করা খানদানি মেজাজের লক্ষণ। সে তুলনায় আমার রুচি স্থূল। তাই জোয়ার বাজরা মকাই ইত্যাদির রুটি আমার সব সময়ে সর্ব ঋতুতেই ভাল লাগে।

রাজস্থানি ভোজ্যের আর-এক বিশিষ্ট পদ হল খিচুড়ি। আমার ধারণা ছিল, বাঙালিরাই খিচুড়ি-প্রেমিক। রাজস্থানে দেখলাম তাঁরা আমাদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। রুটি-পুরির পর শেষপাতে কিঞ্চিৎ খিচুড়ি আভিজাত্যের লক্ষণ। ভাল খিচুড়ি সব জায়গাতেই পাবেন। কিন্তু যদি আপনার অভিলাষ হয় সেরার সেরা, তা হলে যেতে হবে মুম্বই। কলবাদেবীর মুখে মঙ্গলদাস মার্কেটের সামনে একটি অনুজ্জ্বল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভোজনশালার নাম রাজধানী। এই ভোজনশালাটি নিয়েই একটি স্বতন্ত্র রচনা লেখা যায়। আমি এঁদের খিচুড়ির কথা বলি। মুসুরের নয়, সোনামুগের নয়, এঁদের খিচুড়ি মুগের ডালের সঙ্গে কালো গোটা মুগ মিশিয়ে তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গত করে পোরবন্দরের বিশুদ্ধ ঘি। আমি সে স্বাদের তুলনা করব না।

রাজস্থানি নিরামিষ পদের সংখ্যা সামান্য নয়। মুম্বইতেই আর-এক স্থানের হৃদয়লোভন খিচুড়ির কথা না বলে থাকতে পারছি না। সি পি ট্যাঙ্ক, মাধববাগের সামনে এই ভোজনশালাটির নামেই প্রকাশ তাদের খিচুড়ির মাহাত্ম্য। ভোজনশালার নাম, খিচড়ি সম্রাট। পিঁয়াজ রসুনের বালাই নেই খিচড়ি সম্রাটে। তা হলে কী দিয়ে প্রস্তুত হয় তাঁদের খিচড়ি-ফ্রাই? আমি বলতে পারব না, আমি পরখ করে দেখিনি।

এই নিবন্ধের কোথাও স্বল্পাহারের কথা উল্লেখ করেছিলাম। একটি অবিস্মরণীয় স্বল্পাহারের কথা বলি। স্থান যোধপুর, মেহরানগড় কেল্লার নীচে এবং নিকটে দর্পণ সিনেমার বিপরীতে জনতা সুইটস নামের বিপণিটি দর্শনে সাধারণ। নানা পদ বিক্রি হয়। লোকসমাগমও যথেষ্ট। তবু সামনের ফুটপাথে ঠোঙা হাতে গুণগ্রাহীর রীতিমতো ভিড়। আমরা সেই ভিড়ে যুক্ত হয়, নিয়তির কোন রহস্যময় নিয়মে সেই পদটিরই আদেশ করেছিলাম, যার জন্য জনতা সুইটস বিখ্যাত। পদটিকে কী বলব পকোড়া না চপ? বড় মাপের কাশ্মীরি মরিচের ভেতর মশালাময় আলুর পুর দিয়ে কড়া করে ভাজা। প্রথম কামড়ে মনে হয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে বুঝি বিস্ফোরণ হল, এতই ঝাল। তারপর ধাতস্থ হয়ে অপূর্ব স্বাদ পেলাম। স্থির মৃত্যু জেনেও নিশির ডাকে মানুষ অজানা অন্ধকারে না বেরিয়ে পারে না, আমরাও তেমনি সুখের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। এমন অপূর্ব পকোড়া বা চপ আগে বা পরে কখনও খাওয়ার সুযোগ হয়নি।

রাজস্থানের পাঁপর এবং আচারের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই সৌহার্দ্য হয়েছে। এই দুটি বিষয়েই ভারতবর্ষ রাজস্থান সর্বশ্রেষ্ঠ।

পাঁপরের পীঠস্থান হল বিকানির। বিকানির পাঁপর এখন সর্বত্র পাওয়া যায়। তবে তাদের ঘোষিত জন্মস্থান সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। রাজস্থানি বিশ্বাস লঙ্কার ঝাঁঝকে উদরের অভ্যন্তর নির্বিষ করে ঘৃত। এবং অত্যধিক ঘৃত নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে নেয় পাঁপর। তাই ভোজনের সর্বশেষ পদ সর্বদা রোস্ট করা, সেঁকা পাঁপর।

বিকানিরের আর-একটি জগৎশ্রেষ্ঠ পদ হল ডালমুট জাতীয় স্বল্পাহার। বিকানিরে একটা রাস্তা আছে, মাইলটাক দূর থেকে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তার নাম ভুজিয়া গলি। রাস্তার দুধারে সার সার ভুজিয়ার দোকান এবং কারখানা। এইখানে সচ্চরিত্র ঘৃতে প্রস্তুত নানা মশলামণ্ডিত ভুজিয়া সারা ভারতবর্ষে এবং বিদেশেও রপ্তানি হয়। সব ভুজিয়াই রসনালোভন। তার মধ্যে আমার পক্ষপাত সেই ভুজিয়ার প্রতি যাতে প্রভূত পরিমাণ খরমুজার বীজ থাকে। এই একটি উপকরণের প্রতি আমার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারি না, যতই না উর্বশী-রম্ভার ন্যায় পেস্তা বাদাম অলঙ্কৃত ভুজিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুক।

এতক্ষণ নিরামিষ পদের কথা বললাম। তার মানে এই নয় রাজস্থানের নিজস্ব আমিষ রন্ধন প্রকরণ নেই. রাজস্থানের রাজা-রাজড়ার অন্যতম ব্যসন ছিল মৃগয়া। মৃগয়ায় আহৃত পশুপক্ষী রন্ধনের প্রকরণকে তাঁরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও সে ধারা উচ্চসমাজে বর্তমান। আমার সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্যের কারণে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। একদা একটি পদ গ্রহণ করবার সুযোগ হয়েছিল। মাংসের সয়তা। বাজরা দই এবং ছাগমাংস সহযোগে এই পদ অনেকটা হায়দরাবাদের হালিমের মতো। খুবই ভাল লেগেছিল।

এই বিভাগে এখনও নতুন আবিষ্কারের সুযোগ খুঁজছি।

পনিরের ঘেবর

ভারতবর্ষে দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনীর তালিকায় রাজস্থানের নাম সর্বাগ্রগণ্য। দেড়শো বছর আগে প্রকাশিত জেমস টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান' এবং পরে অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' আমাদের সঙ্গে রাজস্থানের পরিচয় গভীর করেছে। চিতোরের পদ্মিনী, বুঁদিগড়ের কুম্ভ, মেবারের রাণাপ্রতাপ ইতিহাস অতিক্রম করে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন।

রাজস্থানের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সামান্য। তাঁরা মস্ত মস্ত পাগড়ি ও বিশাল শুঁড়তোলা মস্ত নাগরা পরতেন এইটুকুই জানতাম। আর জেনেছি আর এক শ্রেণীর রাজস্থানের মানুষের কথা, যাঁরা দেশের (সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের) সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির অভ্রান্ত-লক্ষ্য সব্যসাচী। তাঁদের কীর্তি এবং কৃতি মূলত রাজস্থানের বাইরে।

রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশে থর মরুভূমি। বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। শাকসবজি বিশেষ জন্মায় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছি, বেলা-দ্বিপ্রহরে যে যাহার ঘরে সেঁধিয়ে জোয়ার রুটি। এদেরও তাই। পড়েছি, অরণ্যে পর্বতে সাময়িক আত্মগোপন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন রাণাপ্রতাপ। তাঁর একমাত্র আহার্য তৃণবীজের তৈরি রুটি।

রাজস্থানের ভোজনে ব্যঞ্জনের সংখ্যা স্বভাবতই অধিক নয়। তবে আশ্চর্যের কথা, মিষ্টান্নের আয়োজনে চমকে যেতে হয়। ভোজনে রাজস্থানিরা বোধহয় চরমপন্থী। দুই বিপরীত মেরুর রস, মিষ্ট ও তীব্র ঝাল তাঁদের আনন্দ দেয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ উগ্র না হলে রাজস্থানি ভোজন মর্যাদা পায় না। বলা যেতে পারত যে, তাঁরা প্রচুর লঙ্কাযুক্ত ব্যঞ্জন আহার করেন বলে অধিক পরিমাণ মিষ্টান্নের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়। অথচ

আশ্চর্য, রাজস্থানি ভোজনরীতিতে সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হয় বিবিধ মিষ্টান্ন। আমাদের ভোজনের উপক্রমণিকা, সুক্তো, নিমবেগুন, পলতার বড়ার মতো। তাঁদের মিষ্টান্নভোজন লঙ্কার অগ্নিমূর্তি নির্বাপণের জন্য নয়।

রাজধানী জয়পুর এখন বাঙালির কাছে সুপরিচিত। হাওয়ামহল, যন্তরমন্তর, অমেড় দুর্গপ্রাসাদ, যশোরেশ্বরীর মন্দির দেখবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তখন শহরের কেন্দ্রস্থলে জহুরি বাজারে লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আতিথ্য নিলে আনন্দ পাবেন। এখন আর পুরো নামটা বলা হয় না, সংক্ষেপে এল এম বি বললেই যথেষ্ট।

বছর ত্রিশ আগে যখন প্রথম গিয়েছি, তখন লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার একটি ছোট দোকান ছিল। উচ্চাঙ্গের চাট পরিবেশনে তখনই তাদের খ্যাতি রাজ্যের বাইরেও পৌঁছেছে। তখনও মিষ্টান্নের সম্ভার কম ছিল না। ততদিনে রাজস্থানে ছানার প্রবেশ ঘটেছে। প্রধানত আটা-ময়দা, ডাল, বেসন, ক্ষীর এবং খোওয়া দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন চলত উত্তর ভারতে। মিষ্টান্নে ছানার প্রয়োগ সম্ভবত বাঙালির উদ্ভাবন। এখন ছানার মিষ্টি বাঙালি মিঠাই নামে ভারতবর্ষের সর্বত্র পাওয়া যায়।

লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সেই ছোট দোকানটি এখন প্রকাণ্ড চারতলা এল এম বি হোটেলে পরিণত হয়েছে। আগাগোড়া শীততাপনিয়ন্ত্রিত। নীচের তলাটা সম্পূর্ণ ভোজনালয়। শতাধিক অতিথি স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। দোকানের বাইরে শো-কেসে মিষ্টান্নের লোভনীয় রূপে মোহিত হয়ে ভেতরে প্রবেশ না করে পারবেন না। আজকালকার ফ্যাশনে ছায়ান্ধকার নয়, দীপ্ত দিনের মতো উজ্জ্বল। উষ্ণ সাদর অভ্যর্থনা। খাদ্যতালিকা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন এত দীর্ঘ। তেমনই দীর্ঘ চাটের তালিকা। বস্তুত, আদিপর্বে দোকানটি চাটের জন্যই খ্যাত ছিল। এখন বুঝি বিবিধ নতুনতর চাটের সমারোহ। তালিকার প্রথমেই অবশ্য রাজস্থানে অবধারিত মিষ্টান্নের অংশ। পুরনো প্রথাগত খোওয়া বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন তো আছেই, ছানার মিষ্টির সংখ্যাও সামান্য নয়। এল এম বি-র ভোজন সম্পূর্ণ নিরামিষ, পিঁয়াজ-রসুন বর্জিত এবং বিশুদ্ধ ঘৃতপক্ক।

অজস্র মিষ্টান্নের অরণ্যে এল এম বি আর একটি মহীরুহ স্থাপন করেছে—পনিরের ঘেবর। চিরাচরিত ময়দার ঘেবরের সঙ্গে পরিচয় ছিল। থালার আকারে আধ ইঞ্চি পুরু মিষ্টান্নটি চিনি মিশিয়ে ভাজা হয় এবং তারপরে হাল্কা রসে সিঞ্চিত হয় অথবা, চিনি না মিশিয়ে ঘেবর ভাজার পর গাঢ় রসে কিয়ৎকাল নিমজ্জিত হয়—এ তথ্য আমার অজ্ঞাত। জানবার চেষ্টাও করিনি।

তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং সুললিত ভোজনের পর বাঙালি রীতিতে সর্বশেষ মিষ্টান্ন হিসেবে হাল্কা মিষ্টি ময়দার ঘেবর ভাল লাগত। এবারে অনুসন্ধিৎসু মন। পনিরের ঘেবর শুনেই আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। বাংলা মিষ্টান্নের জগতে দেখেছি, অর্ধশতাব্দীতে পাঁচ-ছটির বেশি নতুন মিষ্টান্নের সংযোজন হয়নি। রসমালাই, রসকদম্ব, অমৃতকুম্ভ। সেদিন দেখেছি ইলিশ মাছের খণ্ডের আকারে সন্দেশ। অসাধারণ স্থপতির বিস্ময়কর সৃষ্টি। আশ্চর্য দৃষ্টিনন্দন, কিন্তু স্বাদে নিরাশই করে।

ঘেবরের স্থাপত্যেও অভিনব বিশেষত্ব। থালার আকারের মিষ্টান্নটি জাফরির

মতো। লাল পাথরে জয়পুরের বিশিষ্ট জাফরির কাজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যেই হয়তো ঘেবরের সৃষ্টি হয়েছিল। ময়দার ঘেবর গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়েছিলাম। ময়দা ও ঘৃতের এমন রাজযোটক হয়, জানতাম না। পনিরের ঘেবর বোধহয় তারও অধিক— ছানা ও ঘৃতের স্বর্গীয় মিলন। উগ্রতা, বীরত্বের দেশে এমন কোমল রুচির নম্র নিবেদন অনেকাংশে রাজস্থানি রীতির বিরোধী। তবু আমার বিশ্বাস, রাজস্থানিরাও ছানার ঘেবরকে সাদর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ঘেবর আমাদের কাছে ষড়রসের মধ্যেই নতুন আর এক রসের সন্ধান।

মরিচের চপ

রাজস্থান ভ্রমণের চিরাচরিত বৃত্তের মধ্যে নাম আসে না যোধপুরের। যোধপুর শহর পাঁচশো বছরের পুরনো। দ্রষ্টব্যও সেখানে সামান্য নয়। থর মরুভূমির একাংশে এই শহরটিতে কখনও গিয়ে পড়লে শহরের কেন্দ্রে ঐতিহাসিক মেহেরনগড় দুর্গটি অবশ্যই আপনাকে দেখানো হবে। প্রাসাদ ও কেল্লার সমাহার এই সৌধটি এখন সংগ্রহশালা। কেল্লার পশ্চিম দিকে নীচের বৃক্ষহীন একটি অঞ্চল দেখিয়ে গাইড বলবে, নীল রঙের ছোট ছোট বাড়ির ওই যে জটলা, ওগুলো ব্রাহ্মণদের বাড়ি। সত্যিই দেখবেন, অঞ্চলটার নীল রঙের প্রাধান্য ঘোলাটে দিগন্তে নীল ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে।

উমেদভবন প্রাসাদও দেখবার মতো—বলা হয় মরুভূমির তাজ। এখন সেখানে মহার্ঘ হোটেল। দূর থেকে দেখাই ভাল। থাকতে গেলে খরচ প্রত্যহ পাঁচ-ছ হাজার টাকা।

যোধপুর শহরের প্রধান পথ, যার এক প্রান্তে মেহেরনগড় দুর্গ—সেইখানে একটি খাবার দোকান আছে। জনতা সুইটস। যোধপুরে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই ঠিকানা বলে দেবে। কাছাকাছি পৌঁছলে, বিশেষত সন্ধ্যার দিকে, একটা দোকানের সামনে অনেক মানুষের জটলা দেখলেই বুঝতে পারবেন জনতা সুইটসে পৌঁছে গিয়েছেন। নোনতা এবং মিষ্টি নানা নয়নলোভন খাদ্যের পসরা। সামনেই জনা তিনেক মানুষ মরিচের চপ ভাজছে। একটা বড় সিমলা মরিচের ভিতরে ও বাইরে পুর লাগিয়ে বেসন ডুবিয়ে ভাজা হচ্ছে। এবং ওই যে জনসমাগম দেখছিলেন তারা প্রায় সবাই ওই পরম বস্তুটির অপেক্ষায়।

আপনার আদেশমতো পাতার দোনা আপনার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ফুটপাথের

ওপর যদি একটা খালি টিনের চেয়ার পান অথবা বেঞ্চিতে একটা স্থান, বসতে পারেন। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আপনাকে সুখের গভীরে ডুব দিতে হবে।

ভোজ্যটি এক কথায় অসাধারণ। বলতে পারি অভূতপূর্ব। প্রচুর মশলা মিশ্রিত আলুর পুর। সিমলা মরিচের গন্ধ ও তীব্রতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্রতর কোনও মরিচের প্রাখর্য। জিহ্বা সামান্য পীড়িত হবে, তবু সে আনন্দের তুলনা নেই। একটাতে আশ মেটে না, দুটো খেলে আর রাত্রে আহারের প্রয়োজন থাকবে না। জিহ্বাকে একটু শান্তি দেওয়ার জন্য এক খণ্ড ঘেবর খেতে পারেন কিংবা গুলামজামুন। আগে তিন টাকা দাম ছিল, এখন দশ টাকা হলেও এই অভিজ্ঞতা স্মৃতির সংগ্রহে রাখবার মতো।

ধনী ভদ্রাসনে ভোজন

দুশো বছরের পুরনো শহর আমেদাবাদ। ১৪১১ সালে শহরের পত্তন করেছিলেন সুলতান আহমদ শা। পরে অবশ্য মোগলেরা তাদের সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয়। পুরনো দর্শনীয় মন্দির, মসজিদ অনেকগুলি। শহরের মাঝখান দিয়ে চলেছে সবরমতী নদী। নদীর পূর্ব তীরে প্রাচীন শহর। জনবহুল, ঘিঞ্জি দোকান-বাজার। অপর পারে নতুন শহর, আধুনিক বাড়ি-ঘর, প্রশস্ত রাস্তা, বহুতল বাড়ি। এখানেও ভিড়ের কমতি নেই। আগে নদীর ওপর একটি মাত্র সেতু এলিস ব্রিজ দুই অংশের সংযোগ রাখত। এখন সেতু হয়েছে কয়েকটি, শহরের মানুষ বেড়েছে অনেক। শহরও অনেক প্রসারিত হয়েছে।

আমেদাবাদ শহরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা যতটা আছে, পর্যটকের আকর্ষণ ততটা নেই। যদিও ভারতবর্ষের কয়েকটি উচ্চকোটির পর্যটনের স্থানগুলিতে পৌঁছতে হয় আমেদাবাদ হয়ে। গিরের সিংহ, কচ্ছের রান-এ বন্য গর্দভ, রাজকোটের পথে ময়ূর, মাউণ্ট আবুর দিলওয়াড়া জৈন মন্দির, এমনকী রণকপুরের মন্দিরও দেখতে হলে আমেদাবাদ হয়ে যেতে হয়।

সময় পেলে আমেদাবাদে একদিন থাকলে ভাল লাগবে। তবে দুঃসহ গরমের দিনগুলি বাদ দিয়ে যেতে হবে। ওই সময় আমেদাবাদ অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে।

আমেদাবাদের সিদি সৈয়দ মসজিদের বিখ্যাত কাজ পাথরের অর্ধচন্দ্রাকার জাফরি অবশ্যই দেখতে হবে। আর দেখবেন সিদি বশির মসজিদের দোল-খাওয়া মিনার। নতুন রাজধানী গান্ধীনগর না গেলেও চলবে। গান্ধীজির ঐতিহাসিক সবরমতি আশ্রমে নিশ্চয় যাবেন। সন্ধ্যায় সেখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের খেলা হয়। জায়গাটা হঠাৎ স্মৃতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সেখান থেকে ফিরে শহরের ঐশ্বর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সেদিন

পর্যন্ত গুজরাটিরা গৃহমুখী মানুষ ছিলেন। শহরে উল্লেখযোগ্য ভোজনশালা ছিল না। ছোট একটি শৌখিন রেস্টুর‍্যান্ট ছিল বাঙ্কুরা, অর্থাৎ বাঁকুড়া। আমিষ খাবারের জন্য কোয়ালিটি ছাড়া আর প্রায় কিছুই ছিল না।

বছর খানেক আগে আমেদাবাদে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শহরের মধ্যাংশে ভীষণ ভূমিকম্পের কোনও চিহ্নই নেই। আলোয়, সৌষ্ঠবে, বিশাল বিপণিতে শহরই অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। পথে গাড়ি ও মানুষের প্রগল্‌ভ স্রোত। সম্পন্ন হয়ে শহর আমেদাবাদ ঐশ্বর্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। আমাদের আমন্ত্রণকর্তা ভোজনশালার যে ফিরিস্তি দিলেন, আমিষ এবং নিরামিষের, তাতে দিল্লি মুম্বই না দেখা থাকলে প্রায় বাক্যহারা হতে হয়।

একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও ভোজনশালা দেখলাম। রসরঞ্জন, দ্বিতল আলো ঝলমল এই বিপণি আমাদের এয়ারপোর্টের রাস্তায় হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার ভাণ্ডার ও ভোজনশালাকেও অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। মিষ্টান্ন ও নোনতা যে অগুণতি রকমের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সুদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ভোজনশালা। নিচে, মিষ্টান্ন চাট ও পানীয়ের ভাণ্ডার, খাবার পরিবেশন হয় না। কুপন কিনে খাবার নিয়ে আসতে হয় বিভিন্ন কাউণ্টার থেকে। আমরা একটা কেশর-পিস্তা মিল্কশেক নিয়ে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের রাত্রের ভোজন এখানে নয়। সেটা হবে আগাসি ভোজনশালায়। আগাসি মানে ঢাকা বারান্দা বা ছাদ। আগাসি দ্বিতল একটি পুরাতন প্রাসাদে অবস্থিত। গুজরাটের অন্যতম শিল্পপতি মঙ্গলদাস পরিবারের বাসস্থান ছিল এই বাড়িটি। এখন এটা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, হেরিটেজ বিল্ডিং। গৃহস্বামীরা ওই বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে এখন অন্যত্র আধুনিক নতুন বাড়িতে বাস করেন। তাঁদেরই একজন, অভয় মঙ্গলদাস এইখানে একাধিক ভোজনশালা, ক্লাব চালু করেছেন বছর দুই আগে। আগাসি সেই গুচ্ছের অন্যতম ভোজনের স্থান।

প্রথমে প্রতীক্ষার অঞ্চলে বসতে হল। নিচু সোফা, সুউচ্চ ছাদ, কাঠের প্যানেল লাগানো প্রকাণ্ড হল ঘর। নানা বর্ণের কুশন, নিচু টেবল, ঢুকলেই আয়োজনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। ভারতীয় পোশাকে বিনীত পরিচারক আমাদের আদেশ লিখে নিল। আমরা নেব পূর্ণ থালি। দেড়শো বা দুশো টাকা বুঝি দাম। নিমন্ত্রণকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হল।

অল্পকাল পরে সেখানেই আমরা পেলাম, সুশীতল একপাত্র পানীয়। ডাবের জল, লেবু এবং আদা সহযোগে অপূর্ব সে পানীয়। কচি ডাবের স্বাদ, লেবুর সুগন্ধ এবং আদার ঈষৎ উত্তেজনা যে এমন সুখের সৃষ্টি করে, আমার জানা ছিল না। পানীয়ের সঙ্গে এসে পৌঁছল এক থালা তপ্ত ডালের বড়া। এ পদটিও সুচারু এবং সুস্বাদু ছিল, আমাদের কলকাতার ভাল তেলেভাজার দোকানের ভোজ্যের মতো।

পরিচারক এবারে আমাদের ভোজনকক্ষে নিয়ে গেল। মস্ত একটা হল, দরবারের হলের মতো। দেড়শোর ওপর অতিথি ভোজন করতে পারেন, অথচ টেবিলগুলির মাঝের দূরত্ব সামান্য নয়। এখানেও চেয়ারগুলিতে ভারতীয় কারুকলার ছাপ। পরিবেশন হল কাঁসার বাসনে। জলের একটা ঘটি রেখে গেল পরিচারক টেবিলের ওপর, সঙ্গে

কাঁসার গেলাস। কাঁসার বাসন যে পরিচ্ছন্ন রাখলে স্বর্ণাভ হয়, সেকথা আমরা এখন এদেশে ভুলতে বসেছি।

প্রথমে এল গুজরাটের অনিবার্য পানীয় ছাস। আমাদের লবণহীন ঘোলের মতো, স্বাদের ক্ষেত্রে ঢিলে। এবারে যেন খাবারের শোভাযাত্রা আরম্ভ হল। একের পর এক খাবার আসতে থাকল। একজন এসে আমাদের বাটিতে রায়তা দিয়ে গেল। আর একজন তরকারির বাটিগুলি ভরতে থাকল, পালংশাক, কফি এবং আলুর ব্যঞ্জন। আলুর একটা শুষ্ক সবজি দিয়ে গেল থালার একপাশে। দু-রকম চাটনি এল, আর পেলাম দুরকমের আচার। শেষ বাটি ভরতি হল কড়ি দিয়ে। দাক্ষিণাত্যে যেমন সম্বার এবং দই না হলে আহার সম্পূর্ণ হয় না, গুজরাতেও তেমনি কড়ি ভোজনের অচ্ছেদ্য অংশ। কড়ি থাকতেই হবে। কিছুক্ষণ পরে আর একটি ব্যঞ্জন উপস্থিত হল, কাশ্মিরী লঙ্কা, আলু বিন সহযোগে পরম সুস্বাদু। সদ্য কড়া থেকে আহৃত মেথির ঠেপলা এবং ছোট ছোট জোয়ারি রুটি, যাকে এদেশে সবাই বলে ভাখরি।

আমরা আহার শুরু করলাম। পরিচারকদের আসার বিরতি নেই। কোনও পাত্রের ব্যঞ্জন নিঃশেষ হওয়ার আগেই ভরে দিয়ে যাচ্ছে। গুজরাটি কড়ির আমাদের জিহ্বার সঙ্গে সদ্ভাব নেই, বড়ই মিষ্টি এবং গুপ্ত লঙ্কার ঝাঁঝ। ওই বস্তুটির সদুপযোগ করে করতে পারিনি।

তাই ভাত আর নেওয়া হল না। আমাদের শেষ পদ এল খিচুড়ি। আমরা হাতেগড়া রুটি নিইনি। গুজরাটের রুটি কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন সুগোল, এত পাতলা রুটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। সদ্য তাওয়া থেকে আসা তপ্ত রুটির ওপর সামান্য ঘি দিলে যে পরম সুস্বাদু বস্তুটি তৈরি হয়, সেটি সেদিন আমাদের ভোজ্যের বাইরে থাকল।

কিঞ্চিৎ খানদানি ভোজন হলে গুজরাটে একাধিক প্রকারের রুটি থাকবে। আটা, ময়দা, জোওয়ার, বাজরি, ভুট্টার আটা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি রুটি।

আমি দেখেছি বাড়িতে হোক কিংবা ভোজনশালায় ঔপচারিক ভোজের শেষ পদে খিচুড়ির অব্যর্থ উপস্থিতি। আগাসিতেও গরম খিচুড়ি এল, আর তার সঙ্গে রাজকোটের অতি সুগন্ধি ঘৃত। খিচুড়ি অত্যন্ত নরম ছিল, আস্ত কাঁচা মুগের ডালের প্রাবল্য ছিল না। তবু সে সন্ধ্যায় খিচুড়ি মাতিয়ে দিয়েছিল। তারপরই ভোজনপর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে এল সেঁকা পাঁপড়।

গুজরাটে মিষ্টান্নের পরিবেশন হয় ভোজনের প্রথম পর্বে। আমাদের থালাতেও প্রথম থেকেই মিষ্টান্ন দেওয়া ছিল, একটা পেঁড়া এবং লেডিকিনিজাতীয় আর একটি মিষ্টান্ন। আমরা পদ দুটিকে প্রথম থেকেই থালার একপাশে সাজিয়ে রেখেছি, এখন, পাঁপড়ের পর তার সদ্ব্যবহারে মন দিলাম। আশাভঙ্গ হল । প্রথমে রাগ বাজিয়ে পরে আলাপ শোনালে যেমন রসহীন হয়, তেমন হল। এতক্ষণের সুখদায়ক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলল না। হয়তো মিষ্টান্ন নেহাতই নিরেশ ছিল, অথবা গুজরাটি অনুক্রমে প্রথমে গ্রহণ করলে হয়তো অত নিরেশ মনে হত না। গুজরাটে রাজকোটের পেঁড়া নির্ভেজাল সুখের আকর। আমেদাবাদের পেঁড়া তার ধারে কাছে লাগে না।

সব মিলিয়ে কিন্তু পরমানন্দ ভোজন হল।

আপেক্ষিক তত্ত্ব

একদা এক ছাত্র নাকি আইনস্টাইনের কাছে দুরূহ আপেক্ষিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। শোনা যায়, আইনস্টাইন বলেছিলেন, পৃথিবীর সব জিনিসই পরস্পরের আপেক্ষিক। যেমন ধরো, সময়। মনে করো, বান্ধবীর জন্য পার্কে অপেক্ষা করছ; তখন একটা মিনিট মনে হবে যেন এক ঘণ্টা। আবার, সেই বান্ধবী যেই এসে পৌঁছল, তখন এক ঘণ্টা সময় মুহূর্তে বিলীন হবে, যেন এক মিনিট।

স্পষ্টত, আইনস্টাইন রসিক ছিলেন। কিন্তু ভোজনবিলাসী ছিলেন না। না হলে কত সহজে আরও অন্তরঙ্গ উদাহরণ দিয়ে তত্ত্বটা বোঝাতে পারতেন। খাবারের উদাহরণের কথা বলছি। সব খাবার কি সব সময় ভাল লাগে? বিশেষ সময়ে বিশেষ মানুষের সঙ্গে যে আহার্য পরম রমণীয় মনে হয়, অন্য অবস্থায় সেই খাবারই রুচিকর না হতে পারে। তা ছাড়া আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা সংস্কৃত কাব্যের তুলনার মতো আমার জাতের মানুষের কাছে অর্থবহ হত না। আমরা যে সময় কলেজে পড়ি, প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একই স্কুলে ছেলে মেয়ে পড়ছে, আমরা কল্পনা করতেই পারতাম না। আমরা পার্কে কারও অপেক্ষা না করে একা একা বসে থেকেছি।

আমি কেমন করে আপেক্ষিকতাবাদ হৃদয়ঙ্গম করলাম, সেই কথা বলি। ১৬৬২ সালে সুলতান ইব্রাহিম কুলি কুতুম শা-র খনন করা বিশাল হুসেনসাগর হ্রদের উভয় তীরে জনপদ। উত্তরে সেকেন্দ্রাবাদ, দক্ষিণে হায়দরাবাদ। বলা হয় যমজ শহর। একবার কী যেন কাজে হায়দরাবাদ গিয়েছি। আমি আর আমার সহকর্মী শেঠসাহেব সেকেন্দ্রাবাদ ক্লাবে উঠেছি। শেঠসাহেব উত্তরপ্রদেশের খানদানি পরিবারের মানুষ। আহারাদি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমি ধর্মগ্রন্থের ন্যায় মান্য করি। তিনি আমাকে কাকোরি কবাবে দীক্ষিত

করেছিলেন, যে দুর্লভ কবাবের কথা স্মরণ করলেই জিহ্বা রসসিক্ত হয়,—দুর্লভ বলেই যার স্বাদ স্বর্গীয়।

শেঠসাহেব আমাকে রাত্রে খবর দিলেন, হায়দরাবাদের চারমিনারের কাছে এক বিশ্রুতকীর্তি কবাবওলা আছে। কিন্তু ভাল কবাব সকালের দিকে পাওয়া যায়। বেলা নটার মধ্যে পৌঁছানো প্রশস্ত।

বিশ্বাস করুন, পরের দিন সকালে স্নানাদির পর সজ্জিত হয়ে দুজনে সাইকেল রিকশা করে হায়দরাবাদ রওনা হলাম। হুসেনসাগরের বাঁধের ওপর দিয়ে, যাকে স্থানীয় লোকেরা ট্যাঙ্ক বানধ বলে, হায়দরাবাদ প্রবেশ করতে হয়। রিকশা অস্বস্তি বা কোনও কষ্ট দিল না। হ্রদের জলরাশি, সকালের মৃদুমন্দ বাতাস, সুখাদ্যের প্রত্যাশা। একটা অভিজ্ঞতাও হবে। প্রাতরাশে মুড়ি ফুলুরি, কি ফ্রায়েড এগস ও বেকনের পরিবর্তে কবাব রুটি।

চারমিনারের কাছে দোকানটি সহজেই পেলাম। সবাই চেনে। অত সকালেও লোক-সমাগম কম নয়। আমরা কবাব ও ডালচা অর্ডার করলাম। সঙ্গে রুটি। খাবার যখন এল, আমরা দুজন একটি বাক্য আদান-প্রদান না করেও যুগপৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, এখানে খাওয়া যাবে না। কী ছিল সেই অস্পৃষ্ট ভোজ্য, সেই অপরিচিত পরিবেশে, জানি না। আমরা দুজনে তৎক্ষণাৎ নীরবে উঠে, দাম চুকিয়ে দিয়ে দ্রুত ক্লাবে ফিরে এলাম।

দু-তিন বছর পরে এক মিটিং উপলক্ষে আবার হায়দরাবাদ গিয়েছি। এবারও সেকেন্দ্রাবাদ ক্লাবে আছি, বেশ বড় একটা প্রিয়জনের দল। মিটিং-এর পর সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ক্লাবের বড় বড় গাছে ঘেরা লনে বসা হল। কখন সবাই পানশালায় উঠে এলাম। গল্পে, হাসিতে সময় কাটতে লাগল। এক সময় কে যেন বলল, এগারোটা বাজে। ক্লাবে আর খাবার পাওয়া যাবে না। বাইরে যেতে হবে। কে যেন উত্তর দিল, চারমিনারের কাছে এখানকার এক বিখ্যাত রেস্টুর‍্যান্টের কথা শুনেছি। তার খ্যাতি হায়দরাবাদী খাবারের জন্য।

উঠে পড়া গেল। তিনখানা গাড়িতে আমরা দশজন রওনা হলাম। আবার ট্যাঙ্ক বানধ, হুসেনসাগর, দূরে দূরে আলোর বিন্দু, হ্রদের ওপর চাঁদের আলো। চারমিনারের কাছে পৌঁছে রেস্টুর‍্যান্টের নাম পড়লাম ঃ শেহরান হোটেল। পথচারীরা জানাল, এই সেই দোকান।

খাবারের অর্ডার দেওয়া গেল। কবাব ও রুটি । শামি কবাবের ধরন, কিন্তু ডালের অংশ যেন কম। আহা, কী তার সুগন্ধ। ঘ্রাণে অর্ধভোজন নয়, উল্টে সুবাস পাবার পর ক্ষুধা যেন আরও উদগ্র হয়ে ওঠে। মনে আছে নানা সুগন্ধের মিশ্রণের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত প্রথম বসন্তের বাতাসের মতো পুদিনার ঘ্রাণের ইঙ্গিত। দাম সামান্যই ছিল। মনে হয় না মাথাপিছু সাত আট টাকার বেশি খরচ পড়েছিল।

আনন্দে আচ্ছন্ন থাকলেও আমার অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল জায়গাটা যেন চেনা চেনা। যেমন অনেক সময় একটা মুখ, একটা ছবি, একটা গান কোন্ দূর অতীত থেকে পরিচয়ের আভাস দেয়, অথচ ঠিক সনাক্ত করা যায় না, তেমনি। হঠাৎ, পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আরে, এ তো সেই রেস্টুর‍্যান্ট, কয়েক বছর আগে যেখানে খেতে বসে উঠে

এসেছিলাম।

আপেক্ষিকতত্ত্বও মুহূর্তে প্রাঞ্জল হয়ে গেল।

টিপু সুলতানের বাবা পঞ্জবি হায়দার আলি নিজের নামে নামকরণ করে হায়দ্রাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই রাজ্য যাদের ভোগে এল, নিজাম তাঁদের পূর্বপুরুষ আওরঙ্গজেবের সৈনিক তুর্কী আসফজা। ফলে, হায়দরবাদী মোঘলাই রান্নায় বোধ হয় একটা নতুন ছায়া পড়েছিল। হায়দরাবাদী আহারাদি সাধারণ মোঘলাই খানা থেকে অন্য ধরনের।

এখানের বিখ্যাত বিশেষ রান্না হালিম, কোনও রেস্টুর‍্যান্টে পাওয়া যায় বলে শুনিনি। সেই অমৃতসম পদার্থটি, তাই আর বর্ণনা করছি না। যদি কোনও হায়দরাবাদী বন্ধুর বাড়িতে খাবার সুযোগ হয়, হালিম খেতে ভুলবেন না। বন্ধু মুসলমান হলে ভাল হয়। হিন্দুদের রান্নার ধারা আবার অন্য রকম।

তবে হিন্দু রান্নারও খ্যাতি কম নয়। ধরুন, বঘেরা বেঙ্গন। বাঘ-টাঘ নয়, আসলে, লম্বা লম্বা ফালি করা বেগুনের তরকারি। একটু টক মেশানো। মাংসও দেওয়া যেতে পারে। নিরামিষই তিন ধারার হয়—কোথাও রসুন, কোথাও নারকেল, আর অন্যটায় পোস্ত—এক সুপুরুষ পরিবারের তিন ভাই যেমন দেখতে কন্দর্প হয়েও আলাদা আলাদা চেহারা, তেমনি।

আর একটা ভোজ্য যদি কখনও সুযোগ হয় সাবধানে স্পর্শ করবেন। আমি এক চামচ মুখে দিয়েই মনে হল মাথার ভেতর বুঝি একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল। রিট্‌জ হোটেলের বাঙালি শেফ আমাকে জলের গেলাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওটা মিরচি কা সালন, যে তরকারির একমাত্র সবজি হল কাঁচালঙ্কা, সইয়ে সইয়ে মুখে তুলতে হয়। প্রথমে সামান্য একটু তারপর গ্রাসের মাপ বাড়াতে পারেন। পরম স্বাদু, সন্দেহ কী। দুর্লভ জিনিস পেতে হলে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন, আবার অনুভব করেছিলাম।

ফকিরার চানাচুর

রেল স্টেশনের নাম টাটানগর। শহরের নাম জামশেদপুর। ভারতবর্ষের প্রথম লোহার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা—জামশেদজি টাটার নাম থেকে উভয়ের নামকরণ। এখন বড় ব্যবসা ক্ষেত্র হয়েছে। বিহারের দ্বিতীয় শহর। বাংলা-বিহারের সেতুবন্ধ। এখন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত।

জামশেদজি টাটা যখন কারখানার স্থান নির্বাচন করেন, তখন নাম ছিল কালিমাটি। ছোটবেলায় ওই নামটাই শুনতাম। এখন আর ব্যবহার হয় না। মানুষের স্মৃতি থেকেই হারিয়ে গিয়েছে।

কাজ ছাড়া কেউ জামশেদপুর যায় বলে জানি না। যদিও কাছেই দলমা পাহাড়, সেখান থেকে বুনো হাতিরা নেমে এসে প্রতি বছর পাশের মেদিনীপুর জেলায় হুজ্জত করে। পাহাড়ে ওঠবার পথ ভাল নয়। আমরা একবার জিপ নিয়েও খুব বেশি উঠতে পারিনি। ঈষৎ ভয় করছিল।

জামশেদপুরের পাশে জাতীয় সড়কের অন্য ধারে ডিমনা লেক এবং ছোট পাহাড়। বেড়াবার জন্য বড় মনোরম জায়গা। টাটাদের সঙ্গে ভাবসাব থাকলে তাদের গেস্ট হাউসে যদি থাকা যায় ডিমনা লেকের ধারে, মনেই হবে না বিহার-বাংলার রুক্ষ রূঢ় অঞ্চলে বসে আছেন।

জামশেদপুরে পর্যটকের থাকার ভাল জায়গা নেই। হোটেল গুটিকয় আছে—বিশেষ আরামদায়ক নয়। উল্লেখযোগ্য খাবারের দোকানও নেই। কয়েকটি ঘর আঁধার-করা উচ্চমূল্যের রেস্টুর্যান্ট রয়েছে—সেখানেও মনোমতো ভোজন হয় না। যাঁরা কাজে জামশেদপুর যান, পারলে সে দিনই ফিরে আসেন।

সে কারণেই জামশেদপুরের বিশিষ্ট একটি ভোজ্যের সঙ্গে বাইরের মানুষের পরিচয় হয়নি। অথচ, জামশেদপুরে ফকিরার চানাচুরের উল্লেখ হলেই বহু জিহ্বা সজল হবে। আসলে, মুশকিল হল শুধু চানাচুর ভোজন করে তো জীবন নির্বাহ করা যায় না। চানাচুর বিক্রি করে অবশ্য জীবিকা নির্বাহ করা যায়, ফকিরা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। পুরনো এক বাসিন্দা বিষ্টুপুর অঞ্চলের একটি তেতলা বাড়ি দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, এই বাড়ি তৈরি করেছে ফকিরা, চানাচুর বেচে।

ফকিরা গত হয়েছেন অনেক বছর হল। এখন ছেলেরা। হয়তো নাতিরাও ফকিরার পতাকা উঁচু করে রেখেছেন। রিগ্যাল সিনেমার বিপরীতে ময়দানে স্ট্যান্ডের ওপর একটি চৌকো ডালা বসিয়ে ফকিরা নিজে চানাচুর বেচতেন জামশেদপুরের অনেক প্রবীণ নাগরিকের স্মরণে আছে। এখন সেখানে একটা স্টল হয়েছে। প্রবীণদের মনে আছে ফকিরা তাজা চানাচুরের সঙ্গে সামান্য সদ্য কাটা পিঁয়াজকুচি মিশিয়ে ডালা থেকে যে বস্তুটি পরিবেশন করতেন চোঙার আকারে কাগজের ঠোঙাতে ভরে তার স্বাদ অনির্বচনীয় ছিল। স্বীকার করেন, এখনও ভাল, বিশেষ ভাল, তবে কি না তখন—পুরনো দিনের জন্য বিলাপ এ ক্ষেত্রেও সহজে থামে না। সেই শুরু। তখনও পলিথিনের ঠোঙা আসেনি। বলা দরকার ফকিরা যা বিক্রি করতেন এবং তাঁর স্টল থেকে এখনও যা বিক্রি হয়, সেটা চানাচুর নয়। আসলি চানাচুর হল চূর্ণ ছোলা, ছোলাপেটা বা ছোলার চেপ্টা—বা সাদা পোশাক-পরা একদল ফেরিওয়ালা কলকাতার রাস্তায় এখনও কোথাও কোথাও বিক্রি করে। একদা তারা গান করে চানাচুরের গুণকীর্তন করত। এখন আর গান শুনতে পাই না।'

চানাচুর নামে প্রচলিত বা বিখ্যাত যে উপাদেয় বস্তুটি ফকিরার সেই মিক্সচার তিন প্রজন্মের মনোহরণ করেছে। জামশেদপুর থেকে আসবার সময় গুণীজনের হাতে এক প্যাকেট ফকিরা থাকবেই। কলকাতার বন্ধুজন, আত্মীয়-পরিজনের জন্য জামশেদপুরের ভেট। বলতে পারি ফকিরার ধরনটা উজ্জ্বলার চানাচুরের মতো। কিন্তু মশলার তারতম্যে এবং উপযুক্ত প্রয়োগে যে স্বাদ তৈরি হয় সেটা ফকিরার নিজস্ব। বদ্যিনাথ থেকে যেমন সবাই পেঁড়া নিয়ে ফেরে, কিংবা বর্ধমান থেকে সীতাভোগ-মিহিদানা, জামশেদপুর থেকে তেমনি আনতে হয় ফকিরার চানাচুর। কিঞ্চিৎ তীব্র মনে করেন কেউ কেউ। নরম নম্র স্বাদের ভোজ্য বড় সহজে স্মৃতি থেকে মুছে যায়, তীব্র না হলে কি মনে দাগ কাটে?

চানাচুর দিয়ে সারাদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না। কিন্তু সন্ধ্যায় ফকিরার অনুপানসহ চা অথবা প্রখরতর কোনও পানীয়—তার আনন্দ সহজে ভুলতে পারবেন না।

একদিকে লোহার ছাই (Slug) জমে জমে পাহাড়প্রমাণ, অন্যদিকে ডিমনা পাহাড় আর লেক। এদের মাঝখানে ফকিরা আজ এক বৈচিত্র্য এনে দেয়। বাড়ির পাশে, অথচ খবর রাখেন কজন? তাই না কবি বলেছিলেন দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।

বড়ে মিঞা

নবাবী লক্ষ্ণৌ শহরের পুরনো পরম্পরার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সে নবাবও নেই সে লক্ষ্ণৌও নেই। চোস্ত উর্দু তেমন শোনা যায় না। চিকনের নকশা করা ফিনফিনে মলমলের পাঞ্জাবিও বেশি চোখে পড়ে না। সেকালের ঢিলেঢালা জীবনযাত্রা, সাইকেল রিকশার ঘণ্টি আর মোটরের হর্নে ছিন্নভিন্ন, গহরেবাজ টাঙ্গা কবেই অন্তর্হিত হয়েছে। পানের চল এখনও আছে। সাবধান না হলে সামনের লোকটি হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে, মাথা কাত করে পচর করে খানিকটা পিকে আপনার পরিধেয় চিত্রবিচিত্র করে দেবে। পানেরও অবশ্য পতন হয়েছে। সেদিনের মতো তরিবত করে কে পান সাজবে এখন? কার জন্য? শহর লোকে লোকারণ্য।

লক্ষ্ণৌ-এর মোঘলাই খানার রেওয়াজও অস্তমান, তবু অকূল তিমিরে আলোকস্তম্ভের মতো এখনও কয়েকটি মশহুর ভোজনশালা সমঝদার ভোজন-বিলাসীদের তৃপ্তি দেয়। ভর্মা রেস্টুর‍্যান্টের কথা আগে বলেছি। রাম আস্রের কথাও মনে থাকবে। শখাওত সেই শ্রেণীর মানুষ। চতুর্দিকে বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি তাঁর সাধনা সন্তর্পণে রক্ষা করছেন। শখাওত রাম আস্রের মতো প্রাচীন নন। তাঁর ব্যবসাও তত বিস্তৃত নয়। শখাওতকে রসিকজনেরা লক্ষ্ণৌ শহরের বাবুর্চিদের রাজা বলে গণ্য করেন। বছর ত্রিশ আগে তিনি তাঁর ভোজনশালা প্রতিষ্ঠা করেন। দোকানটি লক্ষ্ণৌ-এর প্রাণকেন্দ্র হজরতগঞ্জ থেকে বেশি দূরে নয়। জিমখানা ক্লাবের প্রবেশ দ্বারের কাছে একটি অখ্যাত গলির মধ্যে। একটা গ্যারেজের মতো ঘর নিয়ে দোকান। কোনও সাইন বোর্ড নেই। সন্ধ্যায় স্বল্পালোকিত গলিতে চট করে খুঁজেও পাবেন না। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই হল, বড়ে মিঞার দোকানটি কোথায়। শখাওতকে সমীহ করে অনেকে বড়ে মিঞা বলেন।

বড়ে মিঞার আসর শুধু সন্ধ্যাতেই বসে। আগে বড়ে মিঞা নিজে বসতেন শুনেছি। এখন তিনি আর আসেন না। ছেলে তাঁর স্থান নিয়েছে। বড়ে মিঞা বাড়ি থেকে রান্না করে বড় বড় ডেকচিতে খাবার পাঠিয়ে দেন। এখানে সেই খাবার গরম করে গুণীজনের কাছে পেশ করা হয়। সন্ধ্যার পর দেরি করে গেলে খাবার না পাবার সম্ভাবনা। এমনিতে পদও বেশি প্রস্তুত করেন না বড়ে মিঞা। তার দরকারও নেই। যে খনিতে কোহিনুর পাওয়া যায়, সেখানে কুচি হীরের খোঁজে কে যাবে?

ঘরটির সামনেই উঁচু চুল্লি, রুমালি রুটি বানাবার এবং খাবার গরম করবার জন্য। চুল্লির একপাশে নানা ডেকচি সাজিয়ে বড়ে মিঞার ছেলে বসেন। একজন পরিচারক ভেতরের চার পাঁচটি টেবিলে খাবার পরিবেশন করে। যুধিষ্ঠির শ্রেণীর রসিকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে খাবার কিনে নিয়ে যান। সেদিন গিয়ে দেখি, ছোট ঘরটায় কলি ফেরানো হয়েছে, অয়েলক্লথ ঢাকা টেবিলের বদলে পাথরের টেবিল। পরিচিত পুরনো টিনের চেয়ারগুলি খুব স্বস্তি দিতে পারল না। ভয় হল, তবে কি বড়ে মিঞাও আধুনিকতার কাছে জান দিলেন? খাবার আস্বাদ করামাত্রই ভয় মুছে গেল। বড়ে মিঞা মুহূর্তে আমাকে এই মিটমিটে আলো, অপরিচ্ছন্ন ঘর, ঘিঞ্জি শহর থেকে অন্য লোকে উত্তরণ করলেন।

এখানে সব দিন সব খাবার পাওয়া যায় না। বড়ে মিঞার যেদিন যে ভোজ্য বানাবার মেজাজ হয়, সেদিন সেগুলি আসে। আপনার বিশেষ পদের ইচ্ছা হলে আগে থেকে খবর দেওয়া প্রয়োজন। বড়ে মিঞার মর্জি হলে সেই পদটি করে পাঠাতে পারেন। পাঠাবেন এমন কোনও কথা নেই। বড়ে মিঞা ফরমায়েশের বান্দা নন। তবে পুরনো সমঝদারদের কথা আলাদা। তাঁদের ইশারাই বড়ে মিঞার কাছে আদেশ।

সুখের কথা, এখানের সর্বোত্তম পদটি প্রত্যহ পাবেন। অর্থাৎ, যদি শেষ হয়ে যাবার আগে পৌঁছতে পারেন। পদটি আপনার পরিচিত, শামি কবাব, এখন প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিনা দ্বিধায় বলতে পারি এখানে তার স্বাদে অপরিচিত এক অপূর্ব জগতে পৌঁছবেন। সঙ্গে সামান্য পিঁয়াজ কুচি পাবেন আর একপাত্র ঝাল, টক চাটনি। অপূর্ব এই পদটির দাম সামান্য—প্রতি প্লেটে, দু-খণ্ড, দাম ১.৫০ টাকা। শামি কবাব প্রস্তুত করা সহজ এবং মাংসের কিমার সঙ্গে কিছু পরিমাণ ডালের ব্যবহার হয় বলে, বহু জায়গাতেই ডালের অপপ্রয়োগ হয়। কিন্তু স্বাদের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় বড়ে মিঞার শামি কবাবের আস্বাদ না নিলে বোঝা কঠিন। রুমালি রুটি পাওয়া যায়। দু-তিনটি রুমালি রুটি এবং দু-প্লেট শামি কবাব হলে সাধারণ মানুষের এক সন্ধ্যায় আহার পূর্ণ হবে। সুলভে এত সুখের সন্ধান আমার আর জানা নেই।

রসিক মানুষও দু ধরনের হয়। অনেকে একটি ছবিতে, একটি রাগে কি একটি গানেই মজে যান, আবার অন্য শ্রেণীর রসিক একটু বৈচিত্র্য চান। তাদের জন্য বড়ে মিঞার খড়ে মশালে কি মিট মাংসের কালিয়া বলুন, কোর্মা বলুন, দেখে মনে হবে সেই রকম একটি পদ। কিন্তু জিহ্বা স্পর্শ করেই বুঝতে পারবেন এও আর এক অপরিচিত আনন্দময় জগতে প্রবেশের বাহন। মিঞা সাহেবের ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলাম, পদটির নামের তাৎপর্য কী? এবং কী করে এমন স্বাদের তুঙ্গে উঠল। ছোট মিঞা বললেন, এই পদটিতে কোনও মশলা মিশ্রিত হয় না, যেমন অন্যান্য পদে হয়ে থাকে। এই পদটির রন্ধন রীতি

হল প্রয়োজনীয় মশলাগুলি একত্র করে কাপড়ে বেঁধে মাংসের সঙ্গে সিদ্ধ করা। এই রীতিতে উপকরণগুলি তাদের শরীরের ভার দিয়ে অহেতুক পদটিকে ভারী করে না, বা তার ঝোলকে গাঢ় করে না। বরং, উপকরণগুলির নির্যাস অর্থাৎ প্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করে খড়ে মশালে কি মিটকে সমৃদ্ধ করে। খড়ে মশালা কথাটার অর্থই নাকি তাই। চিরকাল জেনেছি শরীর অপেক্ষা প্রাণ মূল্যবান, কিন্তু মশলার প্রাণ যে এত রসাল রূপে ফুটে উঠতে পারে বড়ে মিঞা না দেখিয়ে দিলে অজ্ঞাত থাকত। খড়ে মশালে কি মিটের দামও বেশি নয়। চার খণ্ড মাংস, ৮ টাকা।

বড়ে মিঞার আসরে বিরিয়ানিও পাওয়া যায়, মটন দাম ৮ টাকা। ভাল, কোনও সন্দেহ নেই। তবে অপরূপ কিছু নয়। তেমনি কোর্মা অনেকের চেয়ে ভাল, ৮ টাকা দাম, খেলে অবশ্যই আনন্দ পাবেন। কিন্তু অমৃতোপম অন্য দুটি পদের পর আমার আর এ সবের স্বাদ নিতে ইচ্ছা করে না। এঁর একটি পদ আমার পরখ করা হয়নি। পূর্বাহ্নে অর্ডার করতে হয়, মুর্গ মসল্লম। আস্ত একটি নবীন মোরগ ৩৫ টাকা। রসিকজনেরা বলেছেন তার তুলনা হয় না। ভাগ্যে বড়ে মিঞা গুণীর তারিফেই সন্তুষ্ট, নইলে নাকি আসমান দাম চাইলেও তাঁরা দিতে আপত্তি করতেন না।
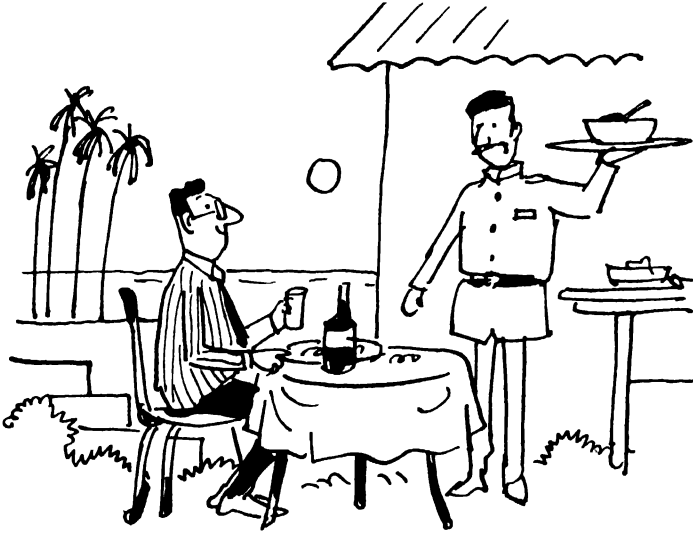
বাকলাভা

আগে নাম ছিল বাইজানটিয়াম, তারপর কনস্টান্টিনোপল, এখন শহরের নাম ইস্তাম্বুল। শহরের বয়স কম করে আড়াই হাজার বছর। বসফরাসের দুই তীরে ছড়ানো ইস্তাম্বুলের এক অংশ ইউরোপে, অন্য অংশ এশিয়া ভূখণ্ডে। ইয়োরোপীয় অংশ ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। সেখানে দোকানবাজারের দাপট, হোটেল আর পনসিয়ানের (ফরাসি উচ্চারণে পাঁসিও) ছড়াছড়ি।

মানুষগুলো সুশ্রী, ভদ্র এবং এরা বোধকরি একমাত্র ইওরোপিয় যারা ভারতীয়দের ভালবাসে। হিন্দি ফিল্মের গানের কলি এখানে মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

ইমানোনু অঞ্চলের জেটি থেকে দিবারাত্র ছোট ফেরি স্টিমার চলে বসফরাসের এপার থেকে ওপার। বসফরাস বড় ব্যস্ত সমুদ্র। ইস্তাম্বুলের বন্দর ছাড়িয়ে বসফরাস দিয়ে উত্তরে গেলে কৃষ্ণসাগর অর্থাৎ ব্ল্যাক সি, যার অপর পারে ইউক্রেন, রাশিয়া।

ইমানোনু থেকে বসফরাস পার হলাম, কুড়ি মিনিটের যাত্রা, সামান্য ভাড়া। যাচ্ছি পুব তীরে কাডিকয় অঞ্চলের হায়দার পাশা জেটিতে। হায়দারপাশা থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটা পথ ক্রমশ উচ্চভূমিতে চড়তে থাকে। মুম্বইয়ের মালাবার হিলের মতো। ক্রমে সমুদ্র ঢেকে দু পাশে গাছপালা ঘেরা বসতবাড়ির সারি। রাস্তাটা আবার নেমে যেখানে সমুদ্রের পাশে পৌঁছল সেই জনপদের নাম মোড়া।

পাশেই একটি ভোজনশালা আমাদের আকর্ষণ করেছিল। কয়েক ধাপ নেমে রেস্টুর্যান্টের বাড়ি। বড় একটা ঘর, আর ছোট লন পেরিয়ে একটা চারচালা। এই মিলিয়ে খাওয়ার জায়গা। আমরা চারচালায় বসলাম। পাশে গুটিকয় উইলো গাছ। ভোজনশালায় বড় ঘরের সামনে দোনার কবাব তৈরি হচ্ছিল। অন্য আরও কোনও পদ আদেশ

করেছিলাম। এবং একবোতল টার্কিশ মদিরা। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, উইলোর সরু পাতাগুলো দুলছে, কাছেই সমুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করছি। মনোমতো ভোজন হয়েছিল।

পরিচারক জিজ্ঞাসা করল মিষ্টান্ন কী নেব? অন্যমনস্ক অলস চোখ বোললাম তালিকার দিকে। যে নামটা আমাকে আকর্ষণ করল তার সঙ্গে পূর্বে পরিচয় হয়েছিল অন্যত্র, অন্য দেশে। পদের নাম বাকলাভা। বস্তুত এই সুস্বাদ মিষ্টান্ন গ্রিসের না তুরস্কের আমি জানতাম না, এখনও জানি না। পরিচারক বলল, বাকলাভার জন্য একটু সময় দিতে হবে। আমাদের কীসের আপত্তি? আমাদের চারপাশে সময় তখন স্থির হয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। আমরাও স্থানু কোনও ছবির অঙ্গ।

অত্যল্পকাল পরেই বাকলাভা পৌঁছল। ঈষৎ তপ্ত প্লেটের ওপর গোলাকার খাজার ধরনে। খাজার মতোই পরতে পরতে, অথবা বুঝি পেস্ট্রির মতো নানা স্তরে। মাঝখানে খানিকটা ক্রিম বা ক্ষীরের সঙ্গে পর্যাপ্ত বাদাম ও পেস্তার কুচি। সুস্বাদের নির্যাস প্রতি পরতে। মুচমুচে, পুরীর খাজার মতো কটকটে নয়। তার ওপর যেন সদ্য-আহূত মধুতে নিষিক্ত। অপূর্ব সে অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। আর ছিল দারচিনি চূর্ণের সৌরভ। মধু, দারচিনি আর খাজার পরতে মিলে স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা। বুঝতে পারলাম ঈষৎ তপ্ত না হলে পদটির সমুচিত মর্যাদা হয় না, তাই সময় লেগেছিল। আরও বুঝলাম উইলো গাছের ছায়ায় এমন একটি পদের জন্য আরও অনেক অনেক সময় অপেক্ষা করাও পরম প্রাপ্তি।
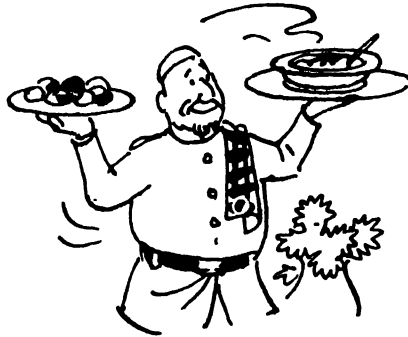
গুজরাটি কড়ি

দাক্ষিণাত্যে যেমন শেষ পাতে রসম ও ভাত খেতে না পারলে আহার কেমন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, গুজরাটে তিমনি কড়ি। কড়ি না হলে আহার সমে পৌঁছয় না। কড়ি প্রস্তুত করবার নানা ধারা আছে। যে-ধারা দক্ষিণ গুজরাটে জনপ্রিয়, উত্তরে তার পৃষ্ঠপোষক নেই বললেই চলে। আমেদাবাদীরা তো আবার বিশেষ শ্রেণীর। তাঁরা কড়িতে একটু মিষ্ট স্বাদ পছন্দ করেন। সকলের গুজরাটে যাবার সুযোগ না হতেও পারে। মুম্বই তবু অনেকের যাতায়াতের ছকের মধে পড়ে। মুম্বই শহরে মারাঠি ও গুজরাটি ঐতিহ্যের সমান্তরাল উপস্থিতি ক্ষীণদৃষ্টি মানুষেরও নজর এড়াবে না। মুম্বইতেও, আক্ষেপের কথা, বিশুদ্ধ গুজরাটি ভোজনশালা বেশি নেই। আসলে গুজরাটিরা আহারের ব্যাপারে খুব বহির্গামী নয়।

যে কটি গুজরাটি, ভোজনশালা এখনও মুম্বইতে প্রতিপত্তির সঙ্গে বিরাজ করছে, তার অন্যতম পুরোহিত রেস্টুর‍্যান্ট। গুজরাটি কড়ি আস্বাদন করতে হলে সেখানে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। গুজরাটি কড়ি এই জন্য বললাম যে কড়ির রকমফের শুধু গুজরাটের অঞ্চল বিশেষে হয় না, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কড়ির স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ আলাদা।

পুরোহিত মুম্বইয়ের অভিজাত পথ বীর নরিমান রোডের ওপর। আগে প্রশস্ত এই পথটিকে চার্চগেট স্ট্রিট বলা হত। মেরিন ড্রাইভে, আজ যার নাম নেতাজি সুভাষ রোড, সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। বীর নরিমান রোডে প্রায় ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের বিপরীতে পুরোহিত। বহুদিন থেকে আছে। বছর চল্লিশ আগে যাঁরা এখানে আহার করেছেন, তাঁরা বলেন তখন এখানে রূপার বাসনে পরিবেশন হত। চার দশক আগের সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নয়। এখন স্টিলের থালাবাটিতে খাদ্যাদি আসে। তাতে স্বাদের কোনও

পরিবর্তন হয়নি। তবে, আপনি যদি যুধিষ্ঠির শ্রেণীর রসিক হন, অবশ্যই রৌপ্যাধারের অনুপস্থিতিতে ক্লিষ্ট হবেন।

আট আনা ভরির রূপার মহার্ঘ রূপান্তরের সঙ্গে পুরোহিতেরও কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। আগে যে ভোজনশালা শুধুমাত্র গুজরাটি আহারে রসিকজনের মনোহরণ করেছিল তাকেও এখানকার আবহাওয়ার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। এখন সেখানে তাই ভোজ্যতালিকায় চিনা এবং পঞ্জাবী পদের সংযোগ হয়েছে। আমি, যেহেতু পুরনো প্রেমিক, নতুন পদগুলির দিকে নজরও দিইনি। ভালমন্দ বলতে পারব না। বহুকাল আগেও যেমন, এখনও তেমনি গিয়েই আনলিমিটেড থালির আদেশ করেছিলাম। আনলিমিটেড অর্থে, যে কোনও পদ আপনি যতখানি চাইবেন, পাবেন। লিমিটেড থালিতে পরিবেশনের পরিমাণ সীমিত। বলে রাখা দরকার, আনলিমিটেড থালিতেও মিষ্টান্নের মাপ বেঁধে দেওয়া, সে পদটি বারবার পরিবেশনের বিধি নেই। লিমিটেড থালির দাম ১১ টাকা, আনলিমিটেড ১৪ টাকা।

ভোজকক্ষ দ্বিতল এবং প্রশস্ত। প্রায় দেড়শো অতিথির আসন আছে। পরিচারকেরা ক্ষিপ্র এবং বিনয়ী। আপনাকে টেবিল পাবার পর অপেক্ষা করতে হবে না। আপনার থালিও অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত হবে। তারও আগে বড় থালার ওপর উজ্জ্বল ধাতুর পাত্রে সাত আট রকমের চাটনি এবং আচার আসবে—পুদিনা-ধনেপাতা, লেবু, আম, তেঁতুল—অম্ল, মিষ্ট, তীব্র, নানা স্বাদের। এবারে থালি পৌঁছবে। বড় উঁচু কানার একটি থালার উপর সাতটি ছোট ছোট বাটি। থালার মাঝখানে ক্ষুদ্রাকার, গুজরাটি বিশেষত্ব, পুরি এবং দুএকটি শুকনো ব্যঞ্জন।

প্রথম বাটিতে ঘৃত এবং হিংযুক্ত অড়হর ডাল, উত্তপ্ত। থালায় আলুর ছোকা। এবারে একটি সিমের তরকারি, হালকা অম্লের স্বাদ আছে, লঙ্কা প্রখর, অল্প ঝোল। তৃতীয় পাত্রে ছোলার ডাল লাউ দিয়ে—আমাদের অপরিচিত নয় কিন্তু সৌরভে স্বতন্ত্র। গুজরাটিরা সিম জাতীয় সবজির বীজ খুব পছন্দ করেন। চতুর্থ পাত্রে মাখন সিমের বড় বড় নরম বিচির তরকারি, খুব হালকা ঝোলে, একটু মিষ্টির ছোঁওয়া পাবেন, কিন্তু রান্না এমন যে সিমের বিচির নিজস্ব স্বাদ অবিকৃত থাকে। পঞ্চম পাত্রে শশার রায়তা, একটু হয়তো ধনেপাতা মেশান এবং সামান্য মিষ্টি। ষষ্ঠ পাত্রে কড়ি।

পুরোহিতের কড়ি মধ্য গুজরাটের ধারার। অতি সামান্য ঝাল। আদা ও হিং-এর সুগন্ধ। বালসরের অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাটের কড়ি হলে পিঁয়াজ রসুনের স্পর্শ থাকত। মহারাষ্ট্রের প্রিয় অম্বামোরে চালের গরম ভাতের সঙ্গে তপ্ত, অম্ল, মিষ্ট, ঝালের আভাস দেওয়া কড়ি ভাল লাগবে। সঙ্গে একটু পুদিনার চাটনির টাকনা। ঘৃতও পাবেন এক চামচ। ঘৃতের সুঘ্রাণের সঙ্গে কড়ির আদা, হিং, লঙ্কা ও জিরার সৌরভ ভাল সঙ্গত করে।

সন্তর্পণে আহার করা বাঞ্ছনীয়। আপনি বোঝবার আগেই তৎপর পরিচারক আপনার খালি পাত্রটি পূর্ণ করে দিয়ে যাবে। এখনও থালার বর্ণনা শেষ হয়নি। পুরির সঙ্গে সেখানে আরও তিনটি পদ ছিল। দু-খণ্ড ঢোকলা এবং ছোট কচুরি একটি। এছাড়া সেঁকা একটি বড় পাঁপড়। থালার সপ্তম পাত্রটি মিষ্টান্নের। গুজরাটিরা এটাই প্রথম পদ হিসাবে গ্রহণ করেন, আমাদের বাঙালি ধারায় আমরা সর্বশেষে তার আস্বাদ নেব। সেদিন ছিল

গুলাবজামুন, স্বাদে কোনও নতুনত্ব ছিল না। আপনি যেদিন যাবেন সেদিন যদি আমরস, কাসুন্দি বা শ্রীখন্ড থাকে, দু একটি ছোট পুরির সঙ্গে অবশ্যই আস্বাদ করবেন। মুহূর্তে অনুভব করবেন গুজরাটিরা এই পদগুলিকে এত মর্যাদা কেন দেন? ইচ্ছা হলে আলাদা যে কোনও পদ মিষ্টান্ন আদেশ করতে পারেন। কিন্তু একটি থালি গ্রহণ করবার পর সামর্থ্যে কুলাবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

সব মিলিয়ে নিটোল তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা হবে। গুজরাটি খানার চরম নিদর্শন পাবেন না পুরোহিতে। যদি রসনালোভন প্রকৃত গুজরাটি ভোজন ইচ্ছা করে থাকেন, আপনাকে যেতে হবে সুরাট অথবা আমেদাবাদ। আমেদাবাদের সাবর রেস্টুর্যান্টের কথা অনিবার্যভাবে মনে আসছে। জলশূন্য, বিস্তৃত সাবরমতীর তীরে বসে এই ভোজনশালায় মধ্যাহ্ন ভোজন, সে আর এক অভিজ্ঞতা। পুরোহিতের বিশেষত্ব, বম্বে শহরের পাশ্চাত্য আগ্রাসন পরাভূত করে এখনও তার কেন্দ্রভূমিতে অন্যান্য প্রলোভনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামনে আপন শুদ্ধ ধারাটি বজায় রেখেছেন। কজন পারে?

রাজজিলিপি

লক্ষ্ণৌ শহরে ক্লার্ক অবধ হোটেলের অষ্টম তলায় কোহিনুর, না পীকক রুমে বিশেষ ভোজের শেষ পদ পরিবেশন হয়েছে—প্রফিটারোলস সঙ্গে ঈষৎ তপ্ত চকোলেট সস। অতিথিরা একাগ্র মনে তার স্বাদ নিচ্ছেন। আশ্চর্য, তবু অনিবার্য ভাবে দিশি মিষ্টান্নের কথা উঠল। গিলৌড়ি, এমনকী এই সভায় অপাঙক্তেয় হবার কথা। সাধারণের দৈনন্দিন মিষ্টান্ন, জিলিপি। অমন উপাদেয় প্রফিটারোলস, অমন গলিত চকোলেটের সুরভি, তবু আমার পাশের অভিজাত দর্শন মানুষটির রসনা স্পষ্ট হল, একটু জড়িত স্বরে বললেন, আহা, গরম জিলিপি প্রাতকালে এক বাটি উত্তপ্ত দুধের সঙ্গে—সে প্রাতরাশের কি তুলনা আছে? তার ওপর সে জিলিপি যদি ফারুকাবাদের বড়বাজার থেকে আনা হয়। (নাকি মোরাদাবাদ বলেছিলেন? আমার মনে নেই। তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ, আমি তাঁর কথা বিশ্বাসই করিনি।)। স্বাদের স্মৃতিতে তাঁর চোখ বুজে এল। বললেন, টকটকে হলুদবরণ, ওজনে এক একটি আধসের। জলেবি নয়, আমরা বলি জলেবা।

বলেছি তো, জিলিপি আধসেরা হয়, হোক না তার নাম জলেবা, আমার ধারণায় ছিল না। মন্ত্রীমশায়রা সব কিছু বাড়িয়ে বলেন, অতিবাদ তাঁদের পেশার অঙ্গ। জলেবাও তাঁর কল্পনার মিষ্টান্ন। আমার পাশের মন্ত্রীমশাইকে আমি একটু অবহেলা করেই চকোলেট সসে নিমগ্ন হলাম। শীতল হলে আবার অত ভাল লাগে না।

অনেক বছর পরে আধসেরা জিলিপির সঙ্গে অচানক সাক্ষাৎ হল, এই কলকাতায়। জাপানে সুমো কুস্তিগিরেরা যেমন অতিশয় স্থূলকায় হলেও, হালকা ভোমরার মতো ক্ষিপ্রগতি, এই আধসেরা জিলিপি পরখ করে দেখলাম গুরুভারে তার স্বাদের বিন্দুমাত্র হানি হয়নি। হয়তো বা বড় বলেই বেশি স্বাদিষ্ঠ। দোকানটির নাম রয়্যাল সুইটমিট

সেলুন। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের পুবদিকের ফুটপাথের ওপর, ভিক্টোরিয়া হাউসের অদূরে। কিন্তু দোকান পেলে কি হবে জিলিপি অত সহজে পাবেন না। প্রথমত এঁরা ছোট কাজে হাত দেন না। অর্থাৎ আধকিলোর কম ওজনের জিলিপি এখানে প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয়ত, জিলিপি কি এমন তুচ্ছ মিষ্টান্ন যে আপনি গিয়ে চাইলেই পাবেন। পেতে হলে পূর্বাহ্নে অর্ডার লিখিয়ে আসতে হবে। তৃতীয়ত, রয়্যাল এক দুটি আধকিলোর জিলিপি তৈরি করেন না। আপনাকে কম করে আড়াই কিলোর অর্থাৎ পাঁচটি জিলিপির অর্ডার দিতে হবে। তবে যদি আপনি পার্শি পপেটি বা নভরোজের মতো উৎসবের দিনের আগে যান, আর দশজনের অর্ডারের সঙ্গে আপনার একটা জিলিপিরও অর্ডার নেওয়া হবে। দুর্লভ জিনিস পেতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে বইকী। কোন দুর্লভ মণি মাটির ওপরে পাওয়া যায়।

রয়্যালের জিলিপির সঙ্গে পরিচয় হওয়ামাত্র আপনি মোহিত হবেন। আমি যেমন হয়েছিলাম প্রথম পরশনে। গলিত স্বর্ণের রং, অন্তঃশীল রসে পূর্ণ, নরম অথচ মুচমুচে—পরম উপাদেয় এই পদার্থ যে কলকাতা শহরেই পাওয়া যায় আমি জানতাম না। ২২ টাকা কেজি। এক একটি জিলিপি ৫০০ গ্রাম ওজন, ৮ ইঞ্চি ব্যাস, ওপরে দু-চার দানা চিরঞ্জি ছড়ানো, ১১ টাকা দাম। সুন্দর বাক্সে ভরে দেবে। দেবেই তো। দোকানে দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না, একা শেষ করাও সম্ভব নয়। বাড়িতে এনে তিন-চারজন মিলে একজন সুপুষ্ট সুরভিত পরম সুস্বাদু জিলিপির সদ্ব্যবহার করবেন। এই দোকানে আর একটি উপাদেয় পদ পাবেন। মালাই খাজা।

কলকাতায় জিলিপির আনন্দ লাভের আরও গুটিকয় স্থান আছে। শরৎ বসু রোডের ওপর গুজরাতি দোকান, অন্নপূর্ণার কথা পূর্বে লেখা হয়েছে। অন্নপূর্ণার জিলিপিও সমান মোহময় এবং দামে একটু কম, ১৯ টাকা কেজি। ১০০ গ্রামে দুটি তিনটির বেশি হবে না। এ শহরে অন্যতম জিলিপির শিল্পী হলেন রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের ওপর জুনিয়র ব্রাদার্স। গুপ্ত ব্রাদার্সের পাশে। এঁদের ঘৃত সুরভিত লোকশিল্পীর হাতের আলপনার মতো, মাঝারি আকারের জিলিপিরও তুলনা কম পাওয়া যাবে। প্রতি কেজি ২০ টাকা। প্রতি খণ্ড ৫০ পয়সা। জুনিয়রে যদি যান জিলিপির নিমন্ত্রণে, এঁদের ছোট কচুরিকেও একটু রসনাতে স্থান দেবেন। স্বাদ প্রাণে গিয়ে পৌঁছবে। অতি ক্ষুদ্র কচুরি, ৪০ পয়সা। সঙ্গে আলুর সাদা তরকারি। সকাল সকাল যাবেন। একটু বেলা হলে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে।

প্রকৃত ঘৃতপক্ক জিলিপির অন্য বিখ্যাত দোকান হল বড়বাজারে সত্যনারায়ণ পার্কের তিওয়ারি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। স্বাদ অবশ্যই উঁচু দরের, দামও সর্বোচ্চ। প্রতি কেজি ২৪ টাকা। প্রতি খণ্ড ৮০ পয়সা। দাম কিন্তু সাধারণকে নিরস্ত করতে পারেনি। সকালবেলা দোকানের সামনে লাইন পড়ে যায়। দাঁড়াতেও হয় কিছু সময়। তপ্ত জিলিপির আনন্দ আপনাকে মুহূর্তে অপেক্ষার লজ্জা ভুলিয়ে দেবে। লাইনের কথা উঠলে, কালিগুদামের জিলিপিওলার কথা অবশ্যই বলতে হয়। তা ছাড়া এঁদের জিলিপিও অপূর্ব। মহাত্মা গান্ধি রোড দিয়ে রবীন্দ্র সরণি পার হয়ে ডানদিকের গলি মল্লিক স্ট্রিট। সে গলিতে ঢুকেই ডানদিকে জিলিপির দোকান। নাম নেই। নামের দরকারও নেই। সকালবেলাই একসার

লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেলা ন'টার আগে ভিড় কমে না। কমে, যখন জিলিপির সময় শেষ হয়। আপনি যতই জিলিপি কিনুন, এক কেজি, দু-কেজি, বা একটি দুটি, আপনাকে লাইনে দাঁড়াতেই হবে। সামনেই একজন লোক, পরিত্রাহি ফুটন্ত তেল না ঘৃতের কটাহে জিলিপির আলপনা রচনা করছে, আর একজন পাশের ঘন রসের কড়ায় তাদের সিঞ্চিত করছে। দু জনের হাতের কাজের বিরাম নেই। যে শেঠ হাতে জিলিপির প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে পয়সা নিচ্ছেন, তাঁরও না। অনেকে ওখানে দাঁড়িয়ে সুখের আস্বাদ নিচ্ছেন। একটি জিলিপির দাম ৬৫ পয়সা। সঙ্গে ৩৫ পয়সার বেসমের ভুজিয়া। পরম পরিতৃপ্তিকর প্রাতরাশ সেরে যে যার কাজে চলে যাচ্ছেন, আবার আর একদল এসে দাঁড়াচ্ছেন। আগেই বলেছি দোকানের নাম জানি না। ক্রেতাদের কেউ জানেন না। তাঁরা জানেন কালিগুদামের জিলিপি। এই জিলিপির স্বাদে একটু প্রভেদ আছে। অন্য খ্যাত জায়গার জিলিপির মতো পরম সুস্বাদু অবশ্যই, কিন্তু অন্যত্র যেমন নরম এবং মুচমুচে, এখানে ঈষৎ কম নরম এবং মুচমুচে। অনেকে নরম সামান্য কম হওয়ার দরুন এই দোকানের জিলিপি বেশি পছন্দ করেন। দামও ঈষৎ অনুকূল, ১৬ টাকা কেজি।

সকলেই জানেন জিলিপি অভিজাত মিষ্টান্ন জগতে অপাঙক্তেয় হলেও আনন্দ সঞ্চারে যে কোনও মিষ্টির সমকক্ষ। কিন্তু কালিগুদামে না গেলে জানতে পারবেন না জিলিপির প্যাঁচ এত মধুর হতে পারে।

লক্ষ্ণৌ তাশকেণ্ট

লক্ষ্ণৌ শহর এখান থেকে বহুদূর। শতরঞ্চকে খিলাড়ি আমাদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর সামান্য পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তা বলে শহরটা আমাদের একেবারে অপরিচিত কোনও সময়েই ছিল না। এমনিতেই কর্মসূত্র ছাড়াও বাঙালি ভ্রাম্যমানের গতি সর্বত্র। বরং বলা যেতে পারে কর্মসূত্র ছাড়া আর সব অনির্দিষ্ট কারণেই বাঙালি দেশভ্রমণ পছন্দ করে। পূজার সময় কাশ্মীরে যত যাত্রী যায়, তার আশিভাগ নাকি বাঙালি। কাশ্মীরি দোকানদারেরা এই সময়টাকে বলে, বেঙ্গলি সিজন।

লক্ষ্ণৌতে যাঁরা গেছেন, যাবেন বা মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন, তাঁরা অনেকেই ভর্মা রেস্টুর‍্যান্ট চিনবেন না। নবাবি শহর, এখনও হাওয়াতে বিলাসিতা আর আলস্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। খানদানি জিনিস না হলে কেউ গ্রাহ্য করে না। ভর্মা রেস্টুর‍্যান্টের বয়স মাত্র চল্লিশ বছর, যে শহরে রাম আস্রে মিষ্টান্ন বিক্রি করছে ১৭৭ বছর। তবে কী জানেন, সুখাদ্যের খ্যাতি চাঁপাফুলের মতো, ফুটলেই সুগন্ধে রসিকদের মাতিয়ে দেয়, চেপে রাখা যায় না। গাছ কতদিনের পুরনো জানার দরকার হয় না।

ভর্মা রেস্টুর‍্যান্ট তাই বয়সে অর্বাচীন হলেও গুণীজনেরা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গুণীজনদের আবার জাদুকরদের মতো একটা দুর্বলতা আছে, নিজে কী জানেন সবাইকে সহজে বলে দিতে চান না। তাই লক্ষ্ণৌ শহরে বারকয়েক যাতায়াত করবার পর আমি ভর্মা রেস্টুর‍্যান্টের সন্ধান পাই। সাধারণ লোকের সন্ধান পাবার কথাও নয়। সাইনবোর্ড নেই। দু পাশে দরজায় বা কাচে কিছু একদা লেখা ছিল, এখন পাঠোদ্ধার করতে হলে পি সি সরকারের এক্স-রে চক্ষু প্রয়োজন হবে। ভোজনশালাটি জনবহুল কাইজারবাগ অঞ্চলে, বিশ্বেশ্বরনাথ রোড থেকে একটু ভেতরে যেতে হয়। ন্যাশন্যাল

হেরাল্ডের অফিসের কাছে বললে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। বড় রাস্তার ওপর টায়ার মেরামতের দোকানের সারি। যে গলিতে ভর্মা রেস্টুর‍্যান্ট, সেখানে গাড়ি মেরামতের কারখানা, গুদামঘর, দর্জির দোকান ইত্যাদি বিবিধ অপ্রাসঙ্গিক জিনিস।

দোকানে ঢুকেও আপনার খুব স্বস্তি হবে না। মনে হবে এ-জায়গা তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। যে লোকটি ক্ষুদ্র ক্যাশবাক্স নিয়ে সামনে বসে থাকে, সেও খুব উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবে এমন নয়। ঈষৎ মাথা দুলিয়ে আপনাকে ডানদিকে দু-ধাপ নেমে যাবার ঈঙ্গিত করবে। সামনেই একটা ছোট ঘর, দুটো বড় টেবিল। জন পনেরো-ষোলো বসতে পারে। খাদ্যতালিকা চাইবেন না। ও সবের এরা নাম শোনেনি। কী এখানে পাওয়া যায়, তা যদি না জানেন, তা হলে এখানে এলেন কী করে? কেন?

আমি যত দূর জানি এঁরা ছ'টি বা সাতটি পদ প্রস্তুত করেন। সব সময়ে অবশ্য প্রস্তুত থাকে না। যে পদটি এখানে সর্বোত্তম এবং অতুলনীয়, সেটি অবশ্যই পাবেন। অন্যান্য পদের স্বাদ নিতে হলে আগে টেলিফোন করে জানিয়ে রাখা ভাল। সময় থাকতে জানালে তবেই কাজ হবে। কারণ, খাবার এখানে একেবারেই রান্না হয় না। মালিকের বাড়িতে প্রস্তুত করা খাবার দুপুরে ও সন্ধ্যায় দোকানে আসে। আপনি পৌঁছলে যে তাড়াতাড়ি আপনার জন্য কিছু তৈরি করে দেবে সে ব্যবস্থা নেই। আসলে তেমন ব্যবস্থায় দোকানের প্রতিষ্ঠাতা ভর্মাসাহেবের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি নিজে রন্ধনকুশলী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যে ছেলে ভোজনশালা চালান, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে ভোজনশালার জন্য প্রত্যহ খাদ্য প্রস্তুত করেন। পেশাদার শেফ বা বাবুর্চি কোনও দিন ভর্মা রেস্টুর‍্যান্টে নিযুক্ত হয়নি। এত মোঘলাই খানার নাম শুনেছি, উত্তরপ্রদেশে রঈস ভদ্রলোকেরা কথায় কথায় মুসলমান বাবুর্চির নাম নেন জপমন্ত্রের মতো, সেই রাজ্যে হিন্দু ক্ষত্রিয় এবং তাঁর পরিবারবর্গ নবাবি লক্ষ্ণৌ শহরের বুকে বসে মুসলমান বাবুর্চির নাক কাটছেন—এ না আস্বাদন করলে আপনার বিশ্বাস হবে না।

যে পদটির জন্য এই ভোজনশালার খ্যাতি, তার নাম হল তাশকেণ্ট কবাব। নাম শুনে ন্যায্য অনুমান করেছিলাম এই পদটি মধ্য-ষাটের দশকের সংযোজন। আমি অন্তত ভারত-পাক যুদ্ধের আগে তাশকেণ্টের নাম শুনিনি। প্রতিষ্ঠাতা ভর্মাসাহেব গত হয়েছেন। তাশকেণ্ট কবাবের সঙ্গে ওই নামের শহরের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানা হল না। তবে, যদি থাকে তা হলে বুঝব আমার ভূগোলের জ্ঞান লজ্জাকর, তাশকেণ্ট রাশিয়ার নয়, স্বর্গের কাছাকাছি কোনও শহর হবে। নইলে এমন কবাব হয়? চিলতে করে মেদশূন্য মাংস কেটে, তাকে রোমাঞ্চকর কোনও মশলায় মথিত করে রোল করলে তাশকেণ্ট কবাবের অবয়ব তৈরি হয়। কিন্তু তার প্রাণ কী দিয়ে সৃষ্টি, যা আপনার প্রাণে বহু দিন অনুরণন করবে, সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এখনও কবাব তৈরি শেষ হয়নি। ওই রোলের ওপরে ও নীচে দুটি মাঝারি সাইজের পিঁয়াজের চাকতি বসিয়ে, সুতো দিয়ে বেঁধে বেক করা হয়, কিংবা ভাজা হয়, কিংবা আর কিছু, যার ফলে পিঁয়াজের চাকতি দুটি আর পিঁয়াজ থাকে না কবাবের প্রাণের

সঙ্গে মিশে যায়। সম্মোহিত অবস্থায় মনে হয়েছিল ঈষৎ জাফরানের সৌরভ পেয়েছিলাম, নাকি পারিজাতের? যুবক ভর্মা বললেন এই পদটি তাঁর বাবার উদ্ভাবন। বেশি বড় নয়, ছোট শামি কবাবের মাপের। গোটা ছয় অনায়াসে খাওয়া যায়। একটির দাম ১২৫ টাকা। সঙ্গে রুমালি রুটি—২৫ পয়সা।

ভর্মার অপর বিখ্যাত রচনা হান্ডি মিট। ছাগমাংসের হয়, মুরগিরও। আমার পক্ষপাত হান্ডি মটন। শুনলাম মাটির হাঁড়িতে ঢাকনা সীল করে হালকা আঁচে কয়েকঘণ্টা ধরে রান্না করলে তবেই নাকি এই পদটির বিশেষ স্বাদ আসে, অজানা এক সুগন্ধের সৃষ্টি হয়। হবেই তো। শুনেছি, মুনি-ঋষিরাও নাকি দীর্ঘকাল অন্ধকার গুহায় নিস্তব্ধ তপস্যা করে তবেই অসীমের স্বাদ পেতেন। হান্ডি মিট ওজন দরে পাওয়া যায়। এক কিলোর হান্ডি, মুরগি বা মাংস, ৪৫ টাকা। চারজনের পক্ষে পর্যাপ্ত।

এঁদের আরও একটি পদ স্মরণযোগ্য। রাং মুসল্লম। অর্থাৎ, একটি ছাগশিশুর আস্ত পা—উত্তমরূপে রন্ধন করা অবশ্য। এই পদটিতে মাংস অতি কোমল হয়, স্বাদেও অনির্বচনীয়। দাম ৪০ টাকা। তাশকেণ্ট কবাবের পর হয় হান্ডি মিট অথবা রাং মুসল্লম—দুটো একসঙ্গে এক আসনে হবে না।

পরিচিত রোগন যোশ, বিরিয়ানি ও অপরিচিত ভুনা মীট পাবেন—৬ টাকা প্লেট। ভাল। কিন্তু যুবতী রসিকা তিলোত্তমা নায়িকার সঙ্গে যার প্রণয় হয়েছে, সে কি চটুলা পরিচারিকার দিকে নজর দেয়? আপনিও দেবেন না। একটা অন্য জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

সৌরাষ্ট্রীয়

জনৈক খাদ্যরসিক সেদিন কোনও কাগজে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, সে খাওয়া গেল কোথায়? রসবড়া বা চিতুই পিঠা, অথবা মাছ-পাতুরি, বা তেলকই, বাংলার এ সব কৃতি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। মা দিদিমারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও গত হবে। বাংলা খাবারের ভোজনশালাও নেই তেমন, যে ওই সব বিখ্যাত পদ অভয়ারণ্যের আশ্রয় পাবে। বাংলা সুখাদ্যের চলই কেমন যেন থেমে যাচ্ছে। এটা কি আমাদের আধুনিকতার লক্ষণ? অন্য আধুনিক সমাজে কিন্তু পুরনো জিনিসের অক্ষয়প্রতিষ্ঠা। পঞ্জাবি আহার শুধু নয়, তাদের নাচ-গানও জাতীয় শ্রেণীতে উন্নত হয়েছে। অথবা ধনাঢ্য মুম্বই শহরে দেখুন, গুজরাতি বা মারাঠি ভোজ্যের সসম্মান অবস্থান। বাড়ি থেকে অবশ্যই অনেকে বিদায় নিয়েছে। কে ভোরবেলা সুরাটের শীতের মাঠ থেকে গমের কড়িগুলি এনে সুদীর্ঘকাল কাঠের আগুনে মাটির হাঁড়িতে পোংখ রন্ধন করবে? কার অত সময়? কিন্তু মুম্বইয়ের সাধারণ ভোজনশালায় পোংখ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে মারাঠিদের ভাখরি ও ঝুনকা। কিংবা গুজরাতি উধিয়া, অথবা পার্সি পাতরালি মচ্ছি।

মুম্বইতে অভাবনীয় কিছু নয়, তবু নিউ আরাম কচ্ছি রেস্টুর্যান্ট আমাকে চমকে দিয়েছিল। ভোজনশালার অপরিসর কক্ষে স্বল্প আলোয় মনে হবে বুঝি কচ্ছের কোনও বাড়িতে বসে খাচ্ছেন। পরিচারকদের পরিধানে কচ্ছের সেই বিচিত্র পোশাক—চুড়িদার পাজামা আর ছোট মেয়ের ফ্রকের ধরনের কামিজ। মাথায় পাগড়ি। কিন্তু পোশাক দিয়ে ভোলাবার দরকার নেই নিউ আরামের। এখানে ভোজ্য শুধু বিশ্বস্ত কচ্ছি নয়, হৃদয়হারীও।

মাহিম বাস ডিপোর কাছে, মাহিমের জাগ্রত গির্জার পাশে নিউ আরাম। জায়গাটা

একটু নিরিবিলি। আশেপাশে বিশেষ দোকানপাট নেই। এখানে রেস্টুর‍্যান্ট জমবার কথা নয়। তার মানে, শুধু খাবারের গুণেই নিউ আরামের এই রবরবা। তাই বা বলি কী করে, বহু বছর ধরে আদি দোকান আরাম রেস্টুর‍্যান্ট চৌপাটির ওপর বসে আছে, তার বিশেষ খ্যাতির কথা কোনওদিন শুনিনি। অথচ নিউ আরামে যান, সেদিনের দোকান, একই মালিকের, বছর দুই মাত্র বয়েস, বসার জায়গা পাবেন না। খাবার ঘরে বড় ভিড় হত। এখন তাই অন্য নিয়ম করা হয়েছে। ভোজনকক্ষের দরজা বন্ধ থাকে, আসন যেমন যেমন খালি হয়, অপেক্ষমান অতিথিদের ভেতরে ডাকা হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে অবশ্য কোনও দিনই আপনার ডাক পড়বে না। গিয়েই প্রথম কাউন্টারে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। তারপর সামনের বারান্দায় অপেক্ষা। সময় হলে আপনার ডাক পড়বে। যতক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করছেন, কিংবা একটু বসবার জায়গা সংগ্রহ করেছেন, বিনামূল্যে শীতল জিরা-পানি পাবেন, যতবার আপনার ইচ্ছা। এটা এই দোকানের বিশেষত্ব। শুনেছি জিরাপানি নাকি ক্ষুধাবর্ধক। গুজরাতি দোকানের মালিক, স্বভাবতই ব্যবসা বুদ্ধি প্রখর, নিঃশুল্ক জিরাপানি বিতরণের উৎস শুধু হৃদয়ের ঔদার্য না হতেই পারে। অতিথিদের ক্ষুধাবৃত্তির প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যই মালিকের সমৃদ্ধি।

আপনি যদি বিচক্ষণ ভোজন-রসিক হন, আপনার জঠরাগ্নি গনগনে করেও আপনার ভোজনের বিল বাড়াতে পারবেন না দোকানের মালিক। কারণ, আপনি আদেশ করবেন থালি। অর্থাৎ আলাদা আলাদা বিভিন্ন পদ আদেশ না করে আপনি নির্দিষ্ট পদ থালি চাইবেন। আলাদা আলাদা পদ নির্বাচন করাও সহজ নয়। দেখবেন, রুটি বা তার বড় ভাই রোটলাই আছে সাত প্রকারের। থালির দাম ১৫ টাকা। তার ওপর শতকরা দশটাকা ট্যাক্স লাগবে। মোট সাড়ে ষোল টাকা। এই দামে যা পাওয়া যাবে, দু-একদিন উপবাসের পরও তার সম্যক সদ্ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন।

পরিবেশন অতি দ্রুত। আপনি আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় থালায় ছোট ছোট স্টিলের বাটিতে দশ বারো রকমের আচার ও স্যালাড আসবে। সঙ্গে কিছু পাঁপড়। অত্যল্পকালের মধ্যে একটি আরও বড় থালায় কয়েকটি বাটি সুদ্ধ বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন উপস্থিত হবে। সেই থালাতেই একটি ছোট রেকাবে খাণ্ডকি দুখণ্ড ফরসান অর্থাৎ ভাজাভুজি। হয়তো পাবেন একটি কচুরি এবং একটি ঢোকলা, অথবা এক খণ্ড খাণ্ডকি ও একটি সিঙাড়া। রুটি নেবেন না পুরি, পরিচারককে বলে দিতে হবে। তারপর পাত্র খালি হবার অবসর নেই, আপনি বলবার আগেই উত্তপ্ত রুটি অথবা পুরি পরিবেশিত হবে। বাজরায় তৈরি মোটা রোটলাও থাকবে। সকলের বাজরা ভাল লাগে না। তবে প্রথমে খেতে ভালই লাগবে। সঙ্গে গুজরাতি পাঁচমিশেলি ডাল। গুজরাতি হিং-সুরভিত ডালে একটা মনোহারী অম্ল-মধুর স্বাদ থাকে। একপাত্র কড়ি আসে থালির সঙ্গে। কচ্ছি কড়ি মধ্য বা দক্ষিণ গুজরাতের কড়ির মতো মিষ্টি নয়। একটু প্রচ্ছন্ন লঙ্কার বা মরিচের ঝাঁঝ থাকে। কড়ি অবশ্য গরম ভাত ও ঘৃত সহযোগে প্রশস্ত। এবারে সবজির দিকটা দেখা যাক। পাঁচটা সবজির পাত্র ছিল, আমি যেদিন আরামে গিয়েছিলাম। বেগুনের ভর্তা, পঞ্জাবি ভর্তার ধরনের, তবে অতটা উগ্র নয়, ধনেপাতা বোধহয় থাকে না। কড়াইশুঁটি, নির্মল, হালকা ঝোলে। চিচিঙ্গা জাতীয় অতি কোমল একটি সবজি,

কাঁচালঙ্কার সুগন্ধ এবং ঘৃতের। গুজরাতিতে এই সবজির নাম কাঠল। এবারে, আর এক পাত্রে ছোলা। পঞ্জাবি ছোলার মতো নয়। আরও অনেক বড় আকারের ছোলা, মশলা একেবারেই উগ্র নয়, ভাসা ভাসা জিরার গন্ধ পাওয়া যায়। সবজির শেষপাত্র আলু টমাটো। বড় বড় আলুর খণ্ড টমাটোর রসে সিক্ত। সতর্ক না থাকলে আপনার কোনও একটি পাত্র শূন্য হওয়া মাত্র সহসা আবির্ভূত পরিচারক পুনরায় পূর্ণ করে দেবে। এই পদগুলি অতিক্রম করে আপনি খিচড়ায় আসবেন। আমাদের খিচুড়ির সগোত্র। ঘৃত নিষিক্ত। কচ্ছি খিচুড়িতে কিছু খোলাসুদ্ধ আস্ত ডালও মেশানো হয়—সেই ডাল সুসিদ্ধ হলেও একেবারে চরিত্র হারায় না, খিচড়ার স্বাদে ও স্পর্শে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করে। খিচড়ার পরে যখন আমাকে কড়ি খাবার জন্য ভাতের প্রস্তাব করা হল, তখন আমার অন্য কোনও কিছুই আস্বাদ করবার অবস্থা ছিল না।

থালিতে মিষ্টান্ন থাকে না। সুতরাং, যদি সামর্থে কুলায় একটু মিষ্টান্ন আস্বাদন করবেন। গুজরাতে তিনটি মিষ্টান্ন বিশ্রুত। শ্রীখণ্ড, বাসুন্দি ও আমরস। এক পাত্র চার থেকে পাঁচ টাকা। শ্রীখণ্ড, বলা যেতে পারে জলশূন্য দই, অম্লমধুর, পুরি সহযোগে উপাদেয়। বাসুন্দি আমাদের ক্ষীরের মতো, অপেক্ষাকৃত তরল, বাদাম পেস্তার কুচিতে অলঙ্কৃত। গ্রীষ্মকালের মিষ্টান্ন আমরস। দুগ্ধ-মিশ্রিত আম্ররস। সামান্যও ক্ষুধা থাকলে, আপনার ভাল লাগবে। গুজরাতিরা গ্রীষ্মে আমরস বিনা ভোজন কল্পনা করতে পারেন না। কানু বিনা বৃন্দাবন কি ভাবা যায়? আমরসের স্বাদ নাকি আরও রসনালোভন হয় একটু ঘৃত মেশালে। অভাবে তৈল। আপনার পছন্দ হল না? সাধে বলেছে, ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

মালাই পান

জনি ওয়াকার স্কচ হুইস্কির প্রবর্তন হয়েছিল ১৮২০ সালে লেবেলেই লেখা থাকে। এই হুইস্কির বিজ্ঞাপনে একটি মনোরম লাইন ব্যবহার হয়, স্টিল গোয়িং স্ট্রং, অর্থাৎ এখনও সতেজ চলেছে। এমন কথা আর ক'জন বলতে পারেন জানি না। জোর গলায় বলতে পারেন লক্ষ্ণৌয়ের মোদক রাম আস্রে। রাম আস্রে অর্থাৎ রাম আশ্রয়ের অপভ্রংশ। এই মিষ্টান্নের দোকানটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮০৫ সালে, মানে ১৭৭ বছর আগে। এখনও সগৌরবে চলেছে।

দোকানটি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। আজকের কর্মকেন্দ্র নতুন লক্ষ্ণৌ থেকে বেশ দূরে। গোমতীর ভঙ্গুর বাঁধ পাশে রেখে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। বাঁদিকে সিপাহিবিদ্রোহখ্যাত রেসিডেন্সি ছাড়িয়ে, ইমামবড়া পার হয়ে লোকারণ্য চৌক অঞ্চল, যা একদা এই শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল, সেইখানে যদি পৌঁছানোও যায়, বানওয়ালি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, আগন্তুকের পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু অত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই হল। সুনাম সুগন্ধের চেয়ে প্রবল, বানওয়ালি গলির যতই অভ্যন্তরে হোক শহরবাসী মাত্রেই জানে। গলাটাও কাশির গলিরই মতো আঁকাবাঁকা, সরু। দোকানের চেহারাও মনে রাখবার মতো নয়। কিন্তু একবার গিলৌড়ির আস্বাদ পেলে, আর ভোলবার নয়।

দোকান যদিও ওয়াজেদ আলি এবং সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত, গিলৌড়ি কি তখনই প্রচলিত ছিল? শৌখিন নবাব ওয়াজেদ আলি বা ইংরেজ রেসিডেন্ট কি গিলৌড়ির স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন? প্রতিষ্ঠাতা রাম আস্রে ও লালা তুলসীরামের বংশের পঞ্চম পুরুষ, যাঁরা এখন দোকানের মালিক, তাঁরা বলতে পারলেন না। গিলৌড়ি

সুপ্রাচীন সন্দেহ নেই, কিন্তু বয়সটা স্থির করা গেল না। সফল শিল্পীর একটা আত্মাভিমান আছে। তাঁর কাছে নবাব ওয়াজেদ আলি আর সামনের বাড়ির বড়ে মিঞার সমান আদর—বিশেষ করে তাঁরা যদি রসিক হন।

সিপাহী বিদ্রোহের অল্পকাল পরে ১৮৬৮ সালে কলকাতায় নতুন মিষ্টান্ন সৃষ্টি করেন নবীনচন্দ্র দাস, বাগবাজারে। কিন্তু সেই গৌরবময় দোকানটি আর নেই। রসগোল্লার ঐতিহ্য তবু বজায় রেখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বা কে সি দাস—নবীনচন্দ্রের ছেলের নামে যে দোকান। মনে হয় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ মিষ্টান্ন জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ এই সময়েই লেডিকিনির প্রবর্তন হয়। লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রীর নামকে চিরস্থায়ী করে যে উদ্ভাবক এই পরম স্বাদিষ্ঠ পদটির রচনা করেছিলেন তাঁর নাম কবেই ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। এই সব মিষ্টান্নের আগে এদেশে দু-এক প্রকারের সন্দেশ ও পান্তুয়ার প্রচলন ছিল। খাজা, তিলকুট, চন্দ্রপুলি আরও পুরাতন, কিন্তু কালজয়ী হয়ে এখনও তাদের রাজত্ব ছাড়েনি। স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ক্ষীরের খাবার আরও পরের সংযোজন।

গিলৌড়ির প্রধান উপকরণ ক্ষীর। কিন্তু বড় শিল্পীর তুলিতে রং যেমন আর রং না থেকে ছবি হয়ে দাঁড়ায়, গিলৌড়ির ক্ষীরও প্রস্তুত হবার পর আর শুধু পরিচিত ক্ষীর থাকে না, কোনও অপার্থিব স্বাদের আভাস দেয়। গিলৌড়ি অনেকটা সাজা পানের আকারের বলে কেউ কেউ বলে থাকেন মালাই পান। কিন্তু রসিকেরা গিলৌড়িই চেনেন। তাঁদের কাছে মালাই পান নামটা অপাংক্তেয়। আসলে গিলৌড়ি দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা সিঙাড়ার আকারের—পশ্চিম উপকূলে পার্শি গুজরাতিদের সিঙাড়া যেমন, সেই আকৃতির। কিন্তু আকার নিয়ে কী হবে? স্বাদের কথা বলি।

গিলৌড়ির ভেতরের পুরে ক্ষীরের সঙ্গে কিছু বাদাম মেশানো হয়, কুচি করে। আগে হয়তো পেস্তাও থাকত। সেই পুরকে হালকা একটা আস্তরণে মুড়ে, মালাই বা দুধের সর হয়তো, ঘিয়ে ভেজে রসসিক্ত করা। লক্ষ্ণৌ-এর গুণীরা বলেন, খাবারটা বড় নাজুক; অর্থাৎ পেলব, কোমল। উত্তরপ্রদেশের খোওয়া ক্ষীরের মিষ্টান্নাদির মতো নয়, যা প্রায় দু-এক পুরুষ ধরে খাওয়া যায়। গিলৌড়ি বড় ক্ষীণজীবী, একটু গরম পড়লে সহজে নষ্ট হয়ে যায়। সব নামী ছবির যেমন নকল হয়, হঠাৎ পয়সা হলে মানুষ যেমন তাই কিনে বাড়ি সাজায়, গিলৌড়িরও অনেক নকল হয়েছে। লক্ষ্ণৌতি অন্য দু-একটা দোকানে পাওয়া যায়। দু-এক জন লোক তাই খেয়ে মুগ্ধও হয়। কিন্তু আসলের স্বাদ না পেলে তাঁরা জানতে পারবেন না, কী তাঁরা হারাচ্ছেন। কারণ আদি রাম আস্রের গিলৌড়ির স্বাদ অন্য জগতের। বিশ্বাস না হয়, একটা স্বাদ নিয়ে দেখবেন। যদি দূরত্ব স্বীকার করে রাম আস্রেতে পৌঁছতে পারেন, যদি সেখানে গিয়ে গিলৌড়ি আদেশ করেন, প্রথমে ধোওয়া শালপাতার ওপর আপনাকে একটি গিলৌড়ি দেওয়া হবে পরখ করে দেখবার জন্য, বিনামূল্যে। রসিকজনেরা শিউরে ওঠেন, ১৭৭ বছর পার হবার পর এখনও রাম আস্রের খাবার পরখ করতে হবে? লজ্জার কথা। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সহবত এমনই। যে কোনও খাবার চাইলে, যদি প্রতিষ্ঠিত দোকান হয়, আপনাকে অবশ্যই একটু চাখতে দেবে। এটাই ভাল দোকানের রেওয়াজ, রীতি।

রাম আস্রে আমায় প্রথম দিনে গিলৌড়ি ছাড়া আরও বহুবিধ মিষ্টান্ন পরখ করতে দিলেন। বিবিধ ডালমুঠের কয়েক মুঠোও পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের এত সুনাম কেন? দোকানদার লাজুক হেসে বললেন, হুজুর, ঈশ্বরের দয়া আর কুয়োর জল। দুই বস্তুর সম্পর্কটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। দোকানদার বুঝিয়ে দিলেন, এবং দেখালেনও দোকানের মধ্যেই একটি কুয়ো। সেই কুয়োর জলে চিনির রস প্রস্তুত বলে, গিলৌড়ির স্বাদের বিশিষ্টতা। বুঝতে বিলম্ব হল না। স্কচ হুইস্কির নকল আজও চলেনি, শুনেছি, ওই জলের জন্য। জাপানিরা প্রযুক্তি বিদ্যায় ও নকলে যতই কুশলী হোক, তারাও আনতে পারবে না স্কচের স্বাদ জাপানি হুইস্কিতে। কোথায় পাবে স্কটল্যাণ্ডের সেই জল, যা নাকি বিধাতা শুধু স্কচ হুইস্কি প্রস্তুত করবার জন্য তৈরি করেছিলেন। এছাড়া দোকানদার বললেন, তাঁরা কারখানার চিনি ব্যবহার করতেন না, দেশি খণ্ড চিনি ছাড়া ভাল মিষ্টি তৈরি করা কি সম্ভব!

গিলৌড়ির দাম খুব বেশি নয়। ৫০ টাকা কেজি। যদি কেশর বা জাফরানের সৌরভ আপনার পছন্দ হয়, কেশর গিলৌড়ি পাবেন, ৭০ টাকা কেজি। এক এক কেজিতে ৪০/৪৫ খণ্ড গিলৌড়ি ওঠে।

অলস রসিকদের জন্য একটা সুখবর আছে। গত বছর, ১৭৬ বছর পরে এত দিনে রাম আস্রে শহরে নতুন শাখা খুলেছেন। হজরতগঞ্জে নওলকিশোর মার্গে প্রশস্ত ঝকঝকে নতুন দোকান। রসিকেরা অবশ্য বলেন, বানওয়ালি গলির গিলৌড়ির সমকক্ষ হবে, এমন স্পর্ধা কার আছে, তা সে হোক না আদি রাম আস্রের অকৃত্রিম শাখা।

সাম গে তাং এবং কিমচি

শিবহীন যজ্ঞ যদিবা সম্ভব হয়, কিমচি ছাড়া ভোজন হয় না কোরিয়ায়। বলা যায়, কিমচি কোরিয়ানদের জীবন আচ্ছন্ন করে আছে।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর কাল কোরিয়া জাপানের তাঁবেতে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়ে দ্বিখণ্ডিত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর এক কোণের নগণ্য কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

দুবছর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোল (Seoul)-এ গিয়েছিলাম। দেশটা যেমন বেড়িয়ে বেড়াবার, তেমনি ভোজনসুখের। কোরিয়ানদের প্রধান খাদ্য নয় কিমচি, কিন্তু ঈশ্বরের মতো কিমচি সর্বত্র বিরাজমান।

দেখবার সুযোগ হল না, শুনে আশ্চর্য হইনি যে সোলে কিমচি মিউজিয়াম আছে। কিমচি নাকি বহু প্রকারের হয়। প্রধানত বাঁধাকপি দিয়ে তৈরি হয় কিমচি। তবে মুলার এবং মাছেরও হতে পারে।

সব ভোজনশালাতেই না চাইতে বাঁধাকপির কিমচি টেবিলে হাজির হবে। কিমচির প্রস্তুত-পর্ব কোরিয়ার জাতীয় উৎসবের মতো। শীতের আগে ঘরে-ঘরে কিমচি প্রস্তুতের আয়োজন হয়। গিন্নিরা কিমচি প্রস্তুতের জন্য কাজ থেকে ক'দিন বিশেষ ছুটি পান। কর্মীরা কিমচি তৈরি করবার জন্য টাকা ধার পান অফিস থেকে। টাকা বেশ খানিকটা লাগে, কারণ, কিমচি তো সব ঋতুতে প্রস্তুত করা যায় না। সারা বছরের জন্য গৃহস্থকে কিমচি তৈরি করে রাখতে হয়, নইলে দোকান-বাজার থেকে কিমচির শিশি কিনে আনতে হবে। ভাবলেই গুণীজন শিউরে ওঠেন।

সরু করে ফালি কাটা চিনা বাঁধাকপির পাতা দু-চার দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে নুনজলে মাসাবধি কাল রাখতে হয়। তার পর সিল-করা শিশি বোতলে পুরে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হবে। অবশ্যই বোতলে পোরার আগে অতি তীব্র লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো হয়েছে। তবেই না কিমচির স্বাদ, সৌরভ!

কিমচি কী? ব্যঞ্জন, আনাজ, চাটনি অথবা আচার? কিমচি ভোজনপাত্রে বহুরূপে অবতীর্ণ হতে পারে। প্রধানত অবশ্য ভোজ্যের সঙ্গে স্যালাড বা আচার অথবা চাটনির মতো কিমচির পরিবেশন হয়। ভোজ্যের সঙ্গে দূরাগত, প্রখর, অনাঘ্রাত সৌরভের মতো কিমচি আপনার দৈনন্দিন ভোজনকেও আশাতীত মহিমায় স্বাদিষ্ঠ করে। প্রত্যহ, সর্বদা।

সোল শহরের কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে লটে নামের এক বিশাল বিপণি-সমাবেশ। আটতলা প্রকাণ্ড বাড়ির বিভিন্ন তলায় সংখ্যাতীত পণ্যের আয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভোজনশালা অনেকগুলি। অতি সুসজ্জিত, অতি মূল্যবান।

আমরা একটি কোরিয়ান ভোজনশালায় মধ্যাহ্নভোজের জন্য গিয়েছিলাম। আমাদের নিকট আত্মীয় সদ্য-বিবাহিত দম্পতি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের চোখে তখনও আবিষ্কারের নেশা। যে-পদটি প্রথম আদেশ করেছিলেন তার নামটি ভাসা-ভাসা মনে আছে, স্বাদ চিরকালের জন্য স্মৃতিতে অক্ষয়।

পদের নাম সাম গে তাং। পদটি সুপ বলে পরিচিত। মাঝারি একটি সুদৃশ্য বাটির মধ্যে একটি ছোট কুক্কুট জলমগ্ন। কিন্তু বস্তুগত এই বর্ণনা পদটির কোনও গুণই প্রকাশ করতে পারে না। এই রন্ধনে প্রচুর রসুনের ব্যবহার হয়েছে এবং তার সঙ্গে উদার-হস্তে গিনসেং। গিনসেং বিশেষ এক গাছের শিকড়। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র গিনসেং-এর সর্বরোগহর শক্তি সবাই বিশ্বাস করেন। তারও অধিক, গিনসেং গ্রহণ করা হয় পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য। গিনসেং যে রন্ধনে যুক্ত হয়, আমার অজানা ছিল। কিন্তু কুক্কুট-মাংস, রসুন, গিনসেং এবং সম্ভবত আরও কিছু বিশিষ্ট অপ্রকাশিত বস্তুনিচয়ের সহযোগে যে এমন পরম রমণীয় কোনও ভোজ্যের সৃষ্টি হয়, তার স্বাদ না পেলে বিশ্বাস হবে না। এ যেন এক মায়াময় সুরের খেলা।

শুধু যে দক্ষিণামোহন ঠাকুরের সূক্ষ্ম অনুভবী বীণা শুনছি তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গত করছে কিমচি রূপে যেন ওস্তাদ দবির খাঁ-র মৃদঙ্গ। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্পষ্ট মনে রাখতে পারিনি, তার পর আর কোনও পদ এসেছিল। নবদম্পতি স্মরণ না করিয়ে দিলে পিন দা তা-র স্বাদ নেওয়াই হত না। পিন দা তা মানে আলুর আপম বা পরটা জাতীয় বা ওই ধরনের আর-কিছু। ভাল ছিল, কিন্তু অলৌকিকের সঙ্গ পাবার পর আর সব অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

হরহখ
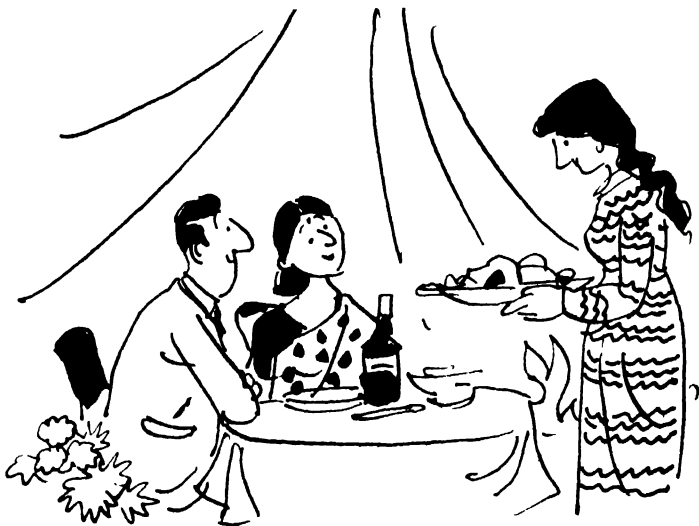
অনেক নামের মোহিনী শক্তি থাকে। লাসা, ইরকুটস্ক, আলমাআটা, উলানবাটোর নামের আকর্ষণেই দুর্গম, অজানা দেশে যাওয়ার জন্য মন আনচান করে। শুধু নামের জাদুই আমাদের নিয়ে গিয়েছিল এক অক্টোবর মাসে উলানবাটোর। মোঙ্গোলিয়াতে।

মোঙ্গোলিয়া অর্থাৎ মোঙ্গোলদের দেশ—যে দেশের রাজা চেঙ্গিস খান দিল্লি তছনছ করে দিয়েছিলেন। খান মানে রাজা বা সুলতান। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, নৃশংস মোঙ্গোলরা যেখানে অভিযান করেছে, সে দেশ হত্যা ও লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

জানতাম মোঙ্গোলরা যাযাবর জাতি। তাঁবুতে বাস করে, অশ্বপৃষ্ঠ তাদের স্বাভাবিক আসন। হিমালয়ের ওপারে, তিব্বতের নীচে উচ্চ মালভূমিতে মোঙ্গোলদের বাসস্থান। খুব ঠাণ্ডা পড়ে সেখানে। শীতে মাইনাস চল্লিশ সেলসিয়াস। একদা মোঙ্গোল সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ছিল। পুবে চিন থেকে আজকের ইরান, রাশিয়ার কিয়দংশ জয় করে পোলান্ড, হাঙ্গেরিতেও পৌঁছে গিয়েছিল। সময়টা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ।

চেঙ্গিসের নাতি কুবলাই খান তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন যেখানে আজকের বেজিং। ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাসে সেই বিশাল সাম্রাজ্যও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এখন মোঙ্গোলিয়া অকিঞ্চিৎকর, অনুন্নত দেশ। আকারে বৃহৎ প্রভাবে নগণ্য।

উলানবাটোরে কেউ আমাদের মোঙ্গোলীয় ভোজনশালায় নিয়ে যেতে চায় না। কলকাতায় কোনও বিদেশি অতিথি বাংলা খাবারের ভোজনশালায় যেতে চাইলে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবেন? নিয়ে গিয়ে তৃপ্ত হবেন? আপনিও চাইবেন না মান্য কোনও অতিথিকে শেয়ালদার বা রবীন্দ্র সরণির ভাতের হোটেলে নিয়ে যেতে। এতদিনে কুঞ্জে

দুটি ভোজনশালা হয়েছে বাংলা খাবারের, আহেলী এবং কিউপী। মোঙ্গোলীয়রাও তেমনি নিজেদের রেস্টুর্যান্টে নিয়ে যেতে লজ্জা পাচ্ছিল।

দুটি ইংরেজি সাপ্তাহিক আছে মোঙ্গোলিয়াতে। তারই একটিতে হঠাৎ মোঙ্গোলীয় রেস্টুর্যান্টের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। যে ভোজনশালা আগাপাশতলা মোঙ্গোলীয়, পাকা বাড়িতে নয়, সত্যিকার ডোর বা তাঁবুতে। ডোর হল চব্বিশ-পঁচিশ ফুট চওড়া গোলাকার তাঁবু। মাথার ওপরটা চোঙা টুপির মতো।

আমাদের হোটেলকে বলে দুজনের জন্য টেবিল বুক করে পরের দিন আমরা সেখানে হাজির হলাম। তাঁবুর দোরগোড়ায় মোঙ্গোলীয় পোশাকে দুজন আমাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল। ভারী আরামপ্রদ, নানা প্রাণীর বিচিত্র ছাল দিয়ে সাজানো তাঁবুর দেওয়াল। নীচে পুরু কার্পেট। ছত্রিশ জনের বসবার আসন, কিন্তু তখনও কেউ আসেনি। আমাদের জন্য একটি টেবিলে ছুরিকাঁটা সাজানো। টেবিলের দুই কোণে দুটি ফুলদানি। বসতে না বসতেই ছোট প্লেটে স্যালাড এসে গেল।

মনে পড়ল, আসন বুক করবার সময় জানতে চেয়েছিল আমরা কী খাব। অবাক হয়েছিলাম। কী খাব সে তো স্থির হবে খাদ্যতালিকা দেখবার পর। তা ছাড়া একদিন আগেই বা বলতে হবে কেন? জেদ করাতে বলেছিলাম, মোঙ্গোলিয়ান কোনও মাছ মাংসের পদ জাতীয় কিছু। আর স্যালাড, এখন বুঝতে পারলাম, সেই অর্ডার মতো খাবার আসছে।

সত্যিই তাই। অল্পকাল পরে, সুশ্রী, তরুণী পরিচারিকা আমাদের সামনে প্লেট ভর্তি খাবার রেখে গেল। মেষমাংসের তিনটি করে খণ্ড, দু টুকরো টমাটো আর কিছু আলু, সেদ্ধ-করা। আর, রাজহাঁসের ডিমের মাপের কালচে একটা অচেনা বস্তু। সেটি কোন প্রাণীর কোন অংশ, জীববিদ্যায় শিক্ষণহীন আমাদের বোঝবার ক্ষমতা নেই।

তিন টেবিলে মোট ছত্রিশটা চেয়ারের দুটিতে আমরা, মাঝখানের টেবিলে, আর সব খালি। কথাবার্তা হচ্ছে না। ইংরেজি বোঝে না এরা। রেস্টুর্যান্টে আসবার পথ খোঁজবার সময় বুঝতে পেরেছিলাম।

সুদৃশ্য, সুসজ্জিত তাঁবুর দেওয়াল, পা রেখেছি পুরু মখমলের মতো কার্পেটের ওপর। টেবিলের দু পাশে ফুল সাজানো। মাঝখানে লোহার বাক্সে আগুন জ্বলছে, তাঁবুর উষ্ণতা পরম সমাদরে আমাদের আলিঙ্গন করছে। একপাশে সুন্দরী যুবতী পরিচারিকা, তার পরনে বহুবর্ণের এমব্রয়ডারি করা ভারী পশমের জামা, দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী। মনে হল আমি বুঝি চেঙ্গিসের উত্তরসূরী কেউ, স-মহিষী আসীন সম্রাট। সভাসদদের আসার অপেক্ষা।

সম্রাটের মতোই হাতের ইশারায় পরিচারিকাকে ডাকলাম। নানাভাবে, নানা উচ্চারণের ইংরেজিতে বারবার বলে বোঝাতে পারি না। জানতে চাই, আর সব অতিথি কোথায়? আমির-ওমরাহের দল? অনেক চেষ্টা করে উত্তর শুনে বুঝলাম, আমাকে এরা চেঙ্গিসেরই কোনও আত্মীয় মনে করছে। মেয়েটি বলল, আজ মঙ্গলবার, আজ আমাদের রেস্টুর্যান্ট বন্ধ। আপনারা আসতে চাইলেন বলে খোলা হয়েছে। বুঝতে দেরি হল না যে সেইজন্য জানতে চেয়েছিল আমরা কী খেতে চাই।

কাঁটায় বিঁধিয়ে মাংসে ছুরি-চালনা করতেই জানা গেল মাংস কত কোমল। মুখে দিয়ে

চমৎকৃত। আগুনের স্পর্শ পেলে মাংসখণ্ড শুষ্ক হয়ে যায়, তার স্বাদ নিরুদ্দেশ হয়। এখানে গ্রিলের ধরনের সেই মেষমাংস স্বাদে, স্পর্শে ও সৌরভে অপরূপ ছিল। অপূর্ব রসাল মাংসখণ্ডগুলি অচিরে অদৃশ্য হল। এবারে সেই ডিমের সাইজের কালো-বেগুনি যকৃৎ অথবা হৃৎযন্ত্র অথবা অনাবিষ্কৃত কোনও প্রাণীর অভূতপূর্ব সেই পদার্থটি ভোজনের পালা।

মেয়েটিকে আবার ডাকলাম। অনেক কষ্টে প্রশ্নের উত্তর পেলাম। ওই কালো-বেগুনি উপকরণটি আদৌ ভোজনের জন্য নয়। ওটি নির্ভেজাল একটি প্রস্তরখণ্ড—পাথর। মেয়েটি বলল, এই পাথর দিয়ে রান্না করলে ব্যঞ্জন স্বাদিষ্ঠ হয়; উপরন্তু পাথর-যুক্ত ব্যঞ্জন খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। মোঙ্গোলীয়রা কেন দুর্ধর্ষ হত বুঝতে পারলাম। যদিও মেয়েটিকে সে-কথা বোঝাতে পারলাম না। পরিবেশিত পদটির নাম জানবার জন্যও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সরস পদটির নাম হরহখ। যদি কখনও মোঙ্গোলিয়া যান পরখ করে দেখবেন। হলফ করছি, ঠকবেন না।
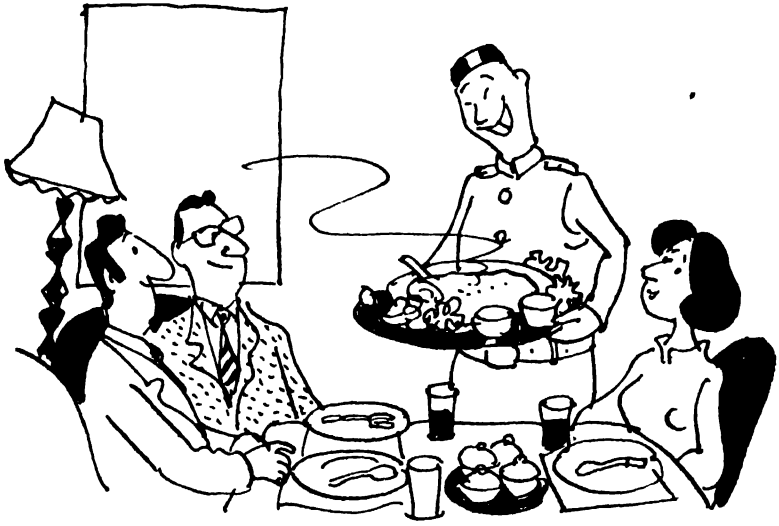
পুলগোগি

দশ পনেরো বছর আগে কোরিয়ান ভোজ্যের সঙ্গে আমাদের আকস্মিক পরিচয় হয়েছিল জার্মানির ডুসেলডর্ফে। ডুসেলডর্ফের আল্ট স্টাড অর্থাৎ পুরনো শহর থেকে অবসন্ন হয়ে বেরিয়ে সামনেই এক সুদৃশ্য রেস্টুর‍্যান্টে প্রবেশ করেছিলাম। আল্ট স্টাড অঞ্চলে গাড়িঘোড়া চলে না, তাই অনেকখানি পদচারণা করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভাসাভাসা নজর করে সাইনবোর্ডে আঁকা যে অক্ষরগুলিকে চিনা মনে করেছিলাম, সেগুলি আসলে কোরিয়ান।

কোরিয়া যদিও অতি প্রাচীন দেশ, তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সামান্য। দীর্ঘকাল আগ্রাসী বিদেশি রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সত্যিকারের মুক্তি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে। তারপর কোরিয়া আমাদের জানা বা জানবার ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেত, সেই সময়েই কোরিয়া যদি দুভাগ না হয়ে যেত। কোরিয়া আশ্রিত ছিল চিনের। সোবিয়েত রাশিয়ার। ১৯৫০-এর জুন মাসে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী সহসা দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে। অবিলম্বে দক্ষিণ আসরে নেমে পড়েছিল আমেরিকান সৈন্যবাহিনী। উত্তর কোরিয়ার আসরে চিনাবাহিনী। ১৯৫১ সালে সীজফায়ার হল, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি গোলাগুলি নিক্ষেপ ক্ষান্ত হল। ১৯৫৩ ২৭ জুলাই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হল।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে কোরিয়া ঠিক আমাদের চেতনায় ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমান্তরেখা ভৌগোলিক ভাষ্যে ৩৮ অক্ষাংশে। ইংরেজিতে থার্টি এইটথ প্যারালাল। মোটামুটি শান্তিতে দু-তরফের জীবনযাত্রা চলতে লাগল। পৃথিবী এদের ভুলে যেত, যদি না দক্ষিণ কোরিয়া কোনও আর্থনীতিক জাদুদণ্ডের স্পর্শে চার

এশীয় ব্যাঘ্রের অন্যতম আশ্চর্য বলে দেখার পর্দা জুড়ে থাকত।

আমরা যখন ডুসেলডর্ফে—তখনও সমৃদ্ধির দিগন্ত অভ্যুদয় হয়নি কোরিয়ার। কোরিয়ার ভোজ্য সম্বন্ধে না ছিল অভিজ্ঞতা, না আগ্রহ। শুনেছিলাম কোরিয়ানরা কুকুরের মাংস পছন্দ করেন। বলা বাহুল্য, ঈষৎ সতর্কতার সঙ্গেই ডুসেলডর্ফের সেই রেস্টুর‍্যান্টে ভোজ্য নির্বাচন করেছিলাম। জিহ্বা স্পর্শ করে চমকে উঠেছিলাম। সম্ভবত তিন-চারটি পদ ছিল, সেগুলি আমার কাছে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মতো মনে হল। কোন পদ আস্বাদ করেছিলাম, কী তার নাম, কিছুই স্মরণে নেই। শুধু সেই দ্বিপ্রহরে অজানা ভূমিতে আকস্মিক অ্যাডভেঞ্চারের সুখস্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে।

বছর দুই আগে সিউল (আসলে সোল) গিয়েছিলাম। প্রথম দেখা, প্রায় কেউই ইংরেজি বোঝে না, যে বা বোঝে তার ইংরেজি উত্তর আমাদের বোধগম্য হয় না। অল্পবয়সি সদ্যবিবাহিত এক দম্পতির আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারা কোরিয়ায় এসেছে সদ্য। ভাষার ব্যুৎপত্তি উল্লেখ করবার মতো নয়, অথৈ জলেও নয়। যৌবনের ধর্মে এবং পরস্পরকে ইমপ্রেস করবার স্বাভাবিক মোহে, তারা আমাদের ভোজনের জন্য বড় বড় হোটেলের ভোজনশালায় নিয়ে যেতে চায়। আমাদের অভিপ্রায় অন্য। বড় হোটেলের কোনও বিশিষ্ট চরিত্র থাকে না। সেগুলি সবই এক ছাঁচে ঢালা। তারা শুধুই রূপ দিয়ে ভোলাতে চায়, সেখানে সম্ভ্রান্ত এবং আভিজাত্যের লজ্জাহীন প্রতিযোগিতা। তাদের ভোজনশালায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু ভোজনশেষে, মনের ওপর ছাপ ফেলতে পারে না।

বহু কষ্টে তরুণ আত্মীয়দের বুঝিয়ে পাড়ার একটা ছোট ভোজনশালায় যাওয়া গেল। দুজনেই আমাদের বারবার বোঝালেন, স্থানটি কিন্তু ভাল নয়। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে আহার্য ফুরিয়ে যায়, নটায় ঝাঁপ পড়ে। অতিথিরা সাধারণ মানুষ, অফিস-আদালতে কাজ করেন, মদ্যপানে তাঁদের সংযম নেই, সেটা সশব্দে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সবাই বড় চেঁচিয়ে কথা বলে, উত্তেজনায় হাতাহাতিও হতে পারে।

ছেলেমানুষদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আমরা নিকটবর্তী একটি ছোট ভোজনশালায় আসন নিলাম ডিনারের জন্য। ছোট অর্থে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের আসন আছে। এয়ারকন্ডিশনড, বিশেষ প্রসাধন নেই, আসবাবপত্র সাদামাটা। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর, কারণ খাদ্যতালিকা দেখে কিছু বোঝা গেল না, আমরা আদেশ করলাম পুলগোগি। পরিচারক সামান্য ইংরেজি বোঝে, বলল বারবেকিউড বিফ।

বারবেকিউ অর্থাৎ ঝলসানো মাংসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। পৃথিবীর বহু দেশই রন্ধন সোপানের এই প্রথম ধাপের ওপর উঠতে পারে না। আমেরিকানরা তো তাকেই রন্ধন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত এবং শেষবাক্য মনে করে—স্টেক।

আমাদের পুলগোগির সঙ্গে আদেশ করা গেল সোজু। শুনেছি, সোজু প্রায় বলা চলে কোরিয়ার জাতীয় ড্রিঙ্ক। আমরা অবশ্যই সোজু পান করে আনন্দ পেয়েছিলাম। জিনের মতো নির্মল বর্ণ, স্বাদে সামান্য মিষ্টি। পান ভোজনের বর্ণনায় ভাষার অক্ষমতা আমাকে সতত পীড়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও সোজুর স্বাদ বর্ণনা করতে পারলাম না। সোজুর স্বাদে লাজুক মেয়ের গোপন চাউনির মতো ঈষৎ মিষ্টতা, প্রায় বোঝাই যায় না। সুমধুর একটা

সুবাস, যেন অনেক দূরাগত। ক্ষুদ্র একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোজু ঢেলে এক ঢোঁকে পান করার বিধি আমরা পালন করেছিলাম এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে দ্বিধা করিনি। একটা কোনও কবিতার লাইন, নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের আছে, আজ সকালে যাকেই দেখি তাকেই বাসি ভাল। আমাদেরও তেমনি মনের অবস্থা, সব ভাল লাগছে। সত্যিই এখানে কেউ আস্তে কথা বলে না। বরং অতিথিদের কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর চড়ছে। আমাদের কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাঘাত হচ্ছে না। ভাল লাগছে।

এমন সময় পুলগোগি এল। একটি পাত্রে কাঁচা ফালি করা মাংস নিয়ে এসে পরিচারক আমাদের প্লেটে তুলে দিল। দুটি ছোট বাটিতে অনাস্বাদিত কোনও সস। টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড থালায় নানা কাঁচা সবজি, মাশরুম পর্যন্ত । স্যালাডের উপকরণ।

এবারে টেবিলের মাঝখানে একটি অগ্নিপাত্র রাখা হল, জ্বলন্ত কাঠকয়লার অথবা কোলব্রিকেটের। তার ওপর লোহার জাল। বুঝতে দেরি হল না যে, মাংসের ফালিগুলি ওই জালের ওপর সেঁকে বা ঝলসে ভোজন করতে হবে।

আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম। মাংসের ফালি জালে চড়াতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, মাংসখণ্ডগুলি সারাদিন জারানো হয়েছে সয়াসস, তিল তেলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পিঁয়াজ, রসুন এবং গোলমরিচ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রং বদলে গেল মাংসের। সেঁকা মাংসের সুবাস পেলাম। মাংস ফালিটি জাল থেকে নামাতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। বড় একটা ফালি, খাবই বা কী করে? এমন সময় প্রবেশ হল কাঁচি হাতে এক পরিচারকের। তিনি প্রত্যেক টেবিলে কাঁচি দিয়ে কেটে বৃহৎ খণ্ডগুলিকে অতিথিদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিচ্ছেন। এবারে কাঁটায় বিঁধিয়ে সসে ডুবিয়ে ভোজন। স্যালাডের সবজিও সসে ডুবিয়ে বা না ডুবিয়ে ঝলসে নেওয়া যায় অথবা কাঁচাও ভোজন করা চলে। একেক গ্রাসে তাই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। স্বপাক ভোজ্যের স্বাদের নিশ্চয় একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। না হলে ব্রাহ্মণেরা স্বপাক ভোজন করতেন কেন?

পরম স্বাদিষ্ট পুলগোগি সেদিন আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছিল। সেই আনন্দকে গভীর এবং স্থায়ী করবার জন্য আর একটি বিশিষ্ট আয়োজন ছিল। তার নাম কিমচি। কিমচি কোন শ্রেণীতে পড়ে, ভোজনের পদ, চাটনি অথবা আচার, তার নির্ধারণ বোধকরি হয়নি। কিন্তু কিমচি না থাকলে কোরিয়ান ভোজন শূন্য মন্দিরে প্রার্থনার মতো—অভীষ্ট দূরেই থেকে যায়।

জাগতিক বর্ণনায় কিমচির উপকরণ বাঁধাকপি। তারপর কী উপায়ে বাঁধাকপিকে কিমচিতে রূপান্তরিত করা হয় তার বিবিধ প্রণালী আছে। বস্তুত, সিউল শহরে একটি কিমচি মিউজিয়ম আছে। তার থেকেই বোঝা যাবে কোরিয়ার মানুষের জীবনে কিমচি কত গুরুত্বপূর্ণ। কিমচির বিষয়ে সুযোগ হলে পৃথক প্রবন্ধ লিখব।

আমাদের আহারের সঙ্গে আর একটি অপরিহার্য পদ ছিল। একবাটি চটচটে মোটা চালের ভাত। শেষে ভাত না খেলে কোরিয়ান খানা পূর্ণ হয় না। একটা সুপও নেওয়া হয়েছিল। এবং একপ্লেট মিষ্টান্ন। কিন্তু সেগুলির কথা আমার বিশেষ মনে নেই। পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলে কে আর নক্ষত্ররাজির কথা মনে রাখে।

সিউল-এর সেই সন্ধ্যা অনির্বচনীয় আনন্দে কেটেছিল।

যার নাম রাম

যার নাম রাম, সে এদেশেও রাম, বিদেশেও রাম। নাম দিয়ে আমরা মানুষ চিনি। বস্তুত, সব কিছুই আমরা নাম দিয়ে নির্দিষ্ট করি, চিনতে পারি। ভোজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নীতি সর্বত্র খাটে না। এ তথ্য আমি বাল্যকালেই জেনেছিলাম।

উত্তর কলকাতার মানুষ আমরা। ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত আমাদের গতি। তার দক্ষিণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও কালা সাহেবদের শহর। সেখানে আমাদের যাতায়াত কম। ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলের মানুষদের কাছেও চৌরঙ্গি, এসপ্ল্যানেড অপরিচিত ক্ষেত্র।

উত্তর কলকাতার হোটেল কাফে কেবিন রেস্টুর‍্যান্টে আমাদের অবাধ গতি। মাংসের চপ-কাটলেট আমাদের নিত্য জলযোগের সামগ্রী। এক আনা দাম, অর্থাৎ এক টাকায় যোল খণ্ড।

প্রথম যেদিন এসপ্ল্যানেডের কাফে ডি মনিকোতে সন্তর্পণে অবতীর্ণ হলাম, বেশ ভাল লেগেছিল। তখনও জানি না কী ধাক্কা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

পরিচিত পদ মাংসের চপ ও চা আদেশ করা গেল। পরিচারক এক পাত্রে যে-ব্যঞ্জনটি নিয়ে এল তার সঙ্গে আমাদের পরমাত্মীয়, গোলাকার, ডিমের গোলায় মাখানো, লাড়ু বিস্কুট প্রলিপ্ত সোনার রঙে ভাজা চপের সামান্যও সম্পর্ক নেই। এ তো ঈষৎ ঝোলে একখণ্ড মাংসমাত্র। ভাজার নামগন্ধ নেই। শুনলাম, সভ্য সমাজের সাহেবরা এমনই একখণ্ড মাংসকে চপ বলে থাকেন এবং কলকাতার এতদঞ্চলের ভোজনশালায় চপ নামে এই ব্যঞ্জনটিই পরিবেশন করা হয়।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম বললে সবটা বলা হবে না। তারপরও বাকি ছিল। ওই পদটির মূল্য চার আনা। অর্থাৎ আমাদের চেনা চপের চতুর্গুণ।

আবার, যদি মনে করে থাকেন চাপ বা চাঁপ ওই চপেরই নামান্তর তা হলে ভুল করবেন। চাঁপ নেটিভ বা সাহেবি নয়, একেবারে নবাবি।

অনেক বছর বাদে, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে, চিন সদ্য বাঁশের আড়াল মুক্ত করে বিদেশিদের আসবার অনুমতি দিচ্ছে তখন। আমি বেজিংয়ে গিয়েছি। বিদেশিদের জন্য দুটি মাত্র হোটেল, তারই একটিতে আছি। পিকিং হোটেল। সন্ধ্যা সাতটায় হোটেলের ভোজনশালা বন্ধ হয়ে যায়। খুলবে আবার কাল ভোরবেলা। সদাশয় একজন বললেন, হোটেলের একপ্রান্তে একটি রেস্টুর্যান্ট আছে, সেটি রাত্রি দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানেই গেলাম। ভাষার বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বুঝতে পারলাম চৈনিক ছাড়া অন্য দু-একটি ব্যঞ্জনও এখানে পাওয়া যায়। তার মধ্যে, একটি পদ আমাকে আকর্ষণ করল। মোঙ্গোলিয়ান হটপট।

মোঙ্গোলিয়ান হটপট কী জিনিস জানি না। শুধু বুঝেছিলাম তার প্রধান উপকরণ ছাগ বা মেষ মাংস। তাই আদেশ করেছিলাম। প্রথমে একটি সামোভার জাতীয় পাত্র এল টেবিলে। মাঝখানে আগুন জ্বলছে আর চারপাশে ফুটন্ত জল। অতি কৃষ করে কাটা এক বাটি কাঁচা মেষ মাংসও আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল। এবারে চপস্টিক সহযোগে এক এক খণ্ড মাংস ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করে মিনিট খানেকের অপেক্ষা। তারপর মাংসখণ্ডকে জল থেকে উদ্ধার করে সামান্য জলে ডুবিয়ে ভোজন।

চিনারা সসের পারদর্শী নয়। বোধহয় তিন প্রকারের সস ছিল—সয়া সস, তিলের সস এবং মাস্টার্ড। এক মিনিটের রান্না দেখে অবাক হয়েছিলাম। তপ্ত মাংসখণ্ড বিভিন্ন সস সহযোগে বেশ ভাল লেগেছিল।

আর মোঙ্গোলিয়ান হটপট ভোজনের সুযোগ হয়নি। এবারে পনেরো বছর পরে একেবারে সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। যখন আমরা মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে। ওই শহরে বিদেশিদের উপযুক্ত ভোজনশালার সংখ্যা এক আঙুলে গোনা যায়। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শহরটাতেই তো মাত্র ছ লক্ষ মানুষের বাস। বিদেশি হাজার দু হাজারের বেশি হবে না।

আমরা প্রথম ভোজনশালাতেই ভাষার কচকচির মধ্যে না গিয়ে আদেশ করলাম মোঙ্গোলিয়ান হটপট। পরিচারক থেকে ম্যানেজার কেউ কিছু বুঝতে পারে না হটপট কী বস্তু। অনেক চেষ্টা করেও হটপটের হদিশ পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় ভোজনশালাতেও অভিজ্ঞতা এক, কিন্তু একটু জ্ঞানলাভ হল। তাঁরা বোঝালেন, নামে কোনও পদ নেই মোঙ্গোলিয়াতে। তবে একটা বিশেষ সুপকে হটপট বলা যেতে পারে।

জীবনে চমকের কি শেষ আছে? এই গত বছর আমেরিকায় নিউজার্সি প্রদেশের একটি শহরে ডিনারের জন্য নিয়ে গেলেন আমার আত্মীয়। খুদে শহরটার নাম মিলবার্ন। ভোজনশালার নাম জে পি লি। আমাকে নির্বাক করে দিয়ে আমার আত্মীয় বললেন, এদের মোঙ্গোলিয়ান হটপট অভিনব ও অতি সুস্বাদু। তবে রান্না কত ভাল হবে সেটা নির্ভর করবে আপনার হাতযশের ওপর।

দোকানে মস্ত বোর্ডে দেখলাম: মোঙ্গোলিয়ান হটপট। কিন্তু আমার হাতযশের সঙ্গে

তার সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারলাম না। টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম, আমার আত্মীয় বলল, আপনি হটপট নেবেন না?

বিলক্ষণ, এই হটপটের জন্য পনেরো বছর অপেক্ষা করেছি বেজিং থেকে নিউজার্সির ছোট শহরে। কিন্তু এ কী হটপট! একটি টেবিলে বিশ পঁচিশ রকম উপকরণ সাজানো আছে। আপনি একটি বড় বাটি নিয়ে আপনার পছন্দ মতো উপকরণ বাটিতে তুলে নেবেন। কাজটা সহজ নয়, কারণ কাকে ছেড়ে কাকে নেব? বাঁধাকপি, ব্রকোলি, পিঁয়াজ কুচি, পিঁয়াজকলি, গুঁড়ো করা ডিম সিদ্ধ, মুরগি হ্যাম পর্ক বিফের কুচি, কয়েক প্রকার মাশরুম, বিন স্প্রাউট, বাম্বু শুট, বেবি কর্ন—আর তালিকা বাড়াব না।

এইবারে ওই বিবিধ উপকরণগুলির সঙ্গে সস মেশানো হবে। আগেই বলেছি, চিনাদের সসের সংখ্যা সামান্য। এখানে সরা ছাড়া দু-একটি পাশ্চাত্য সসও দেখলাম, যেমন H&P সস। বিধাতাকে ভরসা করে নিজের ইচ্ছামতো সস মেশালাম।

এইবারে ওই বাটি নিয়ে একটি বিশাল তাওয়ার কাছে শেফের হাতে ওই বাটি তুলে দিতে হবে। তাওয়াটির ব্যাস এক মিটার তো হবেই। নীচে আগুন জ্বলছে। শেফ প্রত্যেক অতিথির বাটি তাওয়ার একাংশে ঢেলে দিচ্ছেন। অতঃপর দেড় মিটারের খুন্তি দিয়ে রান্না শুরু হল। কখনও এই অতিথির উপকরণগুলি তাওয়ার মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার একপাশে সরিয়ে রেখে অন্য অতিথির খাবারটি মাঝখানে আনছেন। পর্যায়ক্রমে কমবেশি গরমে একসঙ্গে পাঁচ সাত অতিথির খাবার পাক হতে থাকল।

বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দুই হবে, তারপর অতিথিরা নিজের বাটিতে নিজের খাবার ফিরে পেলেন। এবারে টেবিলে গিয়ে বসা। হাতযশের মর্যাদা এবার বুঝতে পারলাম। সসের এবং উপকরণের রকমফেরে ভিন্ন স্বাদের ব্যঞ্জন তৈরি হতে পারে।

নিঃসন্দেহে খুব ভাল লেগেছিল। আবার অন্য কোথাও অন্য কোনও মোঙ্গোলিয়ান হটপটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সেই আশায় আছি।

ইউরোপে শীতের খাবার আইসক্রিম

ঋতুভেদে আহারের কিছু রকমফের না হলে পৃথিবীটাই নীরস বিবর্ণ মনে হত। বর্ষায় ভাপা ইলিশ, শীতে মুলো-ভেটকি, বর্ষাশেষে জলপাইয়ের চাটনি—কত নাম করব? ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। বিছানায় উষ্ণ আরাম ছাড়তে মন চায় না, তবু সূর্যোদয়ের আগে উঠেছি, এখন তাজা খেজুর রসের হাঁড়ি নামাবে গফুর। হাড়-শিরশির শীতে ক্ষীণ গানের কলির মতো হালকা সেই শীতল রসের কী স্বাদ! অবশ্য, বড় হয়ে জেনেছি আরও দেরি করে খেজুর রস খেলে অন্য মজা পাওয়া যায়।

অথবা শীতের রাত্রে গরম খিচুড়ি। এত গরম যে হাত দেওয়া যায় না, অথচ মুখে তুলতে না তুলতে শীতে ঠাণ্ডা। গন্ধে মন আপ্লুত কিন্তু হাত ধোবার ভয়ে খেতে মন চায় না। এমনি শীতে গমের খেতে হাজির হবেন গুজরাতিরা। গমের সদ্যোজাত শিষগুলো কেটে নিয়ে মাটির হাঁড়িতে, কাঠের জ্বাল আর রহস্যাবৃত কোনও প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে যে অপার্থিব বস্তু তার নাম পোঙ্ক, বাজরার রুটি সহযোগে তার স্বাদ, গুজরাতিদের তখন আবেশে বাকরোধ হয়েছে—কে বোঝাবে? পোঙ্কের জন্য মুম্বই থেকে দেড়শো মাইল দূরে সুরাট যাওয়া তো সামান্য কথা।

শীতকালে সারা পঞ্জাবে স্থানীয় মানুষ খাবেন সরষোঁ কা সাগ। অর্থাৎ সরষের শাক। সঙ্গে মকাই অর্থাৎ ভুট্টার রুটি। পর্যাপ্ত মাখন চাই। শাক হবে ফুটন্ত গরম। সারাদিন মাটির হাঁড়িতে ঘুঁটে বা তুষের আগুনে রন্ধন হয়েছে। মা কিংবা ঠাকুমা তদারক করেছেন। তার কোনও তুলনা হয়!

অথবা, আমাদের পয়রা গুড় দিয়ে গরম, হালকা ফুলকো লুচি—নিষ্পাপ শিশুর মনের মতো, সাদা, মায়াবিনী কোনও সুন্দরীর মতো মাদকতাময়।

বিদেশে শীতের সময় কী খায় মানুষ? কী তাদের শীতের আয়োজনের বৈশিষ্ট্য? হোটেলের কামরায় বসে তার আন্দাজ পাওয়া যায় না। মেনু বা খাদ্যতালিকা থেকেও নয়। তারা যেন পুরাকীর্তিস্তম্ভের মতো। ঋতুবদল তার ওপর চাপ ফেলতে পারে না। সব ঋতুতেই এক। তারা কোথায় পাবে প্রথম বর্ষার স্বাদিষ্ঠ গঙ্গার ইলিশ? তাদের কাভিয়ার সর্বকালে এক স্বাদের। স্মোকট স্যামন-এরও ঋতুভেদ হয় না।

আসলে, বিদেশে যে তেমন শীতের আবহ নেই। মুখ ভার আকাশ থেকে তুলোর মতো সাদা বরফ পড়ছে, পথঘাট অজ্ঞাত কোনও গ্রহের মতো উদাসীন সাদা, প্রকৃতি নিথর, মৃত্যুশীতল। কিন্তু ঘরের ভেতর শীতের বাষ্পও নেই। সেন্ট্রালি হিটেড। বাস, ট্রেন, গাড়ি—সব। তাই বুঝি ওদের শীতকালে কোনও বিশেষ খাবার নেই।

একবার শীতের শেষদিকে মস্কোতে গিয়েছিলাম। সর্বত্র বরফ—পথের দুপাশে দু ফুট উঁচু বরফ, হোটেলের ঘরের বারান্দায় ফুটখানেক। হোটেলে বসন্তের উষ্ণতা ছেড়ে বাইরে যেতে ইচ্ছা হয় না। সন্ধ্যার মুখে তবু বেরিয়েছি। দেখি একটি কিয়স্ক ঘিরে ছেলে বুড়ো মিশিয়ে এক দল আইসক্রিম খাচ্ছে। তাদের পায়ে গাম বুট, গায়ে ওভারকোট, মাথায় বালক্লাভা। এই ঠাণ্ডায় আইসক্রিম? আমার বন্ধু বোঝালেন, শীতে এখানে আইসক্রিমের বিক্রি কমে না। কেন কমবে? বরং বাড়ে। এখন বাইরে মাইনাস দশ ডিগ্রি টেম্পারেচার। শূন্যের চার ডিগ্রি নীচে নামলেই কুলফি জমে যায়। আইসক্রিমও তাই। তা হলে আইসক্রিম খেলে তো শরীর গরম হবার কথা। নয়?

তা হলে কি ইউরোপে শীতের বিশেষ খাবার আইসক্রিম?
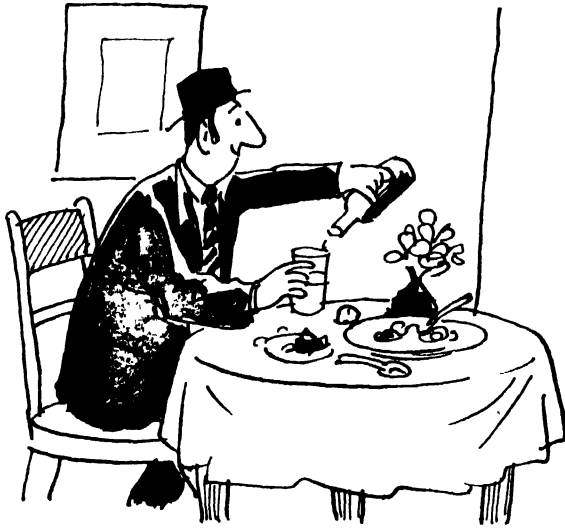
হ্যাগিস এবং স্কচ

রবার্ট ব্রুসের দেশ স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়ার সময় মে থেকে সেপ্টেম্বর—বসন্তে আর গ্রীষ্মে। ধুলো ধোঁয়ার ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে স্কটল্যান্ডের ঢেউ-খেলানো স্নিগ্ধ সবুজ নিসর্গে অকস্মাৎ মুক্তি। যুক্তরাজ্যের অঙ্গ হলেও স্কটল্যান্ড নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র থাকতে চায়। এককালে অভিযাত্রী ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগ ছিলেন স্কট।

স্কটদের খ্যাতি দুই কারণে। প্রথম, এঁরা ঘোর কৃপণ। আর দ্বিতীয়, এঁরা এমন একটি সুরা তৈরি করতে জানেন, যার বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি—স্কচ হুইস্কি।

স্কটেরা বড় স্বাধীন-চেতা। রবার্ট ব্রুসের কাহিনী সবার মনে থাকবে। রবার্ট দ্য ব্রুস স্কটল্যান্ডের আদর্শ পুরুষ, হিরো, কিংবদন্তি। রাজ্যহীন ব্রুস এক গোপন কুটিরে লক্ষ করেছিলেন একটা মাকড়সা এক বীম থেকে অন্য বীমে তার জালের লাইন টানতে ছ'বার ব্যর্থ হল, কিন্তু ক্ষান্ত হল না। সপ্তমবারে দুটো বীমে সুতোর সংযোগ করে ফেলল। বলা হয়, মাকড়সার অধ্যবসায় এবং দৃঢ়-চিত্ততা দেখে ব্রুসও পরাজয়ে হতাশ হননি। বারবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের কাছ থেকে হৃত রাজত্ব শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে স্বাধীন স্কটল্যান্ডের রাজা হয়েছিলেন ১৩১৪ সালে। ১৭০৭ সালে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড দুই স্বতন্ত্র রাজ্য মিলে নতুন যুক্তরাজ্য তৈরি হল, ইউনাইটেড কিংডম।

স্কটরা ! এখনও ইংরেজদের সুনজরে দেখে না। এখনও স্কটল্যান্ডের আলাদা নোট ছাপে ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যান্ড। স্কটল্যান্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের নোটের সঙ্গে সেই নোট সমান্তরাল চলে। আমাদের মনে স্কটল্যান্ড বলতে ব্যাগপাইপের আর ঘাঘরা-পরা বাজনদারদের ছবি ভেসে ওঠে। পৃথিবীর সব থেকে মর্যাদার খেলা গলফেরও উৎপত্তি স্কটল্যান্ডে।

কৃপণ হলেও স্কটেরা খায়দায় ভাল। ইংরেজদের মতো নয় যে প্রাতরাশে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, সসেজ দেব? না বেকন? কয়েকবার যে কদিন স্কটল্যান্ডে ছিলাম, সর্বত্র প্রত্যহ বেকন এবং সসেজ একসঙ্গেই পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সদ্গতি করলে লাঞ্চের দরকার হত না।

স্কটদের সখের ভোজ্য, নিজেরা বলে জাতীয় পদ, হ্যাগিস সর্বত্র সব সময় পাওয়া যায় না। সুযোগ পেলে অবশ্যই স্বাদ গ্রহণ করবেন। ভেড়ার অথবা গোবৎসের হৃৎপিণ্ড, কলিজা এবং ফুসফুস হল এই পদের উপকরণ। তিনটিকে সযত্ন কিমা করে মেষ বা গোবৎসের পাকযন্ত্রের থলিতে পুরে রান্না করা হয়। আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত হতে দেখে আমার বন্ধু বললেন, না, না, মশলাও থাকে বৈ কী, নইলে স্বাদ হবে কেন? হ্যাগিসের জন্য ওই কিমাতে কিঞ্চিৎ পিঁয়াজকুচি, গোলমরিচ এবং লবণও যুক্ত হয়। মশলার ফিরিস্তি শুনেও আশ্বস্ত হতে পারিনি। জানি, উপকরণ শুনেই অনেকে ইতস্তত করবেন। তবে দেখেছি, একটা ইন্দ্রিয়কে সুইচ অফ্ করলে হ্যাগিস ভালই লাগে। বিশেষ করে তার আগে যদি দু-চার পাত্র স্কচ হুইস্কির আয়োজন থাকে। হ্যাগিস ভোজনের বিধি হল আলুভাতে শালগম সেদ্ধ সহযোগে। অনেকে হ্যাগিসের ওপরে দুচার চামচ স্কচ হুইস্কিও যোগ করে থাকেন। আমার বিশ্বাস স্কচ হুইস্কি স্বতন্ত্রতাতেই মহিমময়। অন্যত্র নষ্ট না করাই ভাল। যে ইন্দ্রিয়টিকে স্থগিত রেখে হ্যাগিস গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছি, সেই ইন্দ্রিয়টি হল চক্ষু। চোখ বন্ধ করে হ্যাগিসের স্বাদ নিলে ভাল লাগবে। ভাল লাগা নিয়েই তো কথা।

আরব সমুদ্রতীরে

ঐশ্বর্য থাকলে মানুষ সব সময় নতুন নতুন সুখের সন্ধানে ফেরে। তাই মুম্বইতে এত নতুন ভোজনশালার প্রতিষ্ঠা হয়। সুখান্বেষী ভিড় করেই সেখানে যায়। সুখ সর্বদা পায় না, বৈচিত্র্যে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মুম্বইয়ের নতুন ভোজনশালাগুলির অন্যতম হল দি ভিলেজ। মহালক্ষ্মীর মন্দির ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ পার হয়ে পশ্চিমে পুনম ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। সেই হোটেলে এই নতুন ভোজনশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হোটেলের সুউচ্চ অট্টালিকার বাইরে, যেখানে একপাশে সাঁতারের পুল, অন্য পাশে সমুদ্র। নারকেল গাছের ছায়ায়, সমুদ্রতীরে সৌরাষ্ট্রের একটি গ্রামের দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশ করেই যেখানে বেশি অতিথি সমাগম হলে অপেক্ষার স্থান, চেয়ার বা সোফাকৌচ নেই। নিচু চৌকির ওপর গদি পাতা, আরামের মস্ত মস্ত তাকিয়া। একটি ঝুলাও আছে, গুজরাতি রীতিতে একটি ছোট তক্তপোশ চেনে ঝুলানো। প্রথমেই অবশ্য বাঁপাশে কুমোরশাল পড়বে। দক্ষ কুম্ভকার একজন চাক ঘুরিয়ে মাটির থালা বাটি গেলাস নানা অভাবিত আকারের সৃষ্টি করছেন। খড়ের ক'টি দোচালা নিয়ে ভোজনশালা। অতিথিদের সুবিধার্থে খোলা মাটির ওপর কাঠগুঁড়ো ছড়ানো। সব সুদ্ধ ষাট সত্তরজন অতিথির জন্য আসন আছে। এক একটি দোচালার নীচে মোটা হাতের করা নিরলঙ্কার টেবিল। তেমনি পাঁচ-ছটি করে চেয়ার। চারটে অমসৃণ খুঁটির ওপরের চাল থেকে, যেমন গ্রামাঞ্চলে হয়, শিকে ঝোলানো কয়েকটি। একগুচ্ছ পিঁয়াজ টাঙানো আছে মাথার ওপর, কোথাও একগুচ্ছ লঙ্কা শুকুচ্ছে। আরব সাগরের অলস ঢেউ ভাঙছে, পশ্চিম থেকে হাওয়া বইছে হু-হু করে। পাশের চালার আলাপচারী শোনা যাচ্ছে না। এক সময় পরিচারিকা মাটির গেলাসে জল নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবে। তার পরনে সাতরঙা খাটো ঘাঘরা। গায়ে

আঁটো চোলি। আপনি মায়ার ঘোর থেকে চোখ তুলে তাকাবেন, মঞ্জিরের শব্দ শোনার আশা করবেন। সৌরাষ্ট্রের কোনও দূর গ্রামের ছবিটি আপনার মনে সম্পূর্ণ হবে। পরিচারকের পোশাকও সৌরাষ্ট্রের, সাদা চুড়িদারের ওপর রংদার জামা। রাত্রে এখানে লণ্ঠন জ্বালানো হয়। লণ্ঠনের অল্প আলো, দীর্ঘ ছায়া আর চাঁদের আলোয় নারকেল পাতার ঝিরিঝিরি যে মায়া রচনা করে তার নাকি তুলনা নেই। রাত্রে ভিড়ও বেশি হয়। টেবিল পাওয়া যায় না। আমি গিয়েছিলাম দ্বিপ্রহরে। তখন সাদা পালকের ওপর কালো মাথা ক'টা গাংচিল কর্কশ গলায় দূর সমুদ্রের খবর দিচ্ছিল।

গ্রাম থেকে নির্বাসিত শহরে ধনীরা গ্রামের অলীক ছবিতেই মুগ্ধ। যে খাবার আসবে তার সঙ্গে সৌরাষ্ট্রের বৈমাত্র সম্পর্কও নেই। আর যা দাম, গ্রামের মানুষের দোচালাটাই বিকিয়ে যাবে। তবু বলতে হবে দি ভিলেজের খাবার বৈশিষ্ট্যের জন্য মনে রাখবার মতো। খাদ্যতালিকা দেখবেন, কাঠের ওপর লেখা। এমন মাননীয় ভোজনশালার পক্ষে তালিকা ছোটই বলতে হবে। সর্বপ্রকার পানীয় পাওয়া যায়। দাম নিশ্চয় বেশি হবে ভেবে আমি ও পথে পা দিইনি। তবে আহারের শেষে অবশ্যই মশালা ছাস গ্রহণ করবেন। গুজরাতি ভোজনে ছাস অবিচ্ছেদ্য পদ। ছাস অর্থাৎ আমাদের ঘোল। কোনও কিছু না মিশিয়ে সাদা ছাস পান করাই বিধি। এখানে মশালা ছাসে, বলা বাহুল্য, মশালা যুক্ত হয়েছে। পানীয়টি শীতল, আরামদায়ক এবং শ্রমহারী। পুদিনা, লবণ, গোলমরিচ এবং সূচ্যগ্র রসুন ছাসকে অসাধারণে উত্তীর্ণ করেছে। ৬ টাকা।

খাবারগুলি তিন-চার শ্রেণীতে ভাগ করা। 'কোইলা পর পড়ে' অর্থাৎ কবাব জাতীয় পদার্থ, যা সোজাসুজি আগুনের স্পর্শ পায়। এই দলে তিনটি পদ আমার প্রিয়। দুটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তৃতীয়টি, আমি না দেখেই প্রণয়াসক্ত, দামের জন্য আস্বাদন করা হয়নি। ঝিঙা মশালা, ৬০ টাকা। ঝিঙা অর্থে চিংড়ি মাছ। যে বিখ্যাত পদটির সঙ্গে হায়দরাবাদে সাক্ষাৎ হয়নি, সেটি এখানে পাওয়া গেল। পাত্থর কে কবাব। পাতলা করে কাটা মশলা-সিক্ত মাংসখণ্ড আগুনে গরম পাথরের মধ্যে রাখতে হয়। নিশ্চয় পদ্ধতির মধ্যে আরও ঐন্দ্রজালিক কিছু আছে, না হলে পদটি এত মনোহারী হয় কী করে? ইতিমধ্যে মাটির থালায় ছোট ছোট মাটির বাটিতে বিবিধ গুজরাতি আচার দিয়ে গিয়েছে। মাটির গেলাসে কচি পিঁয়াজ, শশা ও মুলোর ফালিও উপস্থিত। উগ্র কাঁচা পিঁয়াজের চাকতি আসে পাত্থর কে কবাবের সঙ্গে। তার মধ্যে একটি অভিনব আচার ছিল, কাঁচা গোলমরিচের। সবুজ রঙের ছোট ছোট দানা একটা কাঠির ওপর মালাখণ্ডের মতো। ঝাঁঝ কমে গিয়েছে, গন্ধ বেড়েছে, স্বাদেও অভিনব। পাত্থর কে কবাব এর একপাত্রে চারটি মাংসের খণ্ড, ৪০ টাকা। কাকোরি কবাবও নেওয়া হয়েছিল।সুপিষ্ট মাংসের কোমল কবাব ভারতবর্ষে দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ-এর মুষ্টিমেয় ক'টি দোকানে পাওয়া যায় বলেই জানতাম। এখানে তার স্বাদ নিয়ে চমৎকৃত হলাম। একই ঘরানার গুণী, রেওয়াজের রেওয়াত করেন না প্রথম গ্রাসেই বোঝা গেল।

এবারে আসুন চুলে কি করামৎ-এ—যা উনুনের ওপর অথবা হাঁড়িতে রান্না হয়েছে। চুজা মশালা পাওয়া যায়, ৩০ টাকা। একটি আস্ত মুরগিশাবক। দিল্লির নিউ জওহারের কথা মনে আছে? সেই স্বাদ যদি ফেরত এনে দিতে পারে, যে কোনও দামই মঞ্জুর। আমি

পরীক্ষা করতে পারিনি। শুনেছি, বিশেষত্বের পদ হল কড়াই মটন চপ, ৪০ টাকা, তারও স্বাদ নেওয়া বাকি আছে। দি ভিলেজে মসুর কি দাল আমার বড় মনোমতো হয়েছিল। আস্ত খোলা সুদ্ধ মুসুরের ডাল, পিঁয়াজ রসুনের সৌরভ আর ধনেপাতার মাদকর্তা। মাটির বাটিতে অনেকখানি ছিল। শেষ করতে পারলাম না। ১০ টাকা। আর একটি পদ আমার মন ভুলিয়েছে। হরি মকাই কি সবজি। কচি ভুট্টার দানার তরকারি। কী উপকরণে রন্ধন হয়েছিল বলতে পারব না। ততক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়ায় আবেশ এসে গিয়েছিল। পদটি সেই আবেশকে আরও গভীর করেছিল। সঙ্গে রুমালি রুটি নেওয়া হয়েছিল, ৪ টাকা।

শেষ পদ কুলফি নিতে পারতাম, ১৫ টাকা। কিন্তু উভয় অর্থেই আর সামর্থ্য ছিল না।

উত্তপ্ত সাকে, গুঁড়ো বরফের বৃত্তে, কাঁচা কুক্কুট মাংস

জাপান যাচ্ছি শুনে এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বললেন, জাপানে সবাই ইংরেজি জানে, কিন্তু কেউ ইংরেজি বোঝে না। ইস্কুলে ইংরেজি কম্পালসারি।

কথাটা হেঁয়ালির মতো, যাবার তাড়ায় অর্থ খোঁজার চেষ্টা করিনি। ওসাকা শহরে সন্ধ্যায় আমাদের ভোজনের নিমন্ত্রণ হল। দলে আমার স্ত্রী এবং আমার এক সহকর্মী। ইতিমধ্যে টোকিওতে কয়েকদিন কেটেছে। জাপানি রীতি-রেওয়াজের ভাসা ভাসা অনুভব হয়েছে। ওসাকার সেই সন্ধ্যায় আমাদের যিনি নিয়ে গেলেন কোনও বিখ্যাত রেস্টুর্যান্টে তাঁর নাম ইয়ামাওয়াকি।

ভারী সাজানো গোছানো, সুপরিসর, অভিজাত ভোজনালয়। কিমোনোপরা পুতুলের মতো ফুটফুটে পরিচারিকা। মনটা বড় প্রসন্ন হয়ে গেল। আমরা পাঁচজন। ইয়ামাওয়াকির সঙ্গে একজন মেয়ে দোভাষী। ইয়ামাওয়াকি নিজে চলনসই ইংরেজি বলেন। ঢোকার মুখে ইয়ামাওয়াকি বললেন, এই রেস্টুর্যান্টের নাম ইয়াকিতরী। এরা র চিকেন, অর্থাৎ কাঁচা মুরগির মাংসের জন্য বিখ্যাত।

শুনে খুব চমকাইনি। জাপানিরা কাঁচা মাছ খান, খেতে দেখেওছি, নিজে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছি। সেও শুনেছি অপূর্ব। আমার কাছে নিঃসন্দেহে অভূতপূর্বও। তাই থাক, পরিচয় করবার সাহস হয়নি। আমি ইয়ামাওয়াকিকে বললাম, আহা, কাঁচা মুরগি, সে না জানি আরও কত উচ্চমার্গের বস্তু। কাঁচা মাছ সাসিমির থেকেও বুঝি উপাদেয়। একটু সমঝদারের গলায় বললাম, তবে কি জানেন, আমার সঙ্গী দুজন নেহাতই হিন্দুস্তানি, তার উপর বাঙালি, ওঁরা ওই স্বর্গীয় বা স্বর্গত মুরগির মর্যাদা বুঝবেন না। ওটা আজ থাক। আপনি অন্য কোনও পদার্থের আদেশ করুন। ধরুন, ইয়াকিতরী। ইয়াকিতরী অনেকটা তন্দুরি মুরগির মতো।

ইয়ামাওয়াকি আমার ইংরেজি ইডিয়ম বোধহয় ঠিক ধরতে পারলেন না। দোভাষী মহিলার দিকে তাকালেন। মহিলা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুললেন। অন্তত আমার তাই মনে হল। জাপানিদের চোখ ঠোঁট কেমন ভাবলেশহীন, সবাই জানে। দোভাষী বললেন, এদের কাঁচা মুরগি একেবারে বেস্টেস্ট। অর্থাৎ শেষ কথা। আমার স্ত্রী জনান্তিকে বাংলায় বললেন, কাঁচা মুরগির আবার গুড, বেটার, বেস্ট কী? কাঁচা মানে কাঁচা।

আমি আবার ইয়ামাওয়াকিকে বলা আমার কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করলাম। বুঝলাম দোভাষী মহিলার খুব পছন্দ হল না। না-হাসা মুখ থেকে হাসি সরিয়ে আসন নিলেন। আসন মানে তাতামি, অর্থাৎ আমাদের মেদিনীপুরের প্রথম শ্রেণীর মাদুর। আমরা সবাই বসলাম। মধ্যে একটা ল্যাকার-করা সুদৃশ্য নিচু টেবিল।

ওঁরা একসময় আহার্যের আদেশ করলেন জাপানি পরিচারিকাকে। প্রথমে অন্য কী এক সুরা এল, কেকের মতো কোনও মিষ্টান্নের সঙ্গে। তারপর পানপাত্রভরা ঈষৎ উত্তপ্ত সাকে। খুচরো আরও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি। অপরূপ পরিবেশনের সুষমা, মেয়েটি যতবার আহার্য ও পানীয় আনে, নতজানু হয়ে পাশে বসে অর্ঘ্যের ভঙ্গিতে পাত্রটি টেবিলে রাখে। আহার্যের পাত্রগুলিও বিচিত্র আকৃতির এবং অলৌকিক নানা শিল্পকর্মে সজ্জিত। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন মায়াবী হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় প্রধান আহার্য এসে পৌঁছল। সভয়ে লক্ষ করলাম সুবর্ণচিত্রাঙ্কিত কমনীয় গোলাকার পাঁচটি পাত্রে গুঁড়ো বরফের বৃত্তের মধ্যে সযত্ন কর্তিত কয়েক খণ্ড কাঁচা মাংস। গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়েছিল কি না মনে নেই, প্রশ্ন করেছিলাম, এগুলি কী? ইয়ামাওয়াকি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, র চিকেন, কাঁচা মুরগি—এরা এ লাইনে বেস্টেস্ট।

আমার স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আমার সহকারীর মুখ দেখে মনে হল তার প্রলয়ঙ্কর কোনও সর্বনাশ আসন্ন। তিনজনেই যদি ওই র চিকেন প্রত্যাখ্যান করি, তা হলে নিমন্ত্রণকর্তার লজ্জার সীমা থাকবে না। শুনেছি, লজ্জা পাওয়ার মতো দুর্দৈবে জাপানিরা হারাকিরি করে—সূক্ষ্ম দীর্ঘ এক বিশেষ অস্ত্রে নিজের উদর ছিন্নভিন্ন করে আপন প্রাণ হরণ করে। অতএব অন্তত একজনকে, আমাকে, নিমন্ত্রণকর্তার সম্ভ্রম রক্ষার্থে ওই কাঁচা কুক্কুট মাংস সমাদর করে খেতে হয়।

তাই খেয়েছিলাম। কেমন করে খেলাম, কতক্ষণে, মুখ চোখের চেহারা কেমন হয়েছিল, কখন সন্ধ্যা ও ভোজন শেষ হল, জিজ্ঞাসা করবেন না। মনেও নেই ভাল। স্মৃতির এই বড় সুবিধা। অপ্রিয় বস্তুগুলি কত সহজে বর্জন করে। আর, শুনেই বা কী করবেন? আমার সুপারিশে খাবেন র চিকেন? বেস্টেস্ট?

দেশে ফিরে বন্ধুকে বলেছিলাম, আরও একটু ভাল করে বোঝানো উচিত ছিল আমার। ওরা যে আমার ইংরেজি বুঝতে পারছে না, আমার মনেও হয়নি। বন্ধু বললেন, তাতেও কোনও সুবিধা হত না। ভদ্র, নম্র বিনয়ী জাত জাপানিরা। ওঁদের ভাষায় 'না' শব্দটি নেই। অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলতে হয়। বুঝতে পারছে না বললেও তোমাকে সেকথা বোঝাতে পারত না।

বন্ধুর কথার সততা যাচাই করিনি। না বলে না এমন জাত যদি কল্পনাতেও থাকে, থাক না। স্বপ্নভগ্ন করে কার লাভ?

জাপানে মাছ রান্না

যিনি রাঁধেন তিনি চুল বাঁধেন না এমন নয়। কিন্তু যিনি চুল বেঁধে কেতকী কেশরে সুরভিত করে শিল্পের পর্যায়ে উন্নত করেন, তিনি নাও রাঁধতে পারেন। তেমনি, যিনি রাঁধেন তিনি অবশ্যই ভোজন করেন। কিন্তু যিনি ভোজন করেন, ভোজনকে আনন্দরূপ দিতে পারেন, তাঁর রাঁধবার দরকার নেই। বরং আমার বিশ্বাস, তাঁর রন্ধনকর্মে না যাওয়াই সমীচীন।

কবেই না বলা হয়ে গিয়েছে, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। এখন বিশেষজ্ঞের যুগ। আমি মন দিয়েছি ভোজ্যে, রন্ধন সম্বন্ধে আমি বিশেষরূপে অজ্ঞ। আমি তাই রন্ধনশালার ত্রিসীমানার মধ্যে যাই না। আমার জানবার দরকার হয় না কোন পদের ফোড়ন হালকা ভাজতে হয়, কোন পদের কড়া।

শাস্ত্রেই বলেছে, মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। আমারও একবার হয়েছিল। এক অসতর্ক মুহূর্তে নেহাতই প্রমাদবশত আমি কোনও অলোকসামান্য ভোজ্যের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তার রন্ধনপদ্ধতি ও উপাদানগুলির উল্লেখ করে ফেলেছিলাম। শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদারের মতো মানুষ, যিনি সবার গুণটাই দেখেন, দোষ দেখতে পান না, তিনিও আমার সেই লেখা পড়ে বলেছিলেন, এই লেখক, অর্থাৎ আমি, রান্নার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। একটিই পদ্ধতি লিখেছে। সেটি সম্পূর্ণ ভুল।

লীলা মজুমদারের তিরস্কার শিরোধার্য করেও আমাকে লিখতে হচ্ছে যে, আমি দুটি বিশিষ্ট পদের রন্ধনে অতিশয় পটু। বস্তুত, পটু না হয়ে উপায় ছিল না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সামনে বসে আমি ওই দুই পদের সৃষ্টি দেখেছি, বুঝতে পেরেছি কুশলী শিল্পীর হাতের স্পর্শ পেলে সাধারণ ভোজ্যও কেমন অলৌকিকের স্তরে পৌঁছে যায়।

দুটি পদের একটির কথা বলছি।

সেই পদটি মাছের। চিংড়িমাছের। মাছ আমি খাই না। প্রকাশ্যে এই স্বীকারোক্তি করতে আমার সংকোচ হয়। লোকে জাল বাঙালি মনে করতে পারে। ভাগ্যক্রমে মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছটাই আমি খাই এবং বলতে লজ্জা নেই, পেলে খুব আনন্দসহকারে খেয়ে থাকি। আমার এমনই ভাগ্য, টোকিও শহরের অন্যতম ভোজনশালায় প্রধান শিল্পী, তাঁকে পাচক, এমনকী শেফ বলে খাটো করব না, আমার জন্য একদিন চিংড়ি মাছের তেম্পুরা সৃষ্টি করেছিলেন।

বাঙালিদের যেমন ধুতিপাঞ্জাবি, ভাত আর মাছের ঝোল, জাপানিদের তেমনি কিমনো, সুকিয়াকি আর তেম্পুরা। টোকিওতে কতগুলি বিশিষ্ট ভোজনশালা আছে। তারা আমাদের সাধারণ ভোজনশালার মতো কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, রোস্ট, রোগানযোশ, মটরপনির প্রভৃতি যাবতীয় নামের আহার্য বিক্রি করে না।

যারা সব কাজে লিপ্ত থাকে, তারা কোনও কাজে পারদর্শী হয় না। তাই জাপানের ওই বিশিষ্ট রেস্টুর‍্যান্টগুলি এক একটি বিশেষ পদ মাত্র পরিবেশন করে। সেখানে ওই বিশেষ পদটি ছাড়া অন্য কোনও পদ প্রস্তুত হবে না। বিশিষ্ট তেম্পুরা প্রস্তুতকারীদের মধ্যে টোকিওতে খুব সুনাম ছিল ইনাগিকু রেস্টুর‍্যান্টের। ইনাগিকুতে শুধুই তেম্পুরা পাওয়া যায়, অন্য কিছু নয়। যেমন সুইহিয়োতে প্রস্তুত হবে কেবলমাত্র সুকিয়াকি।

মনে মনে ভেবে দেখুন একটি ভোজনশালায়, দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু একটি পদই তৈরি হচ্ছে। প্রত্যহের তালিমে যেমন একটি বালক কালে বড়ে গুলাম আলি হয়ে ওঠে, কিংবা ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—এও তেমনি।

আমি যখন ইনাগিকুতে গিয়েছিলাম, তখন ইনাগিকু তেম্পুরা রচনায় প্রথম সারির প্রথমে। ইনাগিকুতে আমার অন্য একটা অভিজ্ঞতাও হল, আমি চিরকাল সুখাদ্যের মনোহর মায়াতে রন্ধনকার্য শুধু অবজ্ঞাই করিনি, প্রায় বিশ্বাস করেছি যে ওই কার্যটা অপ্রাসঙ্গিক। ইনাগিকুতে রন্ধন এবং ভোজনের একটা অপূর্ব অনাস্বাদিত সমন্বয় দেখে আমি সম্মোহিত হয়েছি। সেখানে সেদিন রন্ধন এবং ভোজন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে ইনাগিকু রেস্টুর‍্যান্টে নিয়ে গেলেন আমার জাপানি বন্ধু আন্ডো-সাং। জাপানি ভাষায় বাবু অর্থে সাং বলা হয়। ভোজনশালার বাড়িটি খুব বড় নয়। তবে তিন বা চার তলা। প্রবেশদ্বারের কাছে লিফটে উঠে আমরা দ্বিতলে উপস্থিত হলাম। লিফট থেকে নেমেই ভোজনকক্ষ। খুব বড় নয়। শুনলাম প্রত্যেক তলাতেই এমনি সব খাবার ঘর। ভোজনকক্ষের মাঝখানে বৃত্তাকার বেষ্টনী দেওয়া অংশটি রন্ধনশালা। কোথাও কোনও কাচের, দেওয়ালের বা পর্দার অন্তরাল নেই। নাতিউচ্চ, স্কুলের ডেস্কের মতো বেষ্টনীর ওপরটা সমতল।

পাকশালাকে বলয়ের মতো ঘিরে ওটাই আসলে ভোজনের টেবিল। রসগ্রাহীরা পাশাপাশি বসেন, তাঁদের সামনে মুখোমুখি থাকেন তেম্পুরা স্রষ্টা।

পাকশালার কেন্দ্রে একটি ছোট লিফট। সেই লিফটে চড়ে অল্পক্ষণ পরেই আমাদের আজকের আনন্দবিধায়ক এসে পৌঁছলেন। তাঁর একহাতে একটি লাল

রঙের ল্যাকর-করা সুদৃশ্য ট্রে, অন্য হাতে মনোহর কারুকার্যময় বাঁশের সাজি। বুঝতে পারলাম উপকরণ সব এসে পৌঁছল। তিনি আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েকবার প্রায় আভূমি মাথা নিচু করে আমাদের নমস্কার ও স্বাগত জানালেন। মুখে মন্ত্রের মতো কী সব বলতে থাকলেন, যার অংশবিশেষ আমাদের কানে পৌঁছেছিল, ইরাশাই, ইরাশাই।

এবার রন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে থাকলাম। তিনি নিপুণ হাতে দুটি মুরগির ডিম ভাঙলেন একটি পাত্রে, তাতে দু কাপ ময়দা ও দু কাপ জল মেশালেন। ছোট পোর্টেবল একটা যন্ত্র দিয়ে জিনিসগুলো মিশিয়ে নেওয়া হল মুহূর্তে। মাথাগুলি কেটে বাদ দেওয়া, মাঝামাঝি একটু চিরে চ্যাপটা আকারের এক সারি ফুলের মতো নির্মল চিংড়িমাছ রাখলেন হটপ্লেটের পাশে। ইতিমধ্যে ভারী কড়ায় খানিকটা তেল গরম হতে আরম্ভ করেছে। পরে শুনেছি তেল খুব তপ্ত না হলে তেম্পুরার অপার্থিব স্বাদ হয় না।

তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পার হওয়া চাই। এক সময় আমাদের আহারের বাসনগুলি সাজানো হল। লালের ওপর নকশা করা স্নিগ্ধ বড় প্লেট, চৌকো আকারের ছোট একটা ডিস তাতে ফিকে সবুজের ওপর লালের ফোঁটা আর একটা গাঢ় লাল রঙের ছোট বাটি। সদ্যধৌত পাইন কাঠের টেবিলের ওপর ওই বর্ণময় বাসনগুলি কোনও চিত্রকরের নানা রঙের নকশার মতো আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সঙ্গে কাগজের প্যাকেটে মোড়া স্টেরিলাইজ করা বাঁশের চপস্টিক।

চৌকো ডিশটায় ঝাঁঝালো মুলো কোরা, আর খানিকটা মিহি করে কোরা অথবা বাটা আদা। অন্যদের দেখাদেখি আমিও আদা ও মুলো কোরা গোলবাটির তরল পদার্থে মিশিয়ে নিলাম। তরল পদার্থ আসলে সয়াসস, জাপানিরা আদর করে বলে সয়ু—সামান্য জল মিশিয়ে নির্জীব করা, তাতে এক কণা চিনিও যুক্ত হয়েছে। আমার বন্ধুরা বোঝালেন যে এই সসটাই তেম্পুরার প্রাণ। সসে সকলের জানা উপকরণগুলি ছাড়াও আরও কিছু উপাদান মেশানো হয়েছে, যেমন মিরিন, জাপানি মদিরা সাকের সামান্য মিষ্ট সংস্করণ, আর মেশানো হয় দাশি। দাশি অতি জটিল জিনিস। সোজা কথায় বললে বলা যায় মাছের সুপ। কিন্তু তাতে কতটুকু বলা হল? মানুষ স্তন্যপায়ী জীব বললে মনুষ্যত্বের কতটুকু ধরা যায়? বুঝতে পারলাম, রন্ধনের সবটাই আমার সামনে হলেও, সুস্বাদ সৃষ্টির সম্যক রহস্য উন্মোচিত হয়নি। সেটা শিল্পীর নিজস্ব, সেখানে সাধারণের প্রবেশ নেই।

এরমধ্যে ওস্তাদ কয়েকটি চিংড়ি মাছ লেজ ধরে ডিম-ময়দাগোলায় চুবিয়ে তাঁর তপ্ত কটাহে ছেড়ে দিয়েছেন। পরে জেনেছি কড়ায় তেল ছিল তিলের কিংবা পরিস্রুত বাদামের। রেপসিড তেলও চলতে পারে। ভাজা শুরু হতেই একটা মিশ্র সুগন্ধ পেলাম। এরপর বড় চপস্টিক দিয়ে ওস্তাদ একের পর এক চিংড়ি মাছ তুলে আমাদের পরিবেশন করতে থাকলেন। আমরা ছোট চপস্টিকে সেই তপ্ত মাছকে তৎক্ষণাৎ সয়াসসের গোল বাটিতে বারেক নিমজ্জিত করে মুখে তুলতে লাগলাম। দৈনন্দিন আহার্য মুখে তোলার নিত্য কর্মটা সেদিন কোন স্বপ্নসাগরে যাত্রা শুরু করে অপরূপ

এক আনন্দময় জগতে পৌঁছে গেল। স্বাদে গন্ধে স্পর্শে মোহিত আমরা কজন কতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম, ক-ডজন চিংড়ি মাছের রসাস্বাদ করেছিলাম, সে হিসাব আমি রাখতে পারিনি। মনে আছে, তেম্পুরার মাঝে দু এক খণ্ড পিঁয়াজ, বেগুনের টুকরোও পেয়েছিলাম। আহারে এত মগ্ন ছিলাম যে স্ফটিকের ক্ষুদ্র পাত্রে জাপানি সাকে অনাদরে পড়েছিল। ওঠবার মুখে মদিরার পাত্রটি নিঃশেষ করে দেখি, শিল্পীশ্রেষ্ঠ, ওস্তাদ, পণ্ডিতজি, না শেফ, কী বলব, সেই মানুষটি কোমর থেকে দু ভাঁজ হয়ে বারবার মাথা নোয়াচ্ছেন, আর অস্ফুটে বলছেন সায়োনারা, বিদায়। মানুষের কী অপরিসীম ভাগ্য, নশ্বর সব জিনিস চলে গেলেও তারা, স্মৃতিতে অক্ষুণ্ণ থাকে।

আমি মাছ খাই না

হাতের কাছে বইটা নেই, তবে স্পষ্ট মনে আছে, জাপানি রন্ধনবিদ্যার সেই বই-তে কাঁচা মাছ পদটির পাকপ্রণালী ছিল। শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়, যে মাছ কাঁচা অবস্থায় ভোজন করা হবে তার আবার রন্ধন-প্রণালী কীসের? পাক প্রণালীর বই-এ কাঁচা মাছের উল্লেখ অবান্তর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। শুনে আরও আশ্চর্য হবেন, কাঁচা মাছ প্রস্তুতের ছ'টি প্রণালী ওই বইটিতে বিবৃত হয়েছে।

আসলে, রন্ধন মানে তো শুধু পাক করা নয়। সেটা নেহাতই আভিধানিক বাচ্যার্থ। ভাগ্যে, অভিধান আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না। তাই বাচ্যার্থের অধিক অনেক শব্দ তার ব্যঞ্জনা দিয়ে আমাদের প্রাণে একটি আনন্দের হাওয়া বয়ে আনে। আমাদের অভিধানেও সাত রকম পাকের উল্লেখ আছে—ভাজা, সেদ্ধ, পচানো, ঝলসানো, সেঁকা, তান্দুর এবং পোড়ানো। তার অন্তর্গত নয় কাঁচা। জাপানিরা রন্ধনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করে তার সঙ্গে যুক্ত করেছে কাঁচা পাক প্রণালী।

ওসব তাত্ত্বিক কথা থাক। সভ্য জগতে ভোজ্য প্রস্তুত ক্রিয়ার শেষ হয় না রান্নাতে। রন্ধনের উদ্দেশ্য হল সুস্বাদু, সুখস্পর্শ এবং দৃষ্টিনন্দন খাদ্য উপস্থিত করা। সে কাজ সিদ্ধ হয় তখনই যখন আহরণ থেকে পরিবেশন পর্যন্ত বৃত্তরেখাটি সুরুচি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। জাপানি পাকপ্রণালীতে তাই কাঁচা মাছ আহরণ থেকে অনুষ্ঠানের শুরু তারপর মাছ কাটা।

একে এক শিল্পই বলা যায় কারণ মাছ কাটার কাজও সহজ নয়। কী মাছ আজ কাঁচা খাওয়া হচ্ছে অনেকটা তার ওপর মাছ কোটবার বিধি নির্ভর করে। কেমন ছুরি দিয়ে কাটবেন তাও। কত বড় বড় টুকরো হবে, স্লাইস, না ফালি, না চাকা নাকি চৌকো কিউব?

এসব নির্ভর করবে কোন মৎস্যকুলের কাঁচা মাছ সেদিন রন্ধন হচ্ছে তার ওপর। মাছ কাটার সময় ছুরিটা সোজা ধরবেন অথবা তেরছা করে, পরিবেশনের সময় খণ্ডগুলি ওপর ওপর রাখবেন, অথবা পাশাপাশি, কিংবা সিঁড়ির ধরনে ধাপে ধাপে, এ সবের অনুপুঙ্খ নির্দেশ থাকে জাপানি পাকপ্রণালীতে। আনাজ কাটার ক্ষেত্রে আমাদেরও কিছু পরম্পরা ছিল। কে না জানে, ভাজার, ঝোলের, ডালনার, চচ্চড়ির জন্য আলুর আকার ও আয়তন ভিন্ন হতে হয়।

অভিজাত মানুষেরা কাঁচা মাছের ওপরে সাজানোর জন্যও আর কিছু, যেমন ধনেপাতা, পিঁয়াজকলির কুচি বা পার্সলে ইত্যাদি দেওয়া পছন্দ করেন না। নিরাভরণ যুবতীর সৌন্দর্য যেমন নির্বাধ দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁদের মতে তেমনি ওই সুস্বাদ মাছকে যেমন আছে তেমনি আসতে দাও, সাজ করিও না। পাশের ছোট পাটিতে অবশ্য খানিকটা অতি লঘু সয়াসস (জাপানিরা বলে সয়ু) এবং একটি ছোট প্লেটে মুলোকোরা দেওয়া বিধেয়। যাঁরা অত সোফিসটিকেটেড নন, তাঁরা মাছের খণ্ডটি মুখে তোলবার আগে একটু মুলোকোরা মাখিয়ে এবং সয়ুতে সামান্য ছুঁইয়ে নেন।

আমার অবশ্য তাতেও হয়নি। 'যেমন আছ' মৎসখন্ডটি বলব, অথবা বলব উলঙ্গ মৎস্যখণ্ড, যাই বলি চোখ বুজে গলাধঃকরণ করবার পর আমাকে চুমুক দিয়ে আধবাটি সয়ু পান করে বিপরীত-পথগামী গ্রাসকে আটকাতে হল। তার সঙ্গে ঝাঁঝালো মুলোকোরাও যোগ করতে হয়েছিল। কাঁচা মাছ গ্রহণের পর আমার শরীরে আকস্মিক প্রভঞ্জনের অপারগ অবশ্য একটাই। আমি মাছ খাই না। সেই কারণেই বোধকরি আমার নজরে পড়েনি সযত্ন পরিবেশিত নগ্ন মৎস্যখণ্ডের অতিরিক্ত মঞ্চে আলোকসম্পাত ও দৃশ্যনিচয়ের মতো কৃত বিভিন্ন প্রকার বাসন দেওয়া হয়েছিল আমার টেবিলে। তারা যে শুধু আকারে, আয়তনে ভিন্ন তা নয়, তাদের ওপর যে নকশাগুলি ছিল সেগুলিও ভিন্ন। ভিন্ন আকারের, ভিন্ন রঙে ছবি আঁকা পাত্রগুলি আসলে সেদিনের বিধৃত পদ এবং সেই সময়ের ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক সুরে বাঁধা হওয়া চাই, তবেই না খাদ্য সুখাদ্য হবে, সুখাদ্য স্বাদিষ্ঠ হবে। এই সরল সূক্ষ্ম সামান্য রীতিবিধান নিয়ে জাপানি মাছের জটিল পদ তৈরি হয়। সুতরাং, পদ তৈরির পদ্ধতি, পাক না হলেও, না-পাক অবস্থাতেও পাকপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হবে, এ আর বিচিত্র কী।

বাঙালিরাও তো জাপানিদের মতো মাছভাত পছন্দ করে। জাপানিরা ভাজা মাছ, সেঁকা মাছ, সেদ্ধ মাছও খায়। আর আমরা বাঙালিরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসের আকর কাঁচা মাছ, রাঁধতে জানি না। শুনে আমার জাপানি গৃহকর্তা খুব আমোদ পেলেন। বুঝতে পারলাম মনে মনে বলছেন, এই জন্যই না জাপানিরা এত অগ্রগামী। সাতরকম পাকপ্রণালীতে পণ্ডিত হয়েও বাঙালি কাঁচা মাছের মর্যাদা বুঝতে পারেনি। তারকা দেখে বেড়াচ্ছে, দোরের সামনেই গাড্ডা।

আমাদের দৌড় শুঁটকি বা শুকনো মাছ পর্যন্ত। তাও বিনা-আগুন রেঁধে খাব—এমন নয়। অবশ্য তার কাছে যাবার সাহস হয়নি আমার কোনও দিন। তার পূর্বেই গন্ধে বিপর্যস্ত হয়ে যাই। মাছ রন্ধনের পর শুঁটকি অত্যন্ত বিনীত, কিন্তু নাকি স্বাদের ইন্দ্রজাল বইয়ে দেয়। আমি বিশ্বাস করি না।

আমার এক সহকর্মী জার্মান রমণী বিয়ে করবার পর আমাকে খেতে বলেছিলেন তাঁর বাড়িতে। আমি অনেক আশা করে গিয়েছিলাম। ভাবছি বিখ্যাত কোনও জার্মান সুপ এবং অশ্রুত জার্মান পদ উপস্থিত হবে। হায় আমার ভাগ্য। জার্মান টেবিল থেকে সরাসরি প্রতিস্থাপিত হলাম বঙ্গভোজনকলায়। জার্মান যুবতী ভাঙা বাংলায় বললেন, আপনি বাঙালি, মাছ-ভাত ভালবাসেন, আপনার জন্য পারশে মাছ ও ভাত রান্না করেছি। জার্মানরা এক কথার মানুষ। টেবিলে নুন মরিচ ছাড়া আর কিছু খাবার ছিল না। পারশে মাছ খাওয়া পরে, তার বিশাল তরওয়ালের মতো চেহারা দেখেই আমি মূর্ছাহত। তাও খেয়েছিলাম, খেতে হয়েছিল। বিশ্বাস করুন কাঁচা মাছের সঙ্গে রান্না করা পারশে মাছের কোনও তফাত পাইনি। শুঁটকিও ওই দলেরই হবে।

রক্তাম্বরে ভোজন

পশ্চিমি কালচারে রান্নাবান্নায় এলেমের ওপর তেমন জোর দেওয়া হয় না। তাঁদের ঐতিহ্যে আহার্যের শোভাবর্ধন ও ভোজননামক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিটাকে সুষমা-মণ্ডিত করার একটা স্পষ্ট ধারা আছে। বলা যেতে পারে, আমাদের নজর যেমন পাকশালায়, ওদেশের নজরটা তেমনি ভোজনশালায়। তাই বোধকরি উচ্চকোটির ভোজনশালায় ডিনারে যেতে হলে বিশেষ পোশাকের দরকার হয়। ইংরেজদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, শুধু আর্ল কিংবা ডিউক নয়, মধ্যবর্গের ভদ্রজনেরাও ডিনারে সাজসজ্জা করে অবতীর্ণ হন। সমারসেট মমের গল্পে তো পড়েইছেন মালয়ের অগম্য অরণ্যের মধ্যে প্লান্টার সাহেব ডিনারের সময় একটা ছোট হুইস্কি চড়াবার পর কায়দা অনুসারে ডিনার জ্যাকেট পরে ডিনারে বসেছেন একা একা। দেখবার কেউ নেই, তবুও।

আমাদের যেমন পূজায়। আসলে অন্য পোশাকে এলে পরিবেশ দূষণের মতো কাজ হয়ে যেত, ভোজনের পরিমণ্ডলটা হয়তো কলুষিত হত। পরিবেশ মনোরম হলে, সামান্য আহার্যও অমৃতসমান মনে হবে।

ভাগ্যিস আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ছিল, তাই কোনও দেশাভিমানী নাগরিক রিট করে অন্তত রাষ্ট্রয়ত্ত হোটেলগুলিকে পোশাকের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আপনি অশোক হোটেলের বিশাল ভোজনশালায় নেংটি পরেও ভোজনে বসতে পারেন, অবশ্য যদি না অশ্লীলতার দায়ে পড়েন। অন্যান্য মহার্ঘ স্থানেও, যেখানে ব্যান্ডের সঙ্গে যুগলনৃত্য হয়, প্রায় যা খুশি পরে যাওয়া যায়। বুশ শার্ট তো চলেই: তবে এখনও হাফ-প্যান্ট দেখিনি।

টোকিও থেকে শ'খানেক মাইলের মধ্যে সপ্তহ্রদের রাজ্যের মধ্যমণি যে কোনে নামের

এক অলৌকিক জনপদ আছে। টোকিও থেকে বিস্তৃত দ্রুতগামী রাস্তায়, জাপানিরা যাকে বলে 'কুলিং কার,' অর্থাৎ এয়ারকন্ডিশানড গাড়িতে চড়ে একদা সন্ধ্যায় হাকোনেতে গিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমে আলোছায়া দিয়ে রচনা করা অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যখন এক মূল্যবান ভোজনশালা প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম, তখন ঝিল্লি এবং অদৃশ্য ঝরণার জলতরঙ্গের বৃন্দ-বাদন শুনে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আগস্ট মাস। হাকোনে সামান্য উচ্চভূমিতে হলেও বেশ গরম। আমি অবশ্য ইংরেজদের দোরধরা সুট পরেই গিয়েছি। আমার সঙ্গী, সচিব ও পথপ্রদর্শক জাপানি বিচক্ষণ বন্ধু হালকা বুশ শার্ট পরেছিলেন। উদার কক্ষের দ্বাররক্ষী আমাদের প্রবেশে বাধা দিলেন। উপযুক্ত পরিচ্ছদ না হলে ওই ভোজনকক্ষে প্রবেশ নিষেধ। উপযুক্ত অর্থাৎ সুট পরা চাই। আমি একটু চমকে গেলাম। তবে ভোজনশালা জাপানি তো, তারা সব রোগের নিদান জানে। মুহূর্তে একটা টাই এবং কোট উপস্থিত। আমার জাপানি সঙ্গী বুশশার্টের ওপর ওই দুটি চড়িয়ে আমার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন।

এ ঘটনা পঁয়ত্রিশ বছর আগের। এতদিনে জাপানিরা আরও সাহেব হয়েছে না জাপানি, বলতে পারব না। ওই রেস্টুর‍্যান্টে আর যাবার সুযোগ হয়নি।

গিয়েছিলাম আমেরিকার লুইসিয়ানা রাজ্যের রাজধানী নিউ অরলিন্স শহরে। শুভাকাঙ্ক্ষী এক বন্ধু খবর দিলেন এই শহরে এসে যে ব্রেনানের ভোজনশালায় ব্রেকফাস্ট না করে ফিরে গিয়েছে, তার সমস্ত জীবনটাই বৃথা। আর, তিনি বললেন তেমনি অপার সুখের আকর আর একটি স্থানে অবশ্যই যাওয়া প্রয়োজন নৈশভোজের জন্য। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে বুর্বন স্ট্রিটের কাছে ওলড নলিন্স কুকারি।

আমরা তো 'যাব আমায় যেতেই হবে।' বলে বেরিয়ে পড়লাম। তখনও সন্ধে নামেনি। ঘড়িতে অবশ্য রাত নটা। টেম্পারেচার একশোর ওপর। পোশাক সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি শার্ট গায়ে দিয়েছি। কোট নেই। টাই-এর কথা মনে পড়লে শরীর কুঁকড়ে উঠছে। নিউ অরলিন্স ফরাসি প্রভাবের শহর। ফ্রান্সেই না প্রথম বিপ্লব হয়েছিল? সেদেশের ঐতিহ্যে পোশাক-আশাকের কড়াকড়ি বড়ই বিধর্মী কাজ হবে।

বলে রাখা ভাল নলিন্স কারও নাম নয়। পুরাতন অধিবাসীরা তাঁদের প্রিয় শহর নিউ অরলিন্সকে আদর করে এবং সংক্ষেপে নলিন্স বলেন। সেই নাম থেকেই ভোজনশালার নাম। গিয়ে শুনি ভোজনকক্ষে স্থান নেই। কক্ষটি দোতলায়। আমরা একতলার পানশালায় আরও জনাপঁচিশ অপেক্ষমান অতিথির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা সিঞ্চিত করলাম। নিউ অরলিন্সের প্রাণাধিক প্রিয় পানীয় হারিকেন।

কখনও সুযোগ হলে সে পানীয়ের কথা শোনাব। এমন দেবভোগ্য পানীয় এখনও পৃথিবীতে আছে, দেবতারা ফিরিয়ে নেননি—ভারী আশ্চর্য লাগল।

যথাকালে, অর্থাৎ অনেক অপেক্ষার পর ওপরে ডাক পড়ল। নির্বিঘ্নে আসন নিলাম। কেউ পোশাকের কথা তুলল না। খাবার আদেশ করতেও সময় লাগল না। চিংড়ি মাছের একটি পদ আদেশ করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে একটি প্রবর পরিচারকের পেছন পেছন একটা ট্রে হাতে নিয়ে আর একজন পরিচারক আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। ট্রের ওপর থেকে দুটি ডগডগে লাল রঙের পুরু উজ্জ্বল কাপড়ের পরিচ্ছদ নিয়ে সে আমাদের

পরাতে লাগল। বুঝলাম যথোপযুক্ত পোশাক পরা হয়নি, তার শাস্তি। ফরাসি প্রভাবিত শহরেও পোশাক নিয়ে এত রক্ষণশীলতা! পোশাকের সামনেটা আজানু লম্বা, পেছনে কিছু নেই। আস্তিনও অনুপস্থিত। সুদৃশ্য লেসের ফিতে দিয়ে পোশাক দুটি আমাদের গলায় প্রজাপতি গ্রন্থি বেঁধে আভূমি নমস্কার করে পরিচারক দুজন বিদায় নিল। আমরা দেবসভায় ইন্দ্র ও তাঁর মহিষীর মতো উজ্জ্বল রক্তাম্বরে সেই বিশাল অতিথি-পূর্ণ কক্ষে শোভা পেতে লাগলাম।

নিজের মুখ দেখা যায় না। গৃহিণীর মুখ দেখলাম লাল হয়ে গিয়েছে, লজ্জায় না আমার প্রতি রাগে জিজ্ঞাসা করিনি। একটু পরে দুটি কাচের জামবাটি পূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল টেবিলে রেখে গেল আর একজন। আহারের যন্ত্রাদিও পৌঁছল এবং দুটি ছোট সাঁড়াশি। তারপর আবার শোভাযাত্রা করে আমাদের আদিষ্ট পদ যখন এসে পৌঁছল তখন আমাদের লজ্জা প্রশমিত হল। দু-বাটি ঝোলের মধ্যে ছটি করে মুণ্ডহীন খোলাসুদ্ধ চিংড়ি মাছ। সদ্য মিসিসিপির ঘোলা জলে অস্তগামী সূর্যের খেলা দেখেছি। তেমনি রক্তাভ বাদামি ঝোল। জামবাটিগুলি মাঝে মাঝে হাত ধোবার জন্য। খোলা ছাড়াতে গেলে পাছে জামাকাপড়ের দাগ হয়ে যায়, তাই ওই গলবস্ত্রও যন্ত্রাদির সমাবেশ। শিশুদের যেমন দুধ খাওয়াবার সময় গলায় বিব বেঁধে দেওয়া হয়, আমাদের গলায় তারই পরিমার্জিত প্রলম্বিত রক্তবর্ণ সংস্করণ। আমি শুধু শুধুই এতক্ষণ মনে মনে ফরাসি বিপ্লবের ঔদার্যের ওপর কটাক্ষ করছিলাম। আহার্য কেমন ছিল সে অন্য কাহিনী।

দীর্ঘশ্বাস

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমি বুঝি এক জন্মেই মান্ধাতা হয়ে গিয়েছি। আমি ডিম কিনেছি টাকায় চৌষট্টিটা এই কলকাতা শহরে। দু পয়সায় (আজকের তিন নয়াপয়সা) ডবল ডিমের মামলেট সন্তোষ কেবিনে। দিলখুসা কেবিনের সুস্বাদ, প্রমাণ আকারের চপের দাম ছিল এক আনা (টাকায় ষোলোটা)। তার সঙ্গে একই দামের কাটলেট এক খণ্ড নিয়ে বৈকালিক জলযোগ করলে নৈশভোজনের সামর্থ্য কমে যেত। আর সে কী কাটলেট, মিহি করে থোড়া কিমা, বিস্কুটের গুঁড়োর আস্তরণে মুচমুচে, কাঁচা লঙ্কার সূক্ষ্ম সৌরভ। সেই চপ কাটলেটের এখন দাম আড়াই টাকা তিন টাকা, দোকানে তেমনি ভিড়, কিন্তু স্বাদগন্ধে সমৃদ্ধ আমার সেই প্রিয় পদার্থ দুটি কোথায় গেল? আজকের সংস্করণের মধ্যে তাদের ছায়াও যে খুঁজে পাই না। অথচ এ তো মাত্র সেদিনের কথা। বছর ত্রিশ আগে দাম সবে কিছু কিছু বেড়েছিল, কিন্তু পদগুলির স্বাদ নিলেই চেনা যেত। আর এখন?

অপরপক্ষে, এই ত্রিশ বছরে মুম্বইতে আমার কটি প্রিয় ভোজনশালায় মূল্যবৃদ্ধি প্রচণ্ড হয়েছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টির রকমফের হয়নি। থ্যাকার, পুরণমল কি ঘসেটির দোকানে বিপুল আকারের পুরি বা কচুরি, একটা রসাদার এবং একটা চোখার সহযোগে ত্রিশ বছর ধরে মায়ার আসর বসিয়ে রেখেছে। অনেকে একটু আচার পছন্দ করেন। আমার প্রয়োজন হয় না। চোখাতে হিং-এর সঙ্গে শুকনো লঙ্কার গুঁড়োর স্বাদ সৌরভের এমন একটা আশ্চর্য সমন্বয় হয়, যার মায়াজাল ত্রিশ বছর অক্ষয় হয়ে আছে।

তা হলে কি আমি মান্ধাতা নয়। নয় যে তার সানন্দ প্রমাণ পেলাম সেদিন যখন কথায় কথায় হরেকেষ্টর নাম উঠল। মেদিনীপুরের কোথায় যেন বাড়ি হরেকেষ্টর। সারা বছর

সিমলে অঞ্চলে ঘুগনি বেচত। প্রায় জলশূন্য, খানিকটা মণ্ডের মতো, তারই মধ্যে মটরের আকারের ছায়া দেখা যায়। লবঙ্গ আর সেঁকে নেওয়া জিরা চূর্ণ করে ছড়ানো। সেই অপরূপ পদার্থের নাম করতেই দেখলাম আরও কটি রসনা রসস্থ হল। স্মৃতির অতল থেকে উঠে এসে হরেকেষ্ট তাঁদের সুখের কৈশোরের জন্য মন কেমন করিয়ে দিল। শুনলাম, হরেকেষ্টর ছেলে নাকি এখন বাবার প্র্যাকটিস নিয়েছে। তার কেমন হাতযশ পরখ করা হয়নি।

বম্বের ক্রিম সেন্টারের ছোলা বাথুরা দেখুন। তার স্বাদও যেন চিরন্তন। লেবুর জারকে পিঁয়াজ এবং গাজরের ফালির আচারের টাকনা দিয়ে এমন উপাদেয় বৈকালিক আহার খুব কমই পাওয়া যাবে। তার ওপর চৌপাটির ওপর দোকান। অতিথি সমাগমে গমগম করছে। কই, একটুও তো বদলায়নি।

কলকাতায় গ্রে স্ট্রিট, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে মিত্র কাফেতে শেষ কবে গেছেন? যখন নাম ছিল মিত্র কেফ? নাম বদলে স্বাদের এমন বদল হয়? অথবা অ্যালেনের কথা ভাবুন। কীসের যেন আবিষ্কারক ছিলেন তাঁরা, চিংড়ির কাটলেটের? সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও না। কিন্তু অ্যালেন এখনও আছে। কদাচিৎ চিংড়ি পাওয়া গেলেও কাটলেট যাঁরা স্বাদে অভিষিক্ত করতে পারতেন, তাঁরা বুঝি নিরুদ্দেশ।

চৌরঙ্গির অনাদিতে প্রথম মোঘলাই পরোটা আর ফাউল কবিরাজি কাটলেটের সঙ্গে সবিস্ময় পরিচয় হয়েছিল। তখন অনাদির শৈশব, আমার কৈশোর। আমাকে তো এখনও দেখলে সবাই চিনতে পারে, না হয় চুল একটু কম, প্লাস পাওয়ার চশমা পরি, তবু। কিন্তু অনাদি? আর চেনা যায়? খুঁজে পাওয়া যায় সেই মোঘলাই আর ফাউল কবিরাজিকে— যারা অভিনবত্বে এবং স্বাদ-মাধুর্যে আপনাকে বশ করেছিল, আচ্ছন্ন করেছিল? দিলখুস বলছে তারাই ফাউল কবিরাজি প্রথম করে।

কিংবা বসন্ত কেবিনের কথা ভাবুন। আপনার উদ্ভিন্ন যৌবনের কলেজ পালানোর আশ্রয়, চা-টোস্ট-ডিমসিদ্ধ সহজ কৃতিতে অতুলনীয়। এখনও কি সেই স্বাদ আছে? অথচ দেখুন, পুনার ডেকান জিমখানার লাকি বা গুডলাক রেস্টুর‍্যান্ট তিন পুরুষ ধরে এখনও ছাত্রদের এবং তাদের অভিভাবকদের মজিয়ে রেখেছে। আমাদের নেপাল, দ্বারিক, পুঁটিরাম পারে না কেন? সেদিন পুঁটিরামের রাধাবল্লভির আশায় গিয়েছিলাম। আশ মিটল না। দোকানের চাকচিক্য বেড়েছে, সে কি রাধাবল্লভির স্বাদ ব্যয় করে। সত্যি বলতে কী, তারপর আর নেপাল দ্বারিকের খবর নেবার সাহস হল না। কত মনোভঙ্গ একটা মানুষের সহ্য হবে?

দশ বছর দিল্লির চাঁদনি চৌকের পরোটা গলিতে যাইনি। কিন্তু স্থির বিশ্বাস তাদের সম্ভারের সৌকর্য কিছুমাত্র কমেনি। জয়পুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এ বছর গেছলাম, এক যুগ পরে। এসব দোকানে গেলে বড় আশ্বাস হয়। চেনা খাবার চেনা প্রিয় মুখের মতো আশ্বাস দেয়, আমি কিছুমাত্র বদলাইনি। সুখের স্বর্গ বড় নিটোল হয়।

বেশি দিনের কথা নয়, দশ বারো বছর আগেও লেকমার্কেটের রাধুবাবুর প্রবল পরাক্রম ছিল। পশার এখনও কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু এ কী দিলেন রাধুবাবু চপ কাটলেট বলে? আর স্টু, একেবারে পরমান্নের স্বাদ। আমি তো মাংসের স্টু চেয়েছিলাম। তবে?

তবে কি আমিই বদলে গিয়েছি, এবং এতই বদলে গিয়েছি যে চেনা জিনিসগুলোও চিনতে পারি না? দোকানের সামনে তেমনি অতিথির জটলা। তাঁরা নিশ্চয় আনন্দ পাচ্ছেন। ডেকার্স লেনে চিত্তদার দোকানে গেছেন কখনও? নতুন অভিজ্ঞতার জন্য একবার যাওয়া প্রয়োজন। এত বড় পশার আমি কারও দেখিনি আগে। বসার ব্যবস্থাই নেই, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সবাই চিত্তদার সৃষ্টির আস্বাদ নিচ্ছেন। এত লোক, এত কেনাবেচা, তার মধ্যে চিত্তদা কী করে হিসাব রাখছেন, দাম নিচ্ছেন, তিনিই জানেন। অথবা, হয়তো জানেন না। কিন্তু লোক সমাগমটা সত্যি। নিশ্চয় কোনও রসে মজে এঁদের এখানে নিত্য আসা-যাওয়া। ফিরে ফিরে আসা। খাবার যদিও আহামরি নয়, কিন্তু জনপ্রিয়তা দেখবার মতো। ফিশফিঙ্গার পাওয়া যায়, নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ মাছের— ২ টাকা। ফ্রাইও পাবেন, এক মূল্যে। আমার পক্ষপাত ফিশ ফিঙ্গার। মটন স্টু একপাত্র ৩.৫০ টাকা। কিন্তু এখানে সর্বাধিক বিক্রি হয় এবং যার জন্যই এত ভিড়, তা হল ঘুঘনি, ৬০ পয়সা, সঙ্গে পাঁউরুটি ৩০ পয়সা। ঘুঘনিও উঁচুদরের কিছু নয়। একটু মিষ্টি ঘেঁষা। ঝোলঝোল, গরম পরিবেশিত হয়। মাছের রোল নিতে পারেন, অনেকে রোল পছন্দ করেন ২.২৫ টাকা। কিন্তু রোলের কথায় আবার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। হাজরা পার্কের পুবে কাফেতে রোল আস্বাদ করেছেন, বছর দশেক আগে? তেমনটি আর হল না। তার মানে কি এই, আমি সত্যিই হারিয়ে গেছি, তাই পুরনো প্রিয় জিনিসগুলো খুঁজে পাচ্ছি না, না কি আমিই মান্ধাতা?

নিজের মুখে ঝাল

কথায় বলে পরের মুখে ঝাল খেতে নেই। অনেক সুভাষিতের মতো এই কথাটিও সর্বৈব ভুল। নিজের মুখে ঝাল খেতে গিয়ে অথবা খেতে বাধ্য হয়ে আমি যে কী নাকাল হয়েছি, সেই কাহিনী বলি।

কথায় এ-ও বলে, যা শত্রু পরে পরে। ঝালও পরের ওপর দিয়ে গেলে সকলেরই মঙ্গল। আসলে, শত্রুকে আমরা ঠিক চিনে উঠতে পারি না সবসময়। তা ছাড়া, আমি ঝাল পছন্দ করি। ব্যঞ্জনে ঝাল না থাকলে নিরুত্তাপ ভালবাসার মতো নিস্তেজ মনে হয়। পুরুষের রক্তধারা নেচে না উঠলে প্রেম যেমন জোলো হয়ে যায়। ঝালও তেমনি, কান ঈষৎ লালচে না হলে, নিশ্বাস একটু দ্রুত না হলে মজা থাকে না। স্বাদ পূর্ণ হয় না।

জীবনের দুঃখ এই যে, আমাদের মাত্রাজ্ঞান কম। মাত্রাজ্ঞানের অভাবে আমাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। স্থান ইথিয়োপিয়ার রাজধানী আদিস আবাবা। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। আমাদের হোটেলে ইথিয়োপিয়ান ভোজ্যের একটি স্বতন্ত্র ভোজনশালা ছিল। সেখানে ইথিয়োপিয়ান খাবার পরিবেশিত হত। হোটেলের লাগোয়া একটি আলাদা বাড়িতে এই ভোজনশালা। দেশি বাড়ির আকারে। কাঠের ব্যবহার বেশি। গোলাকার। মাথার ওপর খড়ের ছাওয়া চূড়ার স্থাপত্য বেশ ভাল লেগেছিল।

নীচে পানশালা, দোতলায় রেস্টুর‍্যান্ট। সেখানে গিয়ে দেখি ইতস্তত সোফাকোচ সাজানো। আমরা দুটি সোফাতে আসীন হলাম। অনুমান করেছিলাম, এখানে বসে মদ্যাদি পানের পর ভেতরে কোনও ভোজনকক্ষে নিয়ে যাবে। আমাদের সামনে একটি বড় সেন্টার টেবিল। তার ওপরে এবং টেবিলের সমস্তটা ঘিরে একটি খর্ব টোপর বা চাষিদের টোকার মতো। বাঁশের সূক্ষ্ম কাজ। এই বস্তুটির কী প্রয়োজনে টেবিল জুড়ে

বসে আছে, বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে পানীয় এসে গিয়েছিল, গেলাস দুটি পাশের ছোট টেবিলে রেখে খাদ্যতালিকায় মন দিলাম। খাদ্য নির্বাচন সহজেই হয়ে গেল। ইথিয়োপিয়ান নাম আমাদের অপরিচিত বলে, ইংরেজিতে পদগুলির বর্ণনা দেওয়া ছিল। আমরা যে পদটি আদেশ করলাম তার দুটি ভাষ্য, একটিতে লেখা ছিল হট অর্থাৎ ঝাল এবং দ্বিতীয়টিতে 'উইথ টেম্পারেট সস' যার মানে সহনযোগ্য সস। বুঝতে অসুবিধা হল না, দ্বিতীয় ভাষ্য বিদেশিদের জন্য, যাঁরা লঙ্কার নাম শুনলেই ভীত হন। আমরা নির্ভয়ে প্রথম ভাষ্য 'হট' দিতে বললাম। পদের ইথিয়োপিয়ান নামটা মনে নেই। মনে না থাকার কারণ বলার জন্য এই বৃত্তান্ত।

কিছুক্ষণ পরে সুদৃশ্য পরিচারক একটি বড় থালার ওপর, আমাদের টেবিলে যেমন, তেমনি টোপর চাপিয়ে হাজির হল। টেবিলের টোপরটি সরিয়ে টেবিল জুড়ে বড় থালাটি বসানো হল সেখানে। টোপর তুলতে দেখি, বড় থালার ওপর একটা ঈষৎ বাদামি রঙের কাগজ বা কাপড় পাতা। তার ওপর ছোট ছোট মাংসখণ্ড, রক্তবর্ণ গাঢ় কোনও রসে আশ্লিষ্ট। পরিচারকের ইঙ্গিতে বুঝলাম, সে আশা করছে, আমরা ভোজন শুরু করব। অর্থাৎ, এক থালা থেকেই দুজনকে ভোজন করতে হবে। চারজন অতিথি হলেও ওই এক থালা। যে আস্তরণটিকে কাগজ বা কাপড় ভেবেছিলাম, সেটি আসলে সরুচাকলি, রুটি বা দোসা, যা বলতে চান। সেই আস্তরণ ছিঁড়ে মাংস সহযোগে ভোজন করতে হবে। শুরু করেই প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। আজও ভুলিনি। ঝাল এত তীব্র হতে পারে, কখনও ভাবিনি। জিহ্বা তো জ্বলতে থাকলই, গলা বুজে গেল, সর্ব শরীর দিয়ে আগুন বেরুতে থাকল। পূর্বাপর কিছুই ভাল মনে নেই। থকথকে ঝোল থেকে মাংসখণ্ডগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে, নীচের রুটি বা সরুচাকলিতে ভাল করে মুছে সন্তর্পণে খেয়েছিলাম। শেষে অপরিচিত কোনও মিষ্টান্ন অত্যন্ত ভাল লেগেছিল।

আরও নানা স্থানে, নানা পরিবেশে ঝালের মুখোমুখি হয়েছি। কখনও তীব্র ঝাল অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছে, কখনও স্বপ্রজ্জ্বলিত ঝালের আগুনে জ্বলেছি। আমরা যাকে ঝাল বলি, তারও রকমফের আছে। আমরা মোটামুটি চার প্রকারের ঝালের সঙ্গে পরিচিত। শুষ্ক লাল লঙ্কা গুঁড়ো বা বাটা, যা প্রযুক্ত হয়েছিল আদিস আবাবার ভোজনশালায়। এই শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, ব্যঞ্জনের মধ্যেই কোনও সতর্কবাণী উচ্চারণ না করে লুকিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ঝাল হয় শুষ্ক লঙ্কার, যেখানে লঙ্কা সশরীরে বর্তমান। এটা অন্তত সম্মুখ সমর। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বখাত সলিলে ডুবতে আগ্রহী, তাকে বাঁচাবে কে?

দক্ষিণ চিনের সেচুয়ান প্রদেশের পাক-প্রণালীতে তেল, মশলা ব্যবহারে কার্পণ্য নেই। একদা সেচুয়ানের রাজধানী চেঙ্ডু শহরে গিয়েছিলাম। আমার নিমন্ত্রণকর্তা নিয়ে গেলেন একটি বিশিষ্ট ভোজনশালায় এবং বললেন যে, চিনের পাক-প্রণালীতে সেচুয়ানের স্থান সবার ওপরে। ম্যান্ডারিন পাকধারার মতো রক্তাল্পতায় ভোগে না। তবে হ্যাঁ, এত তীব্র সুখ সবার সহ্য হয় না।

চিনারা আমাদের কোথাও কোথাও ভয় দেখায় জানি, আমরা মোকাবিলাও করি। কিন্তু ঝালের ক্ষেত্রেও এরা আমাদের ভয় দেখাবে? যে সব উদাসীন চিনা খাবার

আমাদের পরিচিত, তাতে কত ঝাল দেবে যে, আমরা বাঙালিরা ভীত হব? আমি পরশুরামের চাটুজ্যেমশায়, যাঁকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছু নিয়েছে, তাঁর মতো বললাম, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। আমরাও যথেষ্ট ঝাল খেয়ে থাকি।

অনতিকালের মধ্যে ভোজ্য পরিবেশন শুরু হল। চিনা অভিজাত রীতিতে একটি পদের পর আর একটি। প্রথমটি ছিল স্প্রিং রোলস। আমাদের দেশের মতোই। অতঃপর এল ক্র্যাবমিট ও মাশরুম। কাঁকড়া আমার অত্যন্ত প্রিয় ভোজ্য। দেখলাম, কাঁকড়ার ভিতরের অংশগুলি তেলের চেয়ে গাঢ় অল্প ঝোলে ভাসছে। চারপাশে রক্তবর্ণ দীর্ঘ শুষ্ক লঙ্কা ভাজা। বোঝা যাচ্ছে, ওই লঙ্কা কাঁকড়া সহযোগে পাক হয়েছে।

আমি চপস্টিক ব্যবহারে পটু নই। চামচে করে বড় এক গ্রাস মুখে তুলেই ধাক্কা খেলাম, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত। অতর্কিতে। অধীর হৃদয়ে বাসরঘরে ঢোকবার মুখে হঠাৎ আততায়ীর আক্রমণ হলে যেমন হতে পারত, তেমনি। চিনাদের মুখ যেমন ভাবলেশহীন থাকে, অনুমান করা যায় না তারা অতঃপর কী করতে পারে, বুঝতে পারলাম সেচুয়ান পাকধারা তার থেকেও কুচক্রী, রূপে আকর্ষণ করে বিষকন্যার মতো।

মদিরা জিহ্বাকে ঝালমুক্ত করতে সাহায্য করে না, সুপ কখন আসবে সেই আশায় বসেছিলাম। সুপও শান্তি দিতে পারেনি সেদিন। কারণ, হট অ্যান্ড সাওয়ার সুপে চতুর্থ প্রকারের ঝাল ছিল, গোলমরিচের। চিনে পাশ্চাত্য জগতের মতো সুপ প্রথমেই পরিবেশন হয় না। বিভিন্ন পদের মাঝখানে অথবা একেবারে শেষেও আসতে পারে।

গোলমরিচ অনেক রন্ধন প্রকরণেই উচ্চস্থান অধিকার করে। দুটি ক্ষেত্রে গোলমরিচের সংযোগ আমার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। প্রথমটি লক্ষ্ণৌতে। সম্পূর্ণ ঠিকানাটা বলতে পারব না। চারবাগ স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে যাওয়ার পথে বাঁদিকে একটা অপ্রশস্ত রাস্তায় ঢুকতে হয়। সাধারণ ধাবার চেয়ে সামান্য উঁচুশ্রেণীর। সর্দারজির দোকান। এঁদের বিখ্যাত পদ কালিমির্চওয়ালা মুর্গা। কুক্কুটখণ্ডগুলি ঈষৎ সিদ্ধ করে অথবা গ্রিল করে তারপর প্রধান উপকরণ গোলমরিচের গুঁড়োয় আচ্ছন্ন করা। যত সহজ করে বললাম, অত সহজে নিশ্চয় প্রস্তুত হয় না কালিমির্চওয়ালা মুর্গা। সব সুখের বস্তুর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এই পদটি স্বাদে ও সৌরভে আমাদের পরিচিত তাবত ব্যঞ্জন থেকে স্বতন্ত্র। গোলমরিচের আবার অন্য ধরনের স্বাদ এবং গন্ধ আছে, যা সরাসরি লঙ্কার ঝালের মতো নয়। ঝাল অপেক্ষা, বলতে পারি ঝাঁঝ বেশি। সেই ঝাঁঝে বেশ কাতর হয়েছিলাম, তবু পদটিকে বর্জন করতে পারিনি।

আমার দ্বিতীয় গোলমরিচের অভিজ্ঞতা কেরালায়। যাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তিনি শুনেছিলেন আমি ভোজ্যে ঝাল পছন্দ করি। আমাকে বললেন, আমাদের রসম যাকে আমরা বলি পেপ্পার ওয়াটার, নিশ্চয় আপনার মনোমতো হবে। ঈষদুষ্ণ এক চুমুক গোলমরিচের জল নামক সেই পেপ্পার ওয়াটার গ্রহণ করে বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। সর্বপ্রকার রসমেই সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়াই বিধি। যেমন আমাদের ডিমভাজা নুন-গোলমরিচ না হলে পূর্ণই হয় না। তারপর থেকে অজানা স্থানে রসম সন্তর্পণে গ্রহণ করি, যাতে প্রথম গণ্ডুষেই ধরাশায়ী না হই।

ভারতীয় শাস্ত্রে ঝাল ষড়রসের অন্তর্গত। ছয় রসের মধ্যে কষায় এবং তিক্ত না হলেও

আমার চলে। কিন্তু লবণস্বাদ আহার্যে কটু অর্থাৎ ঝালের ছোঁয়া না থাকলে মন ওঠে না। বাঙালির রান্নাশালে এবং ভাঁড়ারের প্রাথমিক সরঞ্জাম নুন, হলুদ, লঙ্কা এবং তেল। ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশেই ঝালের রবরবা। একবার আজকের চেন্নাই শহরে এক তেলুগুভাষীর বাড়িতে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ ছিল। গৃহস্বামী প্রথমেই উপস্থিত করলেন দোসা ধরনের এক ভোজ্য। তার রং কালচে সবুজ। এই পদটি আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শুনলাম, এটি বিশিষ্ট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের একান্ত নিজস্ব পদ। নাম পিসরেট। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আমি পিসরেটের ভক্ত হয়ে পড়েছি। সে আলাদা কথা। সেদিন সকালে সুস্বাদ ও নতুনত্বের চমকে আমি মোহিত হয়েছিলাম। গৃহস্বামী বললেন, দোসার এই জ্ঞাতি ভাইয়ের ক্ষেত্রে সাম্বর অবান্তর। চাটনিও। পিসরেট সামান্য আওয়াকাই সংযোগে সোনায় সোহাগার সঙ্গে তুলনীয় হয়। আওয়াকাই মানে আমের আচার। আচারের রক্তচক্ষু দেখেই আমার নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মূর্খের খোয়াবের শেষ নেই। আওয়াকাই মুখে পড়তেই জিভ জ্বলতে লাগল, তার সুগন্ধ, তার অম্ল-লবণ-তীক্ষ্ণ স্বাদ বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু আওয়াকাই ঠিক মারণাস্ত্র নয়। দু-একগ্রাস পিসরেটের পরই জ্বালা চলে গেল। কিন্তু চোখের জলে, নাকের জলে সেদিনের প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল।

প্রায় সেই সময়েই আর একটি জ্বালাময় অন্ধ্র উপকরণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ডালপাউডার। এক চামচ তীক্ষ্ণ লঙ্কামিশ্রিত ডালপাউডার প্রথম পাতে ভাত এবং সুগন্ধি ঘৃতের সঙ্গে খেতে ভাল লাগে। আমি এই উপকরণটির ভক্ত। কিন্তু শাস্ত্রেই আছে, ভক্তকে বিধাতা নানাভাবে নাকাল করেন। ডালপাউডার আমাকে বাদ দেবে কেন? দক্ষিণের কোথাও, টেবিলে ছোট পাত্রে ডালপাউডার দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম। তপ্ত ইডলির থালা সবে এসে পৌঁছেছে। আমি তার এক কোনায় এক চামচ ডালপাউডার মিশিয়ে আমার নিজস্ব চাটনি প্রস্তুত করে ইডলি সহযোগে মুখে তুলেছিলাম। জল জল বলে রুদ্ধকণ্ঠে আমার কাতরোক্তি শুনে পরিচারক একগ্লাস জল নিয়ে দৌড়ে এল। বলল, এর নাম গান পাউডার, সন্তর্পণে খেতে হয়। এক্ষেত্রে লঙ্কাচূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ছিল, দেখে বোঝবার উপায় নেই তার মারণক্ষমতা কত প্রবল।

আমরা মনে করি বাঙালিরা, বিশেষ করে পুব বাংলার মানুষরা যথেষ্ট ঝাল খাই। আমাদের কতগুলি ব্যঞ্জনের নামই তো ঝাল। মাছের ঝাল, বড়ির ঝাল ইত্যাদি। সুতরাং, তাতে বাঁধনছেঁড়া লঙ্কা যোগ করতে বাধা কোথায়? আমরা যে ঝাল সত্যি পছন্দ করি, সেটা হল কাঁচালঙ্কার ঝাল। আগে দেখেছি, ভোজনপাত্রে একচিমটি নুন, একখণ্ড পাতিলেবু এবং একটি কাঁচালঙ্কা অব্যর্থ উপস্থিত থাকত। রেওয়াজটা বোধহয় এখন উঠে গেছে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো কাঁচালঙ্কার ঝাল উভয় বাংলার কোথাও আমার জিহ্বা স্পর্শ করেনি। আমাদের ঝাল প্রেম আর দহনের দোলায় দুলতে থাকে। আমরা মুখে হুসহাস শব্দ করি, নাক সুড়সুড় করে, চোখে জল আসে—তবু ছাড়তে পারি না। বিজ্ঞানীরা বলেন, এক ধরনের ভালবাসা আছে যেখানে, নিপীড়ন প্রেমকে গভীরতর করে। তেমনি।

কাঁচালঙ্কার ক্ষেত্রেও অন্ধ্রবাসীদের রেকর্ড বোধহয় চূড়ান্ত। মিরচি কা সালন, অর্থাৎ লঙ্কার তরকারি। যে তরকারির একমাত্র সবজি কাঁচা লঙ্কা। পদটিতে অন্ধ্র বিশেষত্ব বললে অসত্য বলা হয় না। কিন্তু পুরো সত্য প্রকাশিত হয় না। মিরচি কা সালন আসলে হায়দরাবাদি ব্যঞ্জন। নবাবদের প্রিয় পদ। হায়দরাবাদে তৎকালীন রিটজ হোটেলের বাঙালি শেফ আমাকে বলেছিলেন, ঝাল খেতে পারবেন তো? বিশিষ্ট হায়দরাবাদি নিরামিষ ভোজ্য।

চিফ শেফ আমার পাশে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন, আমি মুখে সাহস ফুটিয়ে ভাতের সঙ্গে অনেকখানি সালন মুখে তুলেছিলাম। জল থেকে তোলা মাছ যেমন ছটফট করে, আমাকে তেমনি করতে দেখে শেফ বললেন, ঝাল কম দিয়েও মিরচি কা সালন হয়। লঙ্কার ভেতরের বিচিগুলি ফেলে দিয়ে রান্না করলে ঝাল অনেক সহনীয় হয়। তা ছাড়া লঙ্কাও তো বহুপ্রকার আছে, তাদের ঝালের মাত্রা বিভিন্ন।

গোষ্ঠী হিসাবে রাজস্থানের মানুষেরা অধিক ঝালের পক্ষপাতী। অনেক রাজস্থানি উৎসবে, ব্যসনে তাঁদের ভোজ্য গ্রহণ করেছি। ঘৃতের ব্যবহার বেশি এবং লঙ্কারও। তবে অসহনীয় নয়। হুসহাস করে এবং মাঝেমাঝে জল খেলে খাদ্যগুলি ভালই লাগে। একটা জিনিস লক্ষ করেছি, এঁদের একটি পদ অব্যর্থ ঝাল হয়। পদটি সেংরি-র তরকারি। এই শুকিয়ে নেওয়া সবজিটি রাজস্থানের নিজস্ব। প্রচুর ঘি এবং প্রচুরতর ঝাল না দিয়ে সেংরি রান্নাই হয় না। তীক্ষ্ণ ও তীব্র স্বাদের রাজস্থানি ভোজ্যে সেংরি সর্বাগ্রগণ্য।

গোয়াতেও কোনও কোনও মাছ-মাংসের রন্ধনে প্রচুর লঙ্কা যুক্ত হয়। দু-একবার এমন পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

চট্টগ্রামের মগ পাকপ্রণালীতে শুনেছি ঝাল না হলে ভোজ্য কল্‌কেই পায় না। আমার একবারমাত্র সুযোগ হয়েছিল। আমি সজ্ঞানে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছি। চট্টগ্রাম স্টেশনের পাশেই ডাকবাংলো ছিল তখন। ডাকবাংলোর পরিচারক তার নিজের জন্য সেদিন শুঁটকি রান্না করছিল। শোনা ছিল, এমন প্রবল ঝাল আর কোনও পদে হয় না। পরিচারক আমাকে তার শুঁটকিমাছের তরকারি খাওয়াতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। শুধু ঝালের ভয়ে নয়। রন্ধনের সময় যে উৎকট গন্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তখন গ্রিনবেঞ্চ থাকলে পরিবেশ দূষণের দায়ে ধরা পড়ত ডাকবাংলোর পরিচারক। যদিও সে আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে, রান্নার পর আর সে গন্ধ থাকে না।

আমাদের প্রতিবেশী ভূটানে যাঁরা গিয়েছেন, লক্ষ করে থাকবেন, শীতের আগে সব গৃহস্থের ছাদে বস্তা বস্তা লঙ্কা শুকানো হচ্ছে। ভূটানি ভোজ্যেও সর্বদা লঙ্কার প্রবল উপস্থিতি। কিঞ্চিৎ মান্যগণ্য করে সাবধানে খেতে হয়।

আমার একটি প্রিয় পদ আছে ভূটানি খাদ্যতালিকায়, এমাদাসি। লম্বা ফালি ফালি ছানার টুকরো এবং লম্বা ফালি করা লঙ্কা। পদটি বেশ ঝাল, তবে ছোবল মারে না। আমার অপর প্রিয় খাদ্য হল মোমো। ভূটানে ছোটবড় ভোজনশালায়, রাস্তার ধারে, সর্বত্র পাওয়া যায়। সদ্যপ্রস্তুত মোমো প্রত্যেক ভোজনালয়ের বিশিষ্ট চাটনির সঙ্গে অতি উপাদেয়। চাটনি কোথাও ঝাল বেশি, কোথাও ঝাঁঝ, কোথাও ঈষৎ অম্ল—নানা স্বাদের। একদা একটি ছোট ধাবাজাতীয় জায়গায় ছোট মোমো আষ্টেপিষ্টে চাটনির প্রলেপ দিয়ে

ঝালে পর্যুদস্ত হয়েছিলাম। চাটনি সামান্য পরিমাণ যুক্ত করলে প্রেম ও প্রদাহের মিশ্রণ হত। চাটনির আধিক্য আমাকে পরাভূত করেছিল। এমন জ্বলন্ত চাটনি, আমায় প্রায় বিস্মৃত সিংহলি আচারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

শুষ্ক লঙ্কাচূর্ণ সচরাচর লঙ্কাবাটার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। তখন শুধু তার তীব্রতা বোঝা যায়। লঙ্কা গুঁড়ো কিংবা লঙ্কা বাটা—কী ব্যবহার করা হয়েছে বোঝা যায় না। আমার একটি প্রিয় পদ আছে, যেখানে লঙ্কাচূর্ণ তার স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বমহিমায় উপস্থিত থাকে। পদটির নাম কিমচি, কোরিয়ার খাবার। কখনও সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়, কখনও অনুপান, আর কখনও চাটনি বা আচারের মতো। কিমচির বিষয়ে লিখতে গেলে পাঁচকাহনও পর্যাপ্ত নয়। শীতের আগে দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্ত সংসারে কিমচি প্রস্তুতের উৎসব শুরু হয়। মানুষ অফিস থেকে ছুটি নেয় কিমচি তৈরির জন্য। সারা বছর ধরেই কোনও রূপে কিমচি না হলে কোরীয় ভোজন পূর্ণ হয় না। বাঁধাকপিকে ভিনিগারে জারিয়ে, ফারমেন্ট করিয়ে প্রভূত লঙ্কাচূর্ণ সহযোগে কিমচি তৈরি হয়। লঙ্কা খুব মিহি করে চূর্ণ করা হয় না বলে, বাঁধাকপির টুকরোর গায়ে ছিট ছিট লঙ্কার চিহ্ন সাদর আহ্বান করে। এমন প্রবল ঝালের এমন চৌম্বকশক্তি থাকে, কিমচি গ্রহণ না করলে অনুমান বা অনুভব করতে পারবেন না।

আমাদের আর এক প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা। সেখানেও মানুষের ঝালের প্রতি প্রবল আসক্তি। সিংহলিদের একটি বিশিষ্ট ভোজ্য আছে, ওঁরা বলেন এগ হপার। যেন একটি অন্য ধরনের দোসা বা পাতলা ইডলির ওপর একটি ফ্রায়েড ডিম বসানো। যে চাটনি দিয়ে আমাকে সেটি ভোজন করতে দেওয়া হয়েছিল তার ছোবলের শক্তি বোধহয় হাজার ভোল্ট। আমি একবারই মাত্র তার স্বাদ পেয়েছিলাম। তার পর আর শ্রীলঙ্কাও যাইনি।

খবরও নেওয়া হয়নি, লঙ্কার ঝাল তাঁদের পরম প্রিয় বলেই কি দেশের নাম শ্রীলঙ্কা। ঝালের পাঁচালি এখানেই শেষ করি।
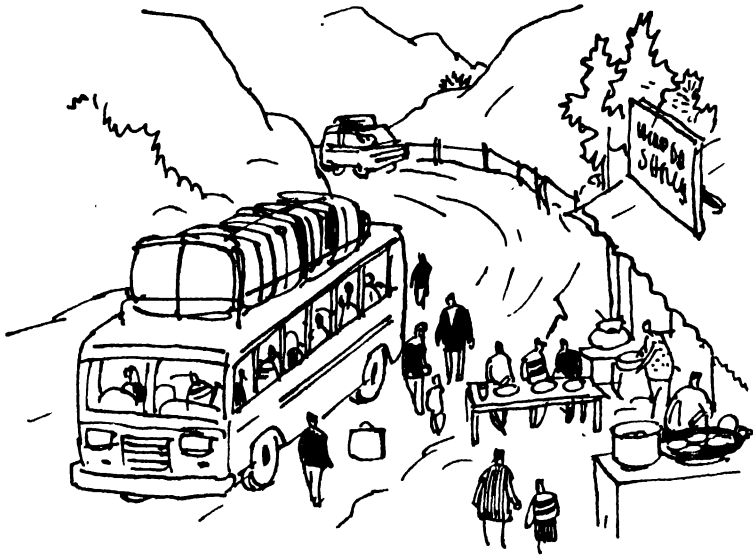
পরিবেশের বশে

এ পর্যন্ত যে সব শিল্পীর কথা লিখেছি, তাঁদের অনেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনা করলেও, তাঁদের নাম ও খ্যাতি রসিকজনের অগোচর নয়। কিন্তু এমনও অনেক সার্থক শিল্পী আছেন, যাঁদের সঙ্গে রসিকজনের ক্ষণিক দেখা হয়েছে, তাঁদের সৃষ্টির স্বাদে-সৌরভে গুণীরা খুশি হয়েছেন, কিন্তু শিল্পীর নামটাও মনে রাখেননি। দিনান্তে নিশান্তে এমন কত স্মৃতিসঞ্চয় পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। শুধু কখনও অলস অবসরে তাঁদের কথা মনে হলে বিষণ্নতা অনুভব করি। অকৃতজ্ঞ স্মৃতিকে তিরস্কার করি, যার জন্য এই সুখদায়ক অভিজ্ঞতা, তার নামটাও মনে রাখলে না?

তেমন একজনের কথা আজ মনে পড়ছে। ইনি অজ্ঞাতনামা নন, অপরিচিতও নন। কুমায়ুন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, এমন মানুষের সংখ্যা সামান্য হবে না। আপনি যদি নামী বা যশস্বী কেউ হন, দোকানের মালিক ভোজনের শেষে আপনার সামনে অবশ্যই তাঁর মস্ত বড় সার্টিফিকেট বা অটোগ্রাফের খাতা উপস্থিত করবেন। পনেরো-ষোলো বছর পূর্বের কথা, বেশ মনে আছে সেখানে প্রশস্তিপত্র ও সই দেখে চমকে উঠেছিলাম। দুজন কমান্ডার-ইন-চিফ বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ, একজন মন্ত্রী , কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলার ইত্যাদি সেই খাতার পাতার পর পাতা জুড়ে আছেন। সবার বক্তব্য এক—এমন পরিপাটি, অসাধারণ ভোজনের অভিজ্ঞতা তাঁদের কমই হয়েছে। আমারও উচ্ছ্বসিত হবার কথা। হয়েও ছিলাম। কিন্তু দোকানের মালিক আমাকে কিছু লিখতে বললেন না। অবশ্যই আমি তাঁর অন্য ভক্তদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য ছিলাম না। সেজন্যই দোকানের নামটা ভুলে গিয়েছি বললে উত্তম সাফাই হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্বীকার হয় না।

নাম বিস্মৃত হয়েছি বলে দোকানটি খুঁজে পেতে আপনার সামান্য মাত্রও অসুবিধা হবে না। হিমালয়ের পরিযায়ী পাখি যেমন, শীতের শুরুতে মানচিত্রের সাহায্য ছাড়াই সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করে আলিপুরের চিড়িয়াখানার ছোট্ট হ্রদে অবতীর্ণ হয়, নৈনতাল থেকে রানীক্ষেতগামী আপনার বাসও অনেক বাঁকচোর পার হয়ে অনেক উৎরাই-চড়াই ভেঙে অব্যর্থ গরমপানির সেই ভোজনশালার সামনে এসে থামবে। কালীপূজা যেমন জবাফুল ছাড়া হয় না, রানীক্ষেতও তেমনি গরমপানিতে না থেমে যাওয়া যায় না। স্থানের নাম গরমপানি। কাছেই কোথাও তপ্তকুণ্ড আছে। ছোট্ট গ্রামটি ক্ষীণ একটি জলস্রোতের পারে। এখানেই মাঝপথে বিশ্রাম। বিশ্রাম মানেই শরীরের জন্য কিছু রসদের জোগাড়, বাসের যেমন তেল-জলের। দোকানও বড় কিছু নয়। বাসের পর বাস থামছে। সবাই দোকানে প্রবেশ করছেন। এলাহি বেঞ্চি ও টেবিল পাতা আছে। সবাই একই পদার্থ পরখ করছেন। পুরি তরকারি। আপনি যাবার পর জল দেওয়া আটা ভাল করে মাখা হবে। আপনার সামনেই সুগন্ধ ঘৃতে আপনার পুরি ভাজা হবে। ততক্ষণে পরিচারক আপনাকে থালার একধারে একবাটি আলুর তরকারি দিয়ে গেছে। ঝোল ঝোল, ক্ষীণ অম্লের স্বাদ, কাঁচা লঙ্কা ধনেপাতার সৌরভ। গরম পুরি সহযোগে সেই তরকারি কুয়াশা মেশানো সকালের হিমেল হাওয়ার অবর্ণনীয়ের স্বাদ পৌঁছে দেবে। মনে আছে, দামও সামান্যই দিয়েছিলাম। এখনও হৃদয়ে যার সুখের রেশ আছে, অথচ, কী লজ্জা, সেই দোকানের নামটি মনে নেই। আবার রওনা হলাম রানীক্ষেতের পথে। বাসের ঝাঁকুনি, আচমকা তীক্ষ্ণ বাঁক নেওয়ার বিভীষিকা, পাশের স্নান-বৈরাগী মানুষটার আদিম গন্ধ—কিন্তু কারও কোনও বিরক্তি নেই, মুখে তৃপ্তির ছাপ। কারণ তো জানি, এঁরাও ওই দোকানের রসের আস্বাদ পেয়েছেন।

অনেক আগে লিখেছিলাম, স্থান কালের সঙ্গে ভোজন সুখের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। কথাটা যে পরম সত্য তার অনুভব আগেই হয়েছিল। ডাবওয়ালি নামে দিল্লি অমৃতসরের পথের ধারে এক অখ্যাতনামা গ্রামে। দোকানের নাম মনে রাখবার উপায় নেই। কারণ সে দোকানের কোনও নামই ছিল না। পঞ্জাবিতে বলে ঢাবা। বিনা আয়োজনে পথের ধারে দুটো বাসন, একটা উনুন, কটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসংখ্য দোকানের একটি।

১৯৬৫ সাল। সেপ্টেম্বর মাস, তখনও বেশ গরম। পাক-ভারত যুদ্ধের শেষে সমস্ত দিন গরমে, ধুলোয়, ক্লান্তিতে, নাস্তানাবুদ হয়ে ইছোগিল ক্যানালের ধারে, খেমকরনে, ফিরোজপুরে ঘুরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বীরত্বের নিদর্শন দেখেছি, বীরগাথা শুনেছি। সন্ধ্যার পর শরীর যখন আর বইছে না আমরা এক গাড়িতে ছ'জন আরোহী দিল্লির পথে রওনা হয়েছি। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, পরিশ্রান্ত। অন্ধকার রাস্তায় কোনও ভাল ভোজনশালা নজরে পড়ছে না। টিমটিমে লণ্ঠন কিংবা গ্যাসের আলো জ্বলছে। মাটির দেওয়াল, বিবর্ণ খাবার—কোথাও আর থামবার ইচ্ছা হয় না। অথচ জঠরাগ্নি ক্রমশ দাবানল হয়ে উঠছে। শেষে নিরুপায় হয়ে যেখানে থামা হল, পরে জেনেছিলাম সে গ্রামের নাম ডাবওয়ালি।

লণ্ঠন জ্বলছে। সর্দারজি তন্দুরের ওপর একপাশে বসে আছেন। সামনে একতাল আটা মাখা রয়েছে, আর ছিল বড় একটা ঢাকনাওলা ডেকচি। কী পাওয়া যাবে শুনে

আমরা চরম নিরুৎসাহ হলাম। তন্দুরি রোটি ও দাল। হায়, অভুক্ত দিনান্তে এই আমাদের বিধিলিপি? কোথায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ, শীতল বিয়ার একপাত্র, গরগরে রোগনজোস, বোটি কবাব সহযোগে তন্দুরনান বা রুটি। তার বদলে এই?

কিন্তু তখন শরীর বিদ্রোহ করেছে। তা ছাড়া আরও দূরে গেলে রাত্রি গভীর হবে এবং যা পাওয়া গিয়েছে তার বেশি কিছু পাওয়া যাবে এমন ভরসা কোথায়? অতএব তন্দুরি রোটি ও ডাল আদেশ করা গেল। দ্বিধান্বিত, ক্ষীণকণ্ঠে সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ার পাওয়া যাবে, ঠাণ্ডা? সর্দারজি মুখে বললেন, হাঁন্‌জি। চোখে কি ইশারা করলেন, একটা ছোট ছেলে সাইকেলে করে অন্ধকার রাস্তায় মুহূর্তে অদৃশ্য হল। উৎসাহিত হয়ে এবারে একটু স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, ডিম পাওয়া যাবে না, ওমলেট? সর্দারজি তৎক্ষণাৎ বললেন, হাঁন্‌জি। আর একটি ছেলে সাইকেলে চড়ে দ্রুত অন্ধকারে অন্তর্হিত হল। বুঝলাম, ডিম আনতে গেল। ততক্ষণ থেমে থাকবার অবস্থা আমাদের নেই। রাস্তার ধারের বেঞ্চিতে বসেছি। সামনে দুটো নড়বড়ে কাঠের টেবিল। সর্দার দ্রুত হাতে থাবড়ে মোটা মোটা রুটি গড়ে তন্দুরের গহ্বরে পাঠিয়ে দিলেন। ডেকচিটা কিছুক্ষণ তন্দুরের মুখের উপর বসে গরম হতে থাকল।

সর্দার থালার ওপর আমাদের এক এক বাটি ডাল, চাকা পেঁয়াজ গুটি কয় ধরে দিয়ে গেলেন। তারপর গরম গরম রুটি এসে পৌঁছতে লাগল। সে সুখযাত্রার বুঝি শেষ নেই। কত বাটি ডাল এল, কত রুটি, তার হিসাব রাখিনি।

খরচ সামান্য পড়েছিল। অত স্বল্পবায়ে অমন সুখের সন্ধান যিনি দিলেন তার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তিনি আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছেন। ওঠবার পূর্বে বিয়ারের ক'টা বোতল এসে পৌঁছয়, ডিমও গুটিকয়। কিন্তু তখন আমাদের অন্য কোনও দিকে মতি নেই। যে অমৃতের স্বাদ পেয়েছি তার কাছে ওমলেট আর বিয়ার তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

তন্দুর থেকে সদ্য আহৃত রুটির তুলনা হয় না। আটার গন্ধ, আগুনের গন্ধ, মাটির গন্ধ, সব মিলিয়ে একটা আজানা গন্ধ পাওয়া যায়। আর ডাল—ওই ডালকে কালিদাল বলে। ডেকচিতে স্থানান্তরিত হবার আগে, মাটির হাঁড়িতে আস্ত কলাই ডাল আদা, রসুন ও পিঁয়াজের সঙ্গে বারো ঘণ্টা অল্প আঁচে সিদ্ধ হয়েছে। এই ভোজ্যের স্বাদে নতুন এক মাত্রার যোগ হল, সময়। বস্তুত, কালিদাল সুখের রহস্যের মূলে হল সময়। সময় এত সুস্বাদ হয়! তা ছাড়া আদা, পিঁয়াজ, রসুনের মিশ্র সৌরভ তো হয়েছেই এবং সর্বোপরি স্বাদ অনির্বচনীয় হয় মাখনের সংযোগে। বাড়িতে তৈরি ফুটফুটে পবিত্র, সাদা, হালকা মাখন। শিল্পীর নাম স্মরণে নেই, কিন্তু ডাবওয়ালি নামটা কোনও দিন ভুলব না।

ভ্রান্ত নিয়ম

পৃথিবীতে কোনও নিয়মই যে অভ্রান্ত নয়, এই সত্যটা এতদিনে, এই বয়সে বুঝতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু সর্বদা মনে থাকে না। বাঙালিরা মাছ ছাড়া খেতে পারে না, কেরলের নায়ারেরা বাঙালিদের মতো মাছ-মাংস ভালবাসে, এই সব তথ্য যে অবধারিত নয়, খুব দুঃখের সঙ্গে একদিন অনুভব করেছিলাম।

ওই যে ছেলেটি 'গ্রেট ইন্ডিয়ান নভেল' বইটি লিখে সারা দুনিয়ায় নাম করেছে, শশী থারুর, তার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। শশীকেও ছোটবেলায় দেখেছি।

জেনেভায় দেখা হতেই শশী বলল, আমার বাড়িতে কাল দুপুরে আপনি খেতে আসুন। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত বলাম। শশী কেরলের নায়ার পরিবারের ছেলে। তার স্ত্রীর বাবা বাঙালি, মা কাশ্মীরি। ত্র্যহস্পর্শ কথাটার মানে ভাল হলে তাই বলা যেত। কেরলীয়, বাঙালি, কাশ্মীরি। তিন পক্ষেরই রন্ধন-ভোজনে সুনাম।

পরের দিন দুপুরে শশীর বাড়িতে প্রথম যে পদটির পরিবেশন হল সেটি মাছ। খণ্ডগুলিও বৃহৎ। আমি আদৌ মাছ খাই না। নির্বোধের মতো বলে ফেললাম, আমি তো মাছ খাই না।

জানি অন্যান্য আরও দু-চারটে পদ থাকবে। আবার মূর্খের মতো বললাম, মাছ নাই বা খেলাম। অন্য সব তো খাই।

ছেলেমানুষ সুন্দরী মেয়েটির মুখ, তার নাম মিনু, মুহূর্তে মলিন হল। বলল, আর কিছু তো নেই।

মিনু কিছুক্ষণ নীরব থেকে কান্নাভেজা গলায় বলল, শশী নিরামিষ খায়। তাই বাড়িতে মাছ-মাংস হয় না। আপনি বাঙালি। আসছেন শুনে ভাবলাম মাছ রান্না করি। অনেকদিন

পরে আপনার সুবাদে মাছ খাওয়া হবে। আর কিছু রান্না করিনি।

আমার চোখ অবাধ্যভাবে শশীর দিকে যেতে মিনু বলল, শশীর জন্য দই আছে। আর কাল রাত্রে সন্বার থেকে গিয়েছিল, তাই একটু আছে।

ধনুকের তির আর মুখের কথা একবার ছিটকে গেলে আর কি ফেরানো যায়? তবু বললাম, মিনু, আজ আমি মাছ খাব। তুমি কিছু ভেব না।

শেষ পদ মিষ্টান্ন অতি অপরূপ ছিল। তখন স্ট্রবেরির সময়। পুষ্ট, সাতিশয় মিষ্ট, তাজা স্ট্রবেরির মিষ্টান্ন খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলাম।

২

ট্রেনের দূর যাত্রায় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যেমন হয়, নাম-ঠিকানা আদানপ্রদান হল। তারপর ভুলে গিয়েছিলাম। এক সকালে ভদ্রলোক এসে হাজির। প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর সমারোহ করে বসালাম। কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন, সেদিন ট্রেনে আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি একজন খাদ্যরসিক। আপনার খুব নাম।

আমি মন্তব্যটা উপভোগ করলেও, রীতিসিদ্ধ না, না, কী যে বলেন ইত্যাদি বলতে থাকলাম। ভদ্রলোক বললেন, একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন, এক সন্ধ্যায়।

ঠিক হল আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি যাব। বললাম, আমার কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। পৌঁছতে আটটা বাজবে।

ভদ্রলোক বললেন, তাতে কী হয়েছে। তার পরও দু-তিন ঘণ্টা গল্প করা যাবে।

আমি ঘর-পোড়া গোরু, তৎক্ষণাৎ বললাম, আমি কিন্তু মাছ খাই না।

ভদ্রলোকের অপ্রতিভ মুখ দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, মাছ খাই না বটে, কিন্তু মাংস খাই। কলকাতার কচি পাঁঠার মাংসের কি তুলনা আছে!

ভদ্রলোকের মুখ মলিনতর হল। বললেন, আমরা মটন খাই না। ওতে কোলেস্টরল। হার্ট খারাপ করে।

আমার এত বয়সেও বুদ্ধি হল না, তাই বললুম, বেশ তো, চিকেন হলেই হবে। আগে, জানেন, চিকেন খেতেই পেতাম না। আমাদের বাড়িতে বারণ ছিল।

ভদ্রলোকের মুখ একেবারে রক্তহীন হয়ে গেল। বললেন, আমরা চিকেন খাই না। আমার স্ত্রী বলেন, ডিমে যদি সালমনেলা থাকতে পারে, যার জন্য এক কোটি না দশ কোটি ডিম বিলেতে ফেলে দিতে হয়েছিল, চিকেনে তা অবশ্যই থাকবে। ডিমে আছে, চিকেনে নেই, তা কখনও হয়।

আমার তখনও আক্কেল হল না। বললাম, তা হোক না, আমরা ভেজিটেবলও ভালবাসি। কত ভাল রান্না করা যায় সবজি দিয়ে, এখন তো বাঙালি ভুলতে বসেছে।

ভদ্রলোকের পাংশু মুখে ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কোনওরকমে বললেন, আসলে মঙ্গলবার আমরা একবেলা খাই। দুপুরে খই-দুধ। রাত্রে কিছু খাই না। তাতে শরীর ভাল থাকে। ভেবেছিলাম, আপনি মঙ্গলবার এলে অনেক গল্প করা যাবে। খাওয়া-দাওয়ায়

হাঙ্গামা থাকবে না।

খাওয়ার জন্যই নিমন্ত্রণ, এই নিয়মটাও অভ্রান্ত নয়।

৩

যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা বন্ধু-স্থানীয় সেই মানুষটি তখন ওয়াশিংটনে চাকরি করেন। কথা চলছিল, তিনি আমাদের নতুন কাগজে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। সেটা শেষ পর্যন্ত হল না যদিও।

ওয়াশিংটনে পৌঁছে তাঁকে ফোন করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাত্রে তাঁর বাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। ঠিক হল সন্ধ্যায় আমার হোটেলে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

সন্ধ্যায় তাঁর গড়িতে দুজনে রওনা হয়েছি তাঁর বাড়ির দিকে, হঠাৎ মনে হল আমার খাদ্যাভ্যাসের কথা তাঁকে বলে দেওয়া উচিত। নইলে পরে বিব্রত হবেন।

বললাম, আমি মাছ খাই না। তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, তাই নাকি, আপনি কি সৎ— ? তাঁর কথা শেষ করবার আগেই আমি বললাম, মাছ একেবারে খাই না, তা নয়। চিংড়ি আর, ইলিশ মাছ খাই। তাছাড়া আমি সর্বভূক—সব রকমের মাংসই খাই।

আমি তো সব কথা বলে নিশ্চিন্ত। ভদ্রলোক যেন একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন। আমি মনে করলাম, দীর্ঘ পথ যেতে হবে, পথে যানবাহনের অন্তহীন স্রোত। সতর্ক চালক, তাই কথা কম বলছেন।

তাঁর গাড়ি মস্ত এক পার্কিংলটে ঢুকল। বললেন, আপনি একটু বসুন, আমি যাব আর আসব।

আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, এটা সুপার মার্কেট। দশ মিনিটে ফিরে আসব।

আমি বললাম, তা কেন? আমিও আপনার সঙ্গে যাই চলুন। গাড়িতে বসে থেকে কী করব।

তিনি যেন একটু অনিচ্ছায় আমাকে সঙ্গে নিলেন।

প্রকাণ্ড সুপার মার্কেট। যা দেখি তাতেই অবাক হই। খাদ্য-সেকশানে কত রকমের কাঁচা শাকসবজি, কত টিনের খাবার, কতই না-পাক করা ব্যঞ্জন, কত রকমের পাঁউরুটি। ভদ্রলোক ও সব দিকে না তাকিয়ে সোজা মাছ মাংসের অঞ্চলে চলে এলেন। চিংড়িমাছের কাউন্টারে গিয়ে ১০০ গ্রাম চিংড়ি মাছ চাইলেন। তিনটি মাঝারি মাপের বাগদা চিংড়ি উঠল।

এবারে মাংসের কাউন্টারে পঞ্চাশ গ্রাম কিমা কিনলেন।

আমি, বলা বাহুল্য খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। অল্প পরিমাণ মাছ-মাংস কেন? ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং দুই কন্যা, আমি জানি। তাহলে ওঁরা চারজন এবং আমি মোট পাঁচজন ওই চিংড়ি মাছ খাব? কুচো চিংড়ি নিলেও মানে বুঝতাম। কিন্তু তিনটি বাগদা চিংড়ি পাঁচভাগ হবেই বা কী করে? তাছাড়া ওই সামান্য পরিমাণ কিমা, পাঁচজনে মিলে

তার কতটুকুই ভাগ পাব প্রত্যেকে?

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না, ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ভারি সুন্দর পরিবার। মিতভাষিণী হাসিমুখ স্ত্রী, দুটি সুন্দরী, ভদ্র, অকারণ-চঞ্চল-নয় কিশোরী কন্যা।

সচরাচর যা হয়, প্রথম পর্বে মদ্য পান, এখানে তার নিমন্ত্রণ হল না। ফলের রস এল। একটি সুখী পরিবারের সঙ্গে হাসিতে গল্পে সময় বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

এবার খাবার পরিবেশন হবে। সবাই টেবিলে গিয়ে বসলাম। বড় দুটি বাটিতে নিরামিষ সবজি, আর একটিতে ডাল। সঙ্গে তপ্ত ভাত। আর বোধহয় বেগুন ভাজা ছিল। আরম্ভ করতে যাচ্ছি, দুটি ছোট বাটি এল শুধু আমার জন্য। আমি চকিত হয়ে বললাম, আপনাদের কই? সব আমাকে দিচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, ও দুটি বাটিই আপনার জন্য, চিংড়ি মাছের কালিয়া, আর কিমামটর। আপনার ভাল লাগবে তো?

তাঁর স্ত্রী বললেন, মাছ-মাংস এ বাড়িতে রান্না হয় না। অভ্যাস নেই, কী জানি কেমন রান্না হয়েছে। আপনার ভাল লাগবে তো?

ভদ্রলোক যোগ করলেন, আমরা সৎসঙ্গের সদস্য, শ্রী অনুকূলচন্দ্রের অনুগত শিষ্য। মাছ-মাংস, পান-সিগারেট এসব কিছুই আমরা খাই না।

রান্না বেশ ভাল হয়েছিল, কিন্তু আমি মুখে তুলতে পারছিলাম না, আমার বুদ্ধিহীনতার লজ্জা আমাকে সে রাত্রে ভারী কষ্ট দিয়েছিল।